পরলোক সমীক্ষণ

উৎসর্গ

মুমুক্ষু শিষ্যমণ্ডলীর পরম কল্যাণের জন্য যাঁহার বাণী অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মমীমাংসায় নিত্য পরিপূর্ণ থাকিত, যিনি বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ভ্রান্তিমূলক ব্যাকুলা বুদ্ধিকে তত্ত্বমসি শব্দের অর্থ বুঝাইয়া মায়া-কল্পিত নামরূপাত্মক সমস্ত দৃশ্য পদার্থ যে মিথ্যা, তাহা সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিতেন, যিনি ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানরূপ তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া মনের মলিনা বাসনা, শোক, সন্তাপ, দুঃখ, উদ্বেগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অহংতত্ত্বের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতেন, যিনি আমাদের জন্মান্তরীণ কর্ম্ম বীজের ধ্বংস-হেতু সঙ্কল্পাত্মক মনোবৃত্তি, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তি, অনুসন্ধানাত্মিকা চিত্তবৃত্তি ও অভিমানাত্মিকা অহঙ্কার-বৃত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া সাধনের পথ সুগম করিয়া দিতেন, সেই তত্ত্বদর্শী পরমারাধ্য গুরুদেব—২য়* ব্রহ্মলোকবাসী শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের (জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য, জ্যোতির্ম্ম পীঠাধীশ্বর, বদরিকাশ্রম) শ্রীশ্রীচরণ কমলে অংসখ্য সশ্রদ্ধ প্রণাম পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম

স্নেহের

১৩৬১ ফণিভূষণ

সূচীপত্র

গানের সূচী

অনুক্রমণিকা

আজ আমি এক গভীর জটিল সমস্যাপূর্ণ বিষয় লইয়া আরম্ভ করিব—যে বিষয়টি সাধারণের মধ্যে মনের অজ্ঞাত অবস্থায় আছে, যাহা অনেক নাস্তিক ও অবিশ্বাসীর মধ্যে এক অলৌকিক যবনিকার অন্তরালে নিহিত। কিন্তু আমাদের অবচেতন মনের মধ্যে সন্ধান করিলে অতি সূক্ষ্ম একটা অনুভূতি জাগে। সেই জন্যই ত আমাদের ভিতর যাঁহারা অবিশ্বাসী তাঁহারাও কোন লোক-পরিচিত যশস্বী ব্যক্তির পরলোক গমনে দুই এক মিনিট বিশ্বাসের সীমারেখার মধ্যে আসিয়া সেই পরলোকবাসী আত্মিকের শান্তি কামনার অভিনয় করেন।

এখানে প্রশ্ন উঠে—কেন করি? আমাদের এই আত্মপ্রবঞ্চনার কারণ কি? পরলোক যদি নাই, তবে মৃত ব্যক্তির আত্মিকের শান্তি কামনার উদ্দেশ্য কি? মনে হয় সাধারণ ভোগী মানুষ অনেকটা ভাবপ্রবণ, কেহ-বা বিচারহীন প্রত্যক্ষবাদী।

ভাবপ্রবণ ও প্রত্যক্ষবাদীর একটি গল্প আছে, তাহা সংক্ষেপে বলি: পাশ্চাত্ত্য দেশের এক খ্যাতনামা বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিলেন, জল বৃহৎ আধারে থাকিলে পারালেভেল্ থাকে না, উঁচুনীচু হয়। মাসিক পত্রিকায় তা দুইজনেই পড়িলেন। ভাবপ্রবণ তা বিশ্বাস করিলেন, যেহেতু ইহা বড় বৈজ্ঞানিকের কথা। আর তার্কিক প্রত্যক্ষবাদী বলিলেন, তা কি কখন হয়, যতবড় পাত্রেই জল থাক পারালেভেল থাকিবেই। তখন দুই বন্ধুর মীমাংসা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। উভয়েই যুক্তি করিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন প্রত্যক্ষবাদী। বৈজ্ঞানিক তখন শান্ত ভাবে প্রত্যক্ষবাদীকে বলিলেন, ছোট মন দিয়া বিচার করা চলে না।

চলুন উভয়েই সমুদ্রের তীরে। মনে করুন, এই সমুদ্রতটে একটি খিলা মারা হইল, এবং সমুদ্রমধ্যে চারিশত মাইল দূরে আর একটি বড় খিলা মারা সম্ভব হইল। এই দুইটি খিলায় একটি তার পারালেভেল করিয়া বাঁধা হইল। এখন কি দেখিব বলুন দেখি? তটের ধারে খিলাটির নিকট তার হইতে এক ফুট নিচে জল এবং চারিশত মাইল দূরে যে খিলাটি আছে তাহার কয়েক ফুট নিচে জল থাকিবে। বৃহৎ আধারে লেভেল ঠিক থাকে না। সুন্দর মীমাংসা হইল। ভাবপ্রবণ হাসিয়াই খুন। তখন বৈজ্ঞানিক বলিলেন, যাহারা কুয়ার ব্যাং, তাহারা কুয়ার মধ্যেই দুনিয়া দেখে।

পৃথিবী গোল বলিয়া গোলের মধ্যে থাকিয়া আমরা সকল বিষয়েই গোলমাল করিয়া বসি। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যাহা চিন্তা করিতে মানব অশক্ত, কল্পনা যেখানে অবশ হইয়া যায়, তাহার মধ্যে কত শক্তি, কত দুনিয়া লুক্কায়িত, কে তাহার খবর রাখে! তবে বহু মনীষী যুগ যুগ সাধনা ও গবেষণা দ্বারা বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এই পুস্তকের নাম যে, 'পরলোক সমীক্ষণ বা অপঞ্চীকৃত ভূততত্ত্ব' দেওয়া হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু বলি। পরলোক অর্থে লোকোত্তর; মৃত্যুর পর আমরা ভূলোক হইতে পিতৃলোক ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য বা ব্রহ্মলোক বা নিত্যপ্রকাশ চিদানন্দ লোকে মানবীয় সুকর্ম্মের ফলে গমন করি। অথবা নাস্তিক তমভাবাচ্ছন্ন থাকিয়া নিম্নে অন্ধকার রাজ্যে নীত হই। ভূলোকের কর্ম্মানুসারে পরলোকে সেই লোক বা স্তর প্রাপ্ত হই। ঋষিদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত। আর সমীক্ষণ অর্থে অন্বেষণ; আলোচনা বা অনুসন্ধান।

'অপঞ্চীকৃত ভূততত্ত্ব' কি তাহা হয়ত অনেকের বুঝিবার অসুবিধা হইবে। সংক্ষেপে বলিতেছি: আমাদের এই স্থূল দেহটি পঞ্চীকরণ অবস্থায় আসিয়াছে বলিয়া, আমরা স্থূল দৃষ্টিতে ইহা দেখিতে পাই। সৃষ্টিতত্ত্ব অনুশীলন করিলে বুঝা যায় সৃষ্টি সূক্ষ্মের দিক হইতে স্থূলের

দিকে আসিয়াছে। যাহাকে ভাষায় সম্যক প্রকাশ করা যায় না, সেটি চিৎ অব্যক্ত প্রকরণ। পরে অনুভূতি প্রকরণ আরম্ভ; ইহাই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম শম্পা-শক্তি সম্পন্ন মায়া প্রকৃতি। অহঙ্কারের শক্তির নাম মায়া। ক্রমে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অস্মিতা, তৎপরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি; বুদ্ধি হইতে সংকল্প বিকল্পাত্মক মন; তৎপরে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ তন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ); শেষে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। এগুলি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, স্থূল চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু ইহা মায়া প্রকৃতির সাহায্যে ক্রমশঃ পঞ্চীকৃত অবস্থায় স্থূলের দিকে আসিতে থাকে। যেমন ক্ষিতির পঞ্চীকৃত অবস্থা, ক্ষিতি অর্দ্ধেক, অপ দুই আনা, তেজ দুই আনা, মরুৎ দুই আনা, ব্যোম দুই আনা। এই ভাবে অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই চারিটি মহাভূতের সংমিশ্রণই পঞ্চীকরণ। ইহাই মহর্ষিগণের গবেষিত উক্তি। বাদরায়ণ বেদান্তদর্শনে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মসূত্রে উৎক্রান্তির অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কি প্রকার হয় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়, প্রাণবৃত্তি ভূত সূক্ষ্ম, সপিণ্ডীত হয়। মায়া প্রকৃতির বন্ধন মধ্যে থাকিয়া, সেই সূক্ষ্ম শরীর পরলোক যাত্রা করে। ইহাকেই বলে 'অপঞ্চীকৃত ভূততত্ত্ব'।

আমার মুল প্রতিপাদ্য বিষয় অপঞ্চীকৃত ভূততত্ত্ব হইলেও পঞ্চীকৃত অবস্থার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। অপঞ্চীকৃত অবস্থা এত সূক্ষ্ম যে আমাদের পঞ্চীকৃত স্থূল চক্ষে দেখা যায় না। তবে পঞ্চীকৃত শরীরে পরলোকবাসীকে আহ্বান করিয়া মিডিয়মের মধ্যে আনিতে পারিলে, সেই আবিষ্ট ব্যক্তির স্থূল দেহ-যন্ত্রের সাহায্যে, আমরা সূক্ষ্মদেহীর কথা শুনিতে সমর্থ হই। কিংবা সাধনার উচ্চস্তরে উন্নীত হইলে সাধক আপন সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা তাহা অনুভব করিতে পারেন।—গীতার ৭ম অধ্যায় ও ১৩শ অধ্যায়ে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি।

পরলোক সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার প্রেরণা কিরূপে আসিল, তাহা যদি এখানে না বলি ভূমিকা অসম্পূর্ণ থাকিবে মনে হয়।

বহুদিন পুর্ব্বের কথা, আমার বয়স তখন ১৬।১৭ বৎসর। আমি ও পূজনীয় পিতৃদেব দ্বিতলের একটি কক্ষে পাশাপাশি দুইটি বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় আমার খেয়াল আসিল বাবাকে জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যুর পর কি হয়? ভুত বলিয়া কিছু আছে কি?

তিনি সস্নেহে উপদেশ দিবার ভাষায় বলিলেন, "তুমি পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাস রেখনা; এ অবিশ্বাসে পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত হয় ও মানবত্তাকে হারাতে হয়।" পিতা বলিলেন, "যদিও আমি পরলোক সম্বন্ধে বিশেষ কোন চর্চ্চা করিনা তথাপি বলতে পারি এবং জেনেছি পরলোকে আত্মিকগণ থাকেন, তাঁদের ক্রিয়া অতি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক। আমার সংসারের একটি সত্য ঘটনা বলি। মনে করোনা বাবা একটা গল্প বা উপকথার মত কিছু বল্‌ছেন, সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা, মন দিয়ে শোন।"

"তোমার জন্মের ১৫ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃঃ এই ঘটনা ঘটে। আজ প্রায় ৩২ বৎসর পরে সেই সম্পূর্ণ ঘটনাটি তোমায় বল্‌ছি। বিষয়টি আমার আদৌ ভুল হয় না। তোমার বড় ভগ্নী জন্মাবার পর, তোমার আর একটি ভগ্নী হয়, সেটি তিন দিনের দিন হঠাৎ মারা যায়। তার পর তোমার আর একটি ভগ্নী জন্মাল; আমি প্রত্যহ তাকে দেখি, কোন রোগ নেই, হঠাৎ তোমার মা বল্‌লেন যে, মেয়েটি মারা গেল। দুটি মারা যাবার পর তোমার আর একটি ভগ্নী হয়, সেটিকে তোমার বড় ভগ্নীর কাছে রেখে তোমার মা খিড়কির পুকুরে কাঁথাখানি কাচতে গিয়ে ফিরে এসে দেখলেন মেয়েটি মারা গেছে। তার পর তোমার আর একটি ভগ্নী হয়, সেটিও ঐ ৫।৬ দিনের মধ্যে যথেষ্ট পাহারায় রেখেও মারা যায়।"

"তখন বাড়িতে সকলেই চিন্তাযুক্ত হয়ে উঠল। আমিও বিষম চিন্তিত হলাম। তোমার ছোট ঠাকুরদাদা মশায় ও তোমার মেজ

জ্যাঠা মশায় যুক্তি করে স্থির করলেন যে, কোন ভূতের ওঝা এনে দেখান যাক। তখন প্রসিদ্ধ ভূতের ওঝা ছিলেন হাওড়া জেলায় আমতার নিকট (আমতা হইতে ৬-৭ মাইল দূরে) দামোদর নদীর নিকটে 'বরদা' গ্রামের সার্থক মালাকারের ছেলে নবীন মালাকার দত্ত)। তাঁকে আনবার জন্য লোক পাঠান হল। এই নবীন মালাকারের বাড়ি এখান থেকে আন্দাজ ১৩।১৪ মাইল দূরে। পরদিন সকাল আন্দাজ ১১টায় ওঝা এখানে পৌঁছুলেন। নিয়োগী ঠাকুরের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বিশ্রাম করলেন। আমাদের সদরবাড়িতে উপর বৈঠকখানায় থাকবার স্থান দেওয়া হলেও তিনি আসতে রাজি হলেন না। অতঃপর বিশ্রামান্তে বেলা আন্দাজ চারটার সময় আমাদের সঙ্গে অন্দর মহলে এলেন। এই পূর্ব্ব পার্শ্বের নিচের মাটাম্ ঘরের মধ্যে তোমার মা ও পিসিমা গেলেন। এদিকে দর-দালানে দেখবার জন্য ত্রিশ চল্লিশ জন বিশিষ্ট লোক বসেছেন। ওঝা ঠিক দরজার বাইরে বসলেন। একটি জলপূর্ণ মাটির হাঁড়ি তোমার মাকে দেখাবার জন্য ওঝা বললেন। ওঝা প্রশ্ন করলেন, জলে কি দেখছেন? তোমার মা অতি ধীরে তোমার পিসিমাকে বললেন, জলটা ঘুরছে। তারপর ওঝা একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লাল বস্তু আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটি রোগিণীর হাতে দিন এবং এটাকে স্থির ভাবে দেখতে বলুন। যখন বাঁদিকে পড়ে যাবার উপক্রম হবে, তখন এটি হাতে ধরে নিয়ে বাঁ দিকেই শুইয়ে দেবেন। প্রায় পনর মিনিটের মধ্যেই বাঁ দিকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ঢলে পড়তে পড়তে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিটি ধরে নিলাম ও ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলাম। তার পর আরম্ভ হল ওঝার প্রশ্ন।"

"ওঝা—কে তুমি তোমার পরিচয় দাও।

(প্রেতকে প্রশ্ন হল)

প্রেত—না আমি পরিচয় দেব না। (উত্তর তোমার জননীর মুখেই ব্যক্ত হচ্ছে)

ওঝা—না বললে পরিত্রাণ নেই, দণ্ড নিতে হবে।

প্রেঃ—কুটুমপুরীতে আমার পরিচয় দেব না।

ওঃ—তবে দেখ্‌, তোর কি শাস্তি করি; ভূতের আবার কুটুমপুরী!

প্রেঃ—না-না শাস্তি করনা, বলছি, আমার নাম 'শ্যামা'।

ওঃ—শ্যামা কে?

প্রেঃ—এর মায়ের মামী। (অর্থাৎ তোমার দিদিমার মামী)

ওঃ—এর ছেলেগুলো মারে কে?

প্রেঃ—আমি মেরে নিয়ে যাই।

ওঃ—কেন নিয়ে যাস্‌?

প্রেঃ—এর মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল বলে।

ওঃ—এঁর মায়ের সঙ্গে ভাব ছিল বলে এঁর ছেলে মারিস?

প্রেঃ—এর মা এসে এর গর্ভে জন্মায়, তার সঙ্গে আমার ভাব ছিল বলে তাই মেরে সঙ্গী করি। আমরা একসঙ্গে এখানে থাকি।

ওঃ—চার বারই কি এঁর মা জন্মেছে?

প্রেঃ—হ্যাঁ, তার যে জন্মাবার সময় হয়েছে; মেরে নিয়ে গেলেও আবার জন্ম নিচ্ছে।

ওঃ—অন্যত্র জন্ম নেয় না কেন?

প্রেঃ—এর মা এই বাড়ীতেই মারা যায়, তার এই একটি মাত্র মেয়ে, মারা যাবার সময় মেয়ের জন্য বড় ভেবেছিল, সেই মায়ার টানেই এইখানে এসে জন্মায়।

ওঃ—সে জন্মাচ্ছে আর তুই তাকে মারছিস কেন? তুইও জন্ম নে না?

প্রেঃ—ইচ্ছা করলেই কি কেউ জন্মাতে পারে, না ইচ্ছা করলেই কেউ মরতে পারে?

ওঃ—বেশ যা মেরেছিস তাত মেরেছিস, আর মারা চলবে না। তা হলে নবীন তোকে বিষম দণ্ড দিয়ে তবে ছাড়বে।

প্রেঃ—না আমি আর মারব না, আমায় কোন শাস্তি করনা।

ওঃ—এই বাড়ীর সীমানায় আস্‌বিনা—শুনছিস্‌ ?

প্রেঃ—না, আমি আর কখনও আস্‌বনা।

ওঃ—থাম, তুই যে চলে যাচ্ছিস তার একটা চিহ্ন দিয়ে যেতে হবে।

প্রেঃ—কি চিহ্ন বল।”

“তখন ওঝা উপস্থিত জনগণকে প্রশ্ন করলেন, কি চিহ্ন করে যাবে, সকলে চিন্তা করে বা যুক্তি করে বলুন। তখন আমার খুল্লতাত মশায় অর্থাৎ তোমার কনিষ্ঠ পিতামহ বললেন, আমাদের খিড়কী পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে যে বড় শিমুল গাছটি আছে, তার একটা ডাল যদি ভেঙ্গে দিয়ে যায় তাহা হলে বিশ্বাস করব যে, ভূত চলে গেল।

তখন ওঝা প্রেতকে বলল, ‘এঁদের খিড়কী পুকুরের পাড়ে, শিমুল গাছের একটা মোটা ডাল চিহ্ন স্বরূপ ভেঙ্গে দিয়ে চলে যাও।

বলবার প্রায় দুই তিন মিনিট পরেই শুনা গেল, একটি ডাল ভেঙ্গে পড়ার শব্দ। সকলেই ছুটলেন খিড়কী পুষ্করিণীর দিকে; সেখানে বড় একটি মোটা শিমুল ডাল পুকুরে পড়ে রয়েছে দেখে দর্শকগণ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট। তোমার মায়ের জ্ঞান ফিরে আসবার পর, আমিও পুকুরে ভেঙ্গে-পড়া শিমুল ডালটি দেখে এসেছিলাম। তার পর ‘সুধীর’—তোমার ছোট দিদি জন্মাল, এবং পর পর তোমরা চার ভাই (১)। আর কোন বিপদ হয়নি।”

(১) চার ভায়ের মধ্যে লেখকই সর্ব্বকনিষ্ঠ।

এই বিষয়টি পিতার মুখে শুনিবার পর আমার মনে গভীর ভাবে পরলোক বিশ্বাসের ছাপ পড়িয়া যায়। পরলোক চর্চ্চা আরম্ভ করিবার কিছুদিন পরে, নবীন মালাকারের খোঁজ করিতে গিয়া জানিলাম, নবীন মারা গিয়াছেন; তাঁর পুত্র আশুতোষ এবং আশুতোষের পুত্র নীরেন সকলেই পরলোকগত। বংশে কেহ নাই। তবে নীরেনের দৌহিত্র ফণীন্দ্রের বংশ আছে। ফণীন্দ্রের তিন পুত্র—তিনকড়ি, নীলকণ্ঠ, দিবাকর ইহারা 'থলে' গ্রামে থাকেন।

ধীরে ধীরে যথাসময়ে উপস্থিত হইল জীবনে পরলোক চর্চ্চার সূত্রপাত। প্রথমে 'দৈহবাণী' বইখানি পাঠ করি। তাহাতে মিডিয়মের সাহায্যে লেখক যতগুলি আত্মিককে আনিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্তগুলি দেওয়া ছিল। তৎকালে পরলোক সম্বন্ধে পুস্তক অতি অল্পই ছিল এবং উত্তম গুরুও মিলিত না। তজ্জন্য বহুবার চক্র করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কিন্তু পিতৃদত্ত বিশ্বাস আমাকে হতাশ করে নাই। যৌবনে কংগ্রেসে ছিলাম। এমন ঘটনা দেখা দিল আমাকে মহাকোশলের জব্বলপুর সহরে থাকিতে হইল। সেখানে, 'প্রাচীন পরলোক-তত্ত্ব বিজ্ঞান মণ্ডল' নামে একটি অনুধ্যান কেন্দ্র স্থাপন করি। তাহাতে অনুসন্ধিৎসু লোকের অভাব হইল না। সংকল্প দৃঢ় হইলে সিদ্ধি সুনিশ্চিত। প্রথমেই আমাদের চক্রে 'লুসী' নামে বম্বের একটি খৃষ্টান মহিলার আবির্ভাব হয়। পরে বহুস্থানে চক্র করা হইয়াছে। পুস্তকের মধ্যে যথাস্থানে তাহার বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

এই পুস্তকে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইবে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—জন্ম হইতে মৃত্যু, এবং মৃত্যুর পরের অবস্থা। পরলোকবাসী আত্মিককে কিরূপে আনা যায়, গীতায় জন্মান্তরবাদ, গীতার জন্মকথা প্রভৃতি যতগুলি বিষয় দেওয়া হইয়াছে তাহা সূচীপত্রের তালিকায় মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

এইবার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা এবং টুকটাক সামান্য কিছু লিখিয়া অবতরণিকা শেষ করিব।

যখন আমাদের মনব্যাধি উপস্থিত হয়, তখন বিশ্বাস অবিশ্বাস লইয়া আমরা কৌতূহলজনক বহু গবেষণা করিয়া থাকি। যেহেতু ঠিক উপদেষ্টার অভাবে এবং বিচলিত মন দ্বারা পরলোক চর্চ্চায় অনেকেই বিফল মনোরথ হন, শেষে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। এই সব কারণেই বিশ্বাস হারাইয়া বসেন। যাঁহারা পরলোক চর্চ্চা করিবেন তাঁহাদের মনস্তত্ত্বের আলোচনা অল্প-বিস্তর সকলেরই করা উচিৎ।

শরীর যেরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, মনও তদ্রূপ ব্যাধি ভোগ করে। মনের ব্যাধি চিন্ময় জগৎ হইতে সঞ্জাত। সেই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি পরলোক অনুধ্যান করিতে বা ঠিক ভাবে ভগবানে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ। যেমন পাগল তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মনের অবস্থার জন্য নিজের পাগলামি বুঝিতে অক্ষম হইয়া থাকে।

এই স্থূল জগতে উদ্ভূত বহু দৈহিক পীড়াকে নিরাময় করিবার যেরূপ উপায় ও ঔষধ বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ মানসিক ব্যাধি যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিগণ সম্যক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ষড়রিপু, মায়া ও বাসনার দ্বারা মন ক্ষিপ্ত থাকে। তখন সংযম অর্থাৎ নিত্য নিঃসঙ্গ অভ্যাসের দ্বারা কিছুটা সুরে আনা যায়। আবার ইচ্ছা না থাকিলে অভ্যাসে বিরক্তি আসে। মনের ক্রিয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায়, অবচেতন মনে অনিচ্ছারূপী বিরোধী গুণসম্পন্ন একটি দুর্ব্বলাংশ প্রতিচ্ছায়া থাকে। তাহার ক্রিয়া আজীবন বিতর্ক ও বিচার করা, কল্পিত ধর্ম্ম লইয়া কর্ম্ম না করা। ইহাতেই একাগ্র ইচ্ছা ব্যাহত হয়। ইচ্ছাশক্তি মনেরই একটি স্ফুরণ বা বৃত্তি।

ইচ্ছাকে বলিষ্ঠ করিতে পারিলে বহু কাজ সহজে সিদ্ধ হয়। বলিষ্ঠ করিবার উপায়, অবসাদ আলস্য দূর করিয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট

কেন্দ্রে মনকে সংযম সহকারে স্থির রাখিতে অভ্যাস করা। অর্থাৎ দিবা-রাত্রির কিছু সময় একটি জ্ঞানকল্প হ্রস্ব বিষয়ে মনকে লাগাইয়া রাখা। 'হরে কৃষ্ণ'ই বল আর গুরুদত্ত বীজমন্ত্রই বল, তাহাতে মনকে অচঞ্চল ভাবে স্থির রাখা। অথবা মনসুরে প্লুত স্বরে 'ওঁ' (অ-উ-ম) বলিতে থাকা। কিছুকাল এরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন। তৎপরে নিরাবলম্ব অভ্যাসের যত্ন লইতে হয়।

তার্কিকের বহু ছল ; সে বলিবে, মন ইচ্ছার কর্ত্তা, ইচ্ছা কিরূপে মনকে চালাইবে! মনে করুন 'মন' একটি সদ্যপ্রাপ্ত খনিজ হীরা। তাহা উজ্জ্বল করিতে হইলে হীরা দিয়াই কাটিতে হইবে ; অন্য ধাতু দিয়া যেমন হীরা উজ্জ্বল করা যায় না, তদ্রূপ মনের ইচ্ছা দিয়াই মনকে শক্তিমান করিতে হয়। মনের ব্যবস্থা আনিবার জন্যই ইচ্ছা-শক্তির পরিপুষ্টি সাধন আবশ্যক হয়। মনকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া একমুখী করিয়া প্রত্যহ অভ্যাসের দ্বারা অবচেতন মনের ময়লা, ইচ্ছার তীব্র চাপে অতি সহজে নির্ম্মল হইয়া উঠে। তখন অন্তরে যে সুর বাজে তাহা পবিত্র আত্মমুখী সুরে অনুরণিত হয়। জাগতিক বিষয় বুঝিবার শক্তিলাভ ঘটে। অবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। সূক্ষ্ম জগতের উপর ইচ্ছাশক্তির স্থির স্থিতিলাভ দেখা দেয়। তখনই সূক্ষ্ম জগতের এই সামান্য ক্রিয়া অর্থাৎ পরলোক চর্চ্চায় যোগ্যতা আসে। ফল কথা, ঈশ্বর বিশ্বাসী ভিন্ন এই পরলোক চর্চ্চায় অগ্রসর হওয়া, ইহার অনুষ্ঠান করা, কোন ক্রমেই শ্রেয় নয়। যোগ্যতার অভাবে এবং আত্মবিশ্বাস না থাকিলে ভোগীর মনে সন্দেহজনিত বিঘ্ন দেখা দেয়। যাহারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত, অত্যন্ত ভোগ বিলাসী. সাধারণতঃ তাহারা পরলোকে আবিশ্বাসী হয় ; ভোগের এমনই মহিমা। তাহাদিগের একথা জানিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে যে, প্রতীতিই প্রমাণ নয় ; রজ্জুকেও সর্পভ্রম হয়। ভুল অনেক রকমের হয়।

স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তি তাঁহাকেই বলা যায়, যিনি মস্তিষ্ক-জাত পরিকীর্ণ চিন্তা-তরঙ্গগুলি বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে কেন্দ্রীভূত

করিয়া একটি বিরাট চৈতন্য শক্তিতে অর্থাৎ পরমাদ্বৈতে নিমগ্ন করিতে সমর্থ। ভগবৎ চিন্তনের প্রথম অবস্থায় ইচ্ছার আবশ্যক আছে। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তার চরম অবস্থায়, ইচ্ছার ক্রিয়া ভুঙ্গ বলে থাকিয়াও কেন্দ্রীভূত বা স্থির হইয়া যায়। এগুলি উচ্চ মনস্তত্ত্বের বিষয়।

অনেকে দুই চারিদিন চক্র করিয়াই ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া পড়েন এবং শেষে ছাড়িয়া দেন। ইহাও এক প্রকার সাধনা। মন একাগ্র হইলে ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়াছে জানিতে হইবে। এই ইচ্ছায় অনেক কিছু করা যায়। পূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। তখনই পরলোকবাসী আত্মিককে ডাকা বা চক্রে আনা সহজ হইয়া পড়ে।

সূক্ষ্ম জগতের ব্যাপারে মনেরই খেলা। পরপুষ্ট মনের অবস্থা হইতেছে—কর্ম্ম করিবার সময় সমতা রাখিতে পারে না। সুতরাং অব্যবস্থিত হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয়গ্রামের অতীত মন, একটি উগ্র অত্যভিলাষী স্বতন্ত্র ও গুণাশ্রয়ী বস্তু। ইহা ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে সতত আসে, এবং বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্নায়ুবৃত্তির যে সুর উঠে, তাহাতে মাতিয়া যায়। তম ভাবাপন্ন মনের কোন সৎসাহস থাকে না, পরিতৃপ্তি থাকে না, একাগ্রীকরণ শক্তি নাশপ্রাপ্ত হয়, নিকৃষ্টমার্গে আনন্দের অন্বেষণে, শুদ্ধ আনন্দ হারাইয়া বসে; ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও মন্দীভূত হইয়া যায়; শেষে মননশক্তি ক্ষীণ হইয়া চঞ্চল মন নিদ্রিত চৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা পরলোক চর্চ্চা করিবেন, তাঁহাদিগকে মনটি লইয়া সতত সাবধানে খেলা করিতে হইবে। দুর্ব্বল মনে 'পরতের ভয়' অর্থাৎ প্রেতের ভয় উঁকি মারিতে থাকে। সাত্ত্বিক ভাবে থাকিলে মন বলিষ্ঠ থাকে।

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, পরলোকবাসী আত্মিক চক্রের নিকট আসিয়া মিডিয়মের বিনা সাহায্যে কথা বলেন না কেন?

ইহার সহজ উত্তর এই, তাঁহারা ত বলেন, পরন্তু আমরা শুনিতে পাই না। আমরা কথা বলিলে বহির্জ্জগতে শব্দের একটা কম্পন উঠে এবং সেই কম্পন, কর্ণপটহে প্রতিহত হইলে আমরা শুনিতে পাই। প্রশ্নকর্ত্তার এ বিষয়টি জানা নাই যে, প্রতি সেকেণ্ডে যদি চব্বিশ কম্পনের নিচে শব্দ-কম্পন হয় তাহা আমরা স্থূল পঞ্চীকৃত কর্ণেও শুনিতে পাই না। বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যম সুরটিতে সেকেণ্ডে দুইশত ছাপ্পান্ন বার কম্পন হয়। তাহা ভালই লাগে। আর যদি ব্যোম মারণাস্ত্রের শব্দ এরূপ হয় যে, শব্দ-কম্পন সেকেণ্ডে ৩২৭৬৮ বার, তাহা হইলে কর্ণপটহ সহ্য করিতে অসমর্থ হয়। পরলোকবাসী আত্মিকগণ অপঞ্চীকৃত অবস্থায় থাকেন, মনের সাহায্যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলেন, বহির্জ্জগতের ব্যোমে সে কম্পন উঠে না, সুতরাং তাহাদের কথাও আমরা শুনিতে পাই না। চক্র করিলে মাধ্যমের মধ্যে আত্মিক যখন আবিষ্ট হন, তখন মাধ্যমের বাক্‌যন্ত্র ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ব্যবহার করেন। তাহাতে ব্যোমে কম্পন উঠে এবং আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাই।

আলোচ্য তত্ত্বগুলি অতি পুরাতন। অতীত যুগে পূজ্য ঋষিগণের এটি জ্ঞানলব্ধ বিষয়। তাঁহারা আমাদের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল চর্চ্চা না থাকায় অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা দেখা দিয়াছে। আমাদের পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত জানা উচিত যে, ঋষিগণ না জানিয়া না বুঝিয়া, এই দার্শনিকের দেশে অকল্যাণজনক কোন কার্য্য করেন নাই। সম্যক তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তাহা রাখিয়া গিয়াছেন।

যে জগৎপূজ্য বরেণ্য মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত লিখিয়াছেন, যিনি লক্ষ শ্লোক মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে সাতশত পঁয়তাল্লিশ শ্লোকের উপনিষদরূপ 'গীতা' আমাদের আত্মিক উন্নতির জন্য দিয়াছেন, সেই মহাভারতের 'আশ্রমিক পর্ব্বে' পরলোকবাসীর বিষয় সকলকে

পড়িতে অনুরোধ করি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর মুনিরাজ বেদব্যাস তপোবনে শোকাকুলা গান্ধারী প্রভৃতিকে যুদ্ধে মৃত পরলোকবাসী আত্মীয়গণকে দেখাইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে অর্থচিন্তা, অবিশ্বাস ও সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান যেন পাইয়া বসিয়াছে। এমন কতকগুলি মানব জন্মান্তরের জড়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাহা ভগবৎ বিশ্বাসী অল্পজ্ঞ মানব চর্চ্চা ও সামান্য সাধনে বুঝিতে এবং অনুভব করিতে সক্ষম, তাঁহারা তাহা হইতে একস্তর নিচে নামিয়া পড়িয়াছেন। সেই অবিশ্বাসী ব্যক্তি-গণকে অনুরোধ করি, যেন ধীর স্থির ভাবে শুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া পারলৌকিক জীবনের কর্ত্তব্য করিতে যত্ন ও চেষ্টা রাখেন। অর্থকরী বিদ্যার জ্ঞান লইয়া, জড় বিজ্ঞানের মোহে একেবারে জড়বাদী হইয়া থাকা সমীচীন নয়। পরলোক অনুধ্যানের পর অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস দূর হইয়া যায়, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পাশ্চাত্ত্য মনীষী লেট্‌বিটার সাহেবও সেই কথাই বলেন—যিনি পরলোক সম্বন্ধে বহু যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভূমিকায় এত লেখার আবশ্যক ছিল না ; যদিও ইহা ক্রুটির মধ্যে ; তথাপি ভাবের আবেগে বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া লিখিয়া ফেলিলাম, যদি এই পুস্তক পাঠে একজনেরও পারলৌকিক জীবন সুখের করিতে প্রেরণা জাগে।

এই পুস্তকখানির ভাষা অধিবিদ্য ব্যক্তির লেখনী-প্রসূত নয়। সুতরাং ভুলভ্রান্তি, গুরুচণ্ডালী দোষ থাকা সম্ভব। বিষয়গুলি এমনই জটিল যে, একদিক হইতে অন্যদিকে চলিয়া যায়। তজ্জন্য তাহাতে তার্কিকগণ তর্ক উঠাইবার বহু সুড়ঙ্গ পথ দেখিতে পাইবেন। তথাপি আশা করি সুধী পাঠকবৃন্দ সাধুগণের ন্যায় অনাবিল চশমা লাগাইয়াই পড়িবেন। সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যতটুকু শক্তি, যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন, তাহার ক্রুটি করি নাই। বহুদিন পশ্চিম দেশে থাকায় বঙ্গভাষা কিছু হারাইয়া বসিয়াছি।

সাধারণতঃ অনেক সময় দেখা যায়, পাঠকগণ আপন আপন রুচি অনুযায়ী কেহ বা ভাষা, কেহ বা ভাব, কেহ বা যুক্তি বিচার, কেহ বা অবিশ্বাস প্রভৃতি নানা দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যেমন অভিনয় বা যাত্রা দেখিতে গিয়া কেহ গান, কেহ রোমাঞ্চকর বাগবিন্যাস কেহ বা যুদ্ধ ও তলোয়ার খেলা, কেহ লেখকের ভাব, কেহ নাচ, কেহ বা রূপসজ্জা লইয়া বিচার ও আপন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং যিনি যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি অর্থাৎ পরলোক সম্বন্ধে পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি এই পুস্তক সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য বা উপদেশ দিলে বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

সর্ব্বশেষ—-কৃতজ্ঞতা স্বীকার। আমার পরলোকবাসী দিদি, পূজনীয়া ৺সুধীরবালা দেবী দিব্যলোকে থাকিয়া আমাকে পরলোক সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গীত

নে মা, অনুরাগের জবা উদ্দেশে দি চরণতলে,

মা, কোথা তোর চরণ পাবো গো—

(ওমা) বুঝাইয়ে দে মা তনয় বলে।

মূর্ত্তি গড়ে সবাই পুজে মা, ফুলে ফলে গঙ্গাজলে,

বিশ্বমায়ের করব পূজা গো,—

মা কর্ম্মফলে আর অশ্রুজলে।

এষণা হটিয়ে নে মা, মায়ার ফাঁদে দিস্‌না ফেলে,

স্থির করে দে মনের খেলা গো,—

মা পূজায় বসি আপন ভুলে।

চিন্ময়ী রূপেতে মাগো বিরাজ কর হৃদ্‌কমলে,

সুখের নেশা ভেঙ্গে দিয়ে গো,—

নে মা চিদানন্দের বাধা তুলে।

ফণি তন্ময় হোক আপন ভুলে।

—ফণি।

প্রথম স্তবক

ঈশ্বর ও জীবাত্মা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত

'ঈশ্বর' (ঈশ্‌+বর); ঈশ্‌—মহিমান্বিত, নিয়ন্তা ; বর—শ্রেষ্ঠ, উত্তম পুরুষ ; অর্থাৎ, কূটস্থ চৈতন্য। তিনিই সমষ্টিভাবে সশক্তি মহিমান্বিত পরমেশ্বর। আর 'আত্মা' ব্যষ্টিভাবে পরমেশ্বরেরই অংশরূপে তাদাত্ম্য। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

এই পরমাত্মা ও জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে পাঞ্চভৌতিক দেহাতিরিক্ত কিছু আছে, তাহা ধারণা করিবার জন্য শাস্ত্র হইতে অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ্‌, দর্শন প্রভৃতি হইতে সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। ঈশ্বর ও জীবাত্মা বুঝাইবার পরিভাষা এখনও সৃষ্ট হয় নাই। উহা 'অবাঙ্‌মানসগোচর'। মানবের চেষ্টা ও তাহার ভাষা যাহা প্রকাশ করিয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ, কার্য্য দেখিয়া কারণ লেখা, তাহাও আংশিক মাত্র। সুতরাং অপরিভাষিত সূক্ষ্ম বিষয়ের বর্ণনা করা ভাষার সাহায্যে অসম্ভব। উদাহরণতঃ, নিম—তিক্ত ; এবং লঙ্কা—ঝাল ; যেমন তিক্ত ও ঝাল স্বাদ ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ, তেমনই ঈশ্বর ও জীবাত্মা ভাষার সাহায্যে প্রমাণ দিয়া সম্যক্‌ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা অপূর্ণই থাকে। সেইজন্য এই সূক্ষ্ম বিষয়ের কার্য্য দেখিয়া কারণের সান্নিধ্য পাওয়া অসম্ভব। তবে ঈশ্বর ও জীবাত্মা যে আছেন ইহা সত্য, সূর্য্যালোকের ন্যায় সত্য।

একস্থানে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্কর ভাগবত ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যানুবাদে লিখিয়াছেন ঃ

"যত্তু উক্তং সদাত্মা সন্ আত্মানং কথং ন জানীয়াদিতি ? নাসৌ দোষঃ, কার্য্যকারণসঙ্ঘাতব্যতিরিক্তঃ অহং জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তেত্যপি স্বভাবতঃ প্রাণিনাং বিজ্ঞানাদর্শনাৎ কিমুতস্য সদাত্মবিজ্ঞানম্ ?"

অর্থ,—'পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা (জীবাত্মা) সৎ স্বরূপ হইয়াও কেন নিজেকে সৎস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন না ? এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে, কারণ, কার্য্যকারণ সঙ্ঘাত ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন ; জীব আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা, অর্থাৎ অহংভাব, প্রাণিগণের এই স্বাভাবিক জ্ঞানটুকুও যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন তাহাদের সদাত্মবিজ্ঞানের কথা আর কি বলিব'।

এইবার ঈশ্বর সম্বন্ধে ও জীবাত্মা সম্বন্ধে শাস্ত্রাভিমত কি তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। পরব্রহ্মের বা ঈশ্বরের স্বরূপ তিন প্রকার, যথা,—সত্তা, চৈতন্য, সুখ বা আনন্দ। এ সম্বন্ধে যে শ্লোক আছে তাহা নিম্নে দিলাম ঃ

"সত্তা চিতিঃ সুখেঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্ম ন ত্রয়"।

পঞ্চদশী ১৫।২০

এইবার কার্য্য ও কারণ লক্ষ্য করিতে হইবে। মৃত শরীরে সত্তার অভাব হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্য থাকে না বা শুদ্ধ থাকে, কিন্তু যথাকালে জাগ্রত অবস্থায় চৈতন্য প্রকাশ পায়। প্রশংসায় বা দরিদ্রের অর্থলাভে ও অপুত্রকের পুত্রলাভে আনন্দ জাগে। সুতরাং আমাদের ভিতর সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের কার্য্য দেখিয়া প্রত্যেকের ভিতর কর্ত্তারূপী ঈশ্বর আছেন, তাহা প্রতিপন্ন করা যায়।

এইবার ষড়্দর্শনের অভিমত কি তাহা সংক্ষেপে চর্চ্চার আবশ্যক। 'সাংখ্য শাস্ত্র' নিরীশ্বর শাস্ত্র। তত্ত্ব সমাস বা কারিকায় ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। 'মীমাংসাদর্শন' মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী। 'ন্যায়'

ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। বরং চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি-নিরাস প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন যথা,—

"ঈশ্বরঃ করণং পুরুষ কর্ম্ম ফল্য দর্শনাৎ"।

'মানুষের কর্ম্মফল ভোগ যাঁহার অধীন তিনিই ঈশ্বর।' 'বৈশেষিক দর্শন' ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। 'পাতঞ্জল দর্শন' গৌণ ভাবে ঈশ্বর স্বীকার করেন। ইহাতে ঈশ্বরের সংজ্ঞা এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে ঃ—

"ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর"।

'যে পুরুষ বিশেষ, ক্লেশ, বিপাক, ও আশয়ের সম্পূর্ণ শূন্য তিনিই ঈশ্বর'। 'বেদান্ত দর্শন' ঈশ্বর বা ব্রহ্ম মানেন। বেদান্তের প্রথমেই লিখিয়াছেন, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"।

দর্শনের সাহায্যে আমরা ঈশ্বর বা আত্মজ্ঞানের অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হই। ব্রহ্মদর্শনাকাঙ্ক্ষী সাধক প্রথমে 'ন্যায়' ও 'বৈশেষিক' দ্বারা এই স্থূল দেহের বা সূক্ষ্ম শরীরের অতিরিক্ত যে 'আত্মা' আছেন তাহার জ্ঞানলাভ করেন। তাহার পর 'সাঙ্খ্য' ও 'পাতঞ্জলে' আত্মার নির্গুণত্ব ও শেষে 'পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসায়' আত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে।

দর্শনের কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ। জৈমিনীর মীমাংসা দর্শন এবং বৈয়াস অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই। বেদার্থ উত্তমরূপে জানিবার জন্য জৈমিনী ও ব্যাস শ্রুতির পরগামী হইয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপনিষদ্ প্রভৃতিতে ও গীতায় ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা লেখা অসম্ভব।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্মভাবে সংক্ষেপে বিচার করিতে হইলে,

কারণতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদিগকে একটি বৃক্ষের মূল অর্থাৎ মূল প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নে শাখা প্রশাখায় নামিয়া আসিতে হইবে। প্রথমে কোন অজানা মহাকল্পে যখন কেবল সৎ-রূপী 'চিৎ' ছিল, সেই চিৎ-ই বিশ্বকারণ। তাহা জগতের অতি সূক্ষ্ম ও গভীরতম প্রদেশের নিষ্কম্প ক্ষান্ত স্থির অহংতত্ত্ব। ইহাই সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ ঈক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ব্যাধুত হইলে মায়া প্রকৃতির উদ্ভব হয়। সেই অহংতত্ত্বের স্থির পরমাণু-পুঞ্জ তৎকালে অসংখ্য বেপমান বিশুদ্ধ শম্প্রাশক্তিসম্পন্ন হইয়া বিশ্ব বিকাশের বীজস্বরূপ সেই 'চিৎ' পরমাণু, পৃথক পৃথক নির্গুণ মায়া-প্রকৃতির আবরণের মধ্যে অবরুদ্ধ হন। সেই 'চিৎ' স্বরূপ ব্রহ্ম মায়াবরিত অবস্থায় তদেক হইয়া অর্থাৎ তৎস্বরূপ হইয়া হিরণ্ময় কোষমধ্যে অবস্থিতির জন্য 'ঈশ্বর' উপাধি প্রাপ্ত হন। হিরণ্ময় কোষ যাহা নির্গুণ মায়াপ্রকৃতি ; ইহা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাল, হ্লাদিনী শক্তি, নিয়তি ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জন্ম হইল। পরে মায়ার জড়মুখী কিছু অংশ সগুণত্ব লাভে অবিদ্যা ভাব প্রাপ্ত হইয়া, পরপর পঞ্চ কোষের বিকাশ ও মনের উৎপত্তি। ক্রমশঃ তন্মাত্র পঞ্চমহাভূত সূক্ষ্ম, এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় পরিশেষে এই জড় ভাবাপন্ন প্রকৃতির উদ্ভব। মোটামুটি সৃষ্টির অনুক্রম এইরূপ। সৎ (পুরুষ) ও তৎ (প্রকৃতি) সংযোগে যখন সিসৃক্ষা (সৃষ্টির সঙ্কল্প) হয় তখন একটি নিমিত্ত কারণ, অন্যটি উপাদান কারণ হয়।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।

মণ্ডক ২।২।৯ দেবীগীতা ৬।১২

এই হিরণ্ময় কোষই সুক্ষ্মতম শ্রেষ্ঠ কোষ (ইহাই নির্গুণ মায়া বা মহামায়া)। সেইজন্য 'পরে কোষে',' বিরজ অর্থাৎ শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নিষ্কল ব্রহ্ম অর্থাৎ মায়া বিরহিত ব্রহ্ম থাকেন। ঈশোপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রে এই বিষয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে ঃ

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পুষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

ঈশ ১৫।

'হিরণ্ময় আচ্ছাদনে সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে ; হে পুষণ! সেই আচ্ছাদন অপসৃত কর, আমি সত্যধর্ম্মা হইয়াছি। আমি সত্যের অর্থাৎ 'সৎ'-এর অনাবৃত মুখ দেখিব।'

হিরণ্ময় আবরণে আচ্ছাদিত 'সত্যই' মায়া উপহিত জ্যোতির্ম্ময় স্বচ্ছ পরমাত্মা। তৎ (প্রকৃতির) অলীক আবরণে 'সৎ' পরব্রহ্ম ঈশ্বর উপাধি প্রাপ্ত। 'মায়া' ব্রহ্মের শক্তি। যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি সেইরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। অতএব পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর প্রায় অভিন্ন। এখন নিষ্কর্ষ এই যে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই মূল বস্তু। ঈশ্বর ও জীবাত্মা, মায়া ও অবিদ্যা উপাধি কল্পিত। এখানে বিচারবুদ্ধি বোধহীন হয়, ভাষা স্তব্ধ হইয়া যায়। মনে হয়, এই প্রতীতিও অলীক একটা মনোভ্রম মাত্র। তিনি যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্বের আত্মস্বরূপ (অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্); সেই প্রহেলিকার সমাধান করা কত কঠিন। তথাপি মানব চিন্তা অবসর লয় না। বেদান্তের ৩ অঃ ২ পাঃ-এ আছে : "তদব্যক্ত মাহহি"—'শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রাহ্য বা গৃহীত হন না।'

পঞ্চদশীর ১ম পরিচ্ছেদে 'তত্ত্ব বিবেকে' ১৫।১৬।১৭ শ্লোকে আছে : আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্ম অবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। প্রকৃতি দুই প্রকার, মায়া ও অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের নৈর্ম্মল্যহেতু প্রথম প্রকারের নাম 'মায়া' এবং মালিন্য প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'অবিদ্যা'। উক্ত মায়াতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তিনি সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন। উক্ত অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সেই অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীব শব্দে কথিত হন। পঞ্চদশীর প্রথম পরিচ্ছেদে ২৪ শ্লোকে তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের প্রভেদ কি তাহা লিখিত আছে।

ব্যষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানীর নাম তৈজস এবং সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানীকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। অর্থাৎ ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি ঈশ্বর।

মায়াবিদৌ বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥

১।৪৮ পঞ্চদশী।

'বস্তুতঃ ব্রহ্ম, তিনি অখণ্ড চৈতন্য, বিশ্বের আত্মস্বরূপ ও নিরুপাধিক। যখন তিনি মহামায়ার শক্তির মধ্যে অর্থাৎ হিরণ্ময় কোষে প্রথমতঃ অবরুদ্ধ হয়েন, তৎকালে মায়া উপাধির জন্য তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়; একেই বলে কূটস্থ চৈতন্য। এবং তিনি যখন ক্রমশঃ পঞ্চকোষের মধ্যে অবিদ্যা মায়ার উপাধিতে জড়িত হইয়া পড়েন তখন তিনিই জীবপদ-বাচ্য হয়েন।'

শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"।

তৈত্তিরীয় ২।১।১

অর্থাৎ তিনি সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত। অনন্ত অর্থে শেষ যাহার নাই, তিনি সর্ব্বব্যাপক বলিয়াই ব্রহ্ম।

"বৃহত্ত্বাৎ বৃংহনত্বাদ্ যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ"।

'সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সকলের সংবদ্ধকত্বহেতু ব্রহ্ম নামে কথিত হন।' কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঃ

"সর্ব্বে বেদা যদ্পদমামনন্তি"।

'সমগ্র বেদই সেই ব্রহ্মকে বর্ণনা করিয়াছেন।' বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের একমাত্র মুখ্য বিষয় সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। গীতায় বলিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"।

'সকল বেদের বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তু আমিই অর্থাৎ ঈশ্বরই'।

শ্রুতি ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন। বেদ একাত্মবাদী;

তাহার প্রমাণ এই, 'চিৎ' পরমাণু নির্গুণ মায়াপ্রকৃতির আবরণে অনন্ত অংশে এই বিরাট সৃষ্টিতে প্রকাশ। আমাদের তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি মোহাবিষ্ট থাকায় অর্থাৎ বুদ্ধিশক্তি সন্ধানরত না থাকায় সংশয়াত্মা হইয়া বহু দেখি। পরন্তু জগতে যে তাহা বহু হইয়াও মাত্র একটি রূপে প্রকট তাহা সহজেই সিদ্ধ হয়। একের অবিকল নিখুঁত অনুরূপ অনেকগুলি বস্তু একত্রিত হইলেই বহু হয়। এই পৃথিবীতে যে কোন বস্তু বা জীব লইয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, একটির সঙ্গে অন্যটির জাতিগত মিল থাকিতে পারে, কিন্তু গঠনের নিখুঁত সাদৃশ্য নাই, ইহাই সৃষ্টির বিশেষত্ব। যেমন এই পৃথিবীতে প্রায় দুই শত চল্লিশ কোটি লোক, প্রত্যেক মানব ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ। একটির সঙ্গে অন্যটির আদৌ মিল নাই। ভবিষ্যতে মিল হইবেও না। সুতরাং মার্জ্জিত জ্ঞানের দৃষ্টিতে একের অনুরূপ আর একটি না থাকায় বহুর অভাব প্রতিপন্ন হইতেছে! যেহেতু 'সৎ'-এর বৈশিষ্ট্য যে এক, নির্গুণ মায়াপ্রকৃতি তাহাকে অনন্ত অংশ করিলেও 'সৎ'-এর বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না। একটি ক্ষুদ্র পত্রেরও জোড়া মিলে না; অনুবীক্ষণ যন্ত্র তার প্রমাণ দেয়। এইহেতু শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রতিপন্ন হয়। ইহা হইল বহিঃস্থ বিচার, আর অন্তর্মুখী বিচারে ভিতরের সূক্ষ্ম শরীরও কারণ-শরীর অতিক্রম করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিব যে, প্রত্যেক জীবে সেই একই বিশ্বাত্মা বিরাজিত।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।

গীতা ১৩।১৬

'তিনি চরাচর ভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত আছেন।' তিনিই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

জগৎ—গম্-ধাতু + ক্বিপ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ; ইহার অর্থ যাহা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে গমন করে। আর যাঁহার পরিবর্ত্তন নাই, যাঁহার অস্তিত্বে জগতের অস্তিত্ব তিনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম

অনেকগুলি কোষমধ্যে বিরাজমান। তজ্জন্য তিনি আমাদের নিকট অপ্রকাশ। গীতায় ভগবান বলিতেছেন ঃ

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।

গীতা ৭।২৫

'আমি যোগমায়া সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি।' আত্মা (জীবাত্মা) ও পরমাত্মা (ঈশ্বর) সাধারণ দৃষ্টিতে পৃথক বিভূতি-সম্পন্ন মনে হইলেও ইহা মায়িক মাত্র। অতএব সূক্ষ্ম বিচারে ঈশ্বর, আত্মা (জীবাত্মা) একই। ন্যায়মালায় উক্ত হইয়াছে ঃ

বাস্তববিরোধাভাবাদ্ আত্মত্বে নৈব ব্রহ্ম গৃহ্যতাম্।

'যেহেতু আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন অতএব আত্মাই ব্রহ্ম এই ভাবনা কর'। এই আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয়। শ্রুতিতে আছে,—

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য।

'সেই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয়।' ব্রহ্ম যে আত্মরূপে হৃদয়ে রহিয়াছেন শ্রুতি তাহাও উপদেশ দিয়াছেন ঃ

কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।

—বৃহদারণ্যক।

'আত্মা কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যিনি চিন্ময় অন্তর্জ্যোতি পুরুষ প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন।'

ঈশ্বরই জীবরূপে বিরাজিত এ কথা ভাগবতে স্পষ্ট উপদিষ্ট দেখা যায়।

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥

ভাগবত ৩।২৯।২৯

'এই সকল ভূতকে বহুমানসহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে; ভগবান ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।'

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণম্।

'ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবাত্মাকে) দেহে পূজা করিবে।'

পরব্রহ্ম যখন মায়ার দ্বারা গৃহীত হন, তখন তাঁহাকে মহেশ্বর বলে।

মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

'যিনি মায়াযুক্ত তিনিই মহেশ্বর।' উক্ত উপনিষদে আছে ঃ

'ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।'

'তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন—কেবল শিব।' এই শিবের পূজায় আমাদের আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়, মঙ্গল হয়, পারমার্থিক উন্নতি হয়। তিনি যে আত্মারূপে অন্তরে বিরাজমান।

ঈশ্বর ও আত্মচর্চ্চায় শাস্ত্রীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সংক্ষেপে যাহা লিখিত হইল তাহাতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে প্রমাণ হয় যে, ঈশ্বর ও আত্মা (জীবাত্মা) মায়া ও অবিদ্যা উপাধিতে প্রতীতি হয়; পরন্তু সৎ বা চিৎই ব্রহ্ম, তিনি নিরুপাধিক। যখন তাঁহাতে মায়াশক্তির উপাধি সংযুক্ত হয় তখন তিনি ঈশ্বর। আর যখন তাঁহাতে অবিদ্যামায়া ও কোষ উপাধির নিবিড় আবৃত্তি যোগ হয় তখন তিনি জীব পদবাচ্য হন। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবাত্মা, তত্ত্ব হিসাবে একই বস্তু। আমার অস্তিত্ব ও জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর ও আত্মা আছেন। সমষ্টি ভাবে ঈশ্বর, এবং ব্যষ্টি ভাবে আত্মা।

সৎস্বরূপ যথার্থ সত্যের উপলব্ধিতে মানব প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি। আত্মিক বিশ্বের সহিত আমাদের পরিচয় অতি কম; আছে কেবল মায়িক ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে ইন্দ্রিয় বোধে। সমগ্র জাগতিক নির্গুণ ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়। আর খণ্ডিত অবিদ্যাচ্ছন্ন সগুণ মানবিক সত্তা আমাদের সমগ্র দেহ, মন, বাসনা ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। অতএব ঈশ্বর বা আত্মার সন্ধানে ক্লিষ্ট পথে যাত্রা ভব্যের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

পরমেশ্বর প্রার্থনা শুনেন কি না

পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা তিন প্রকারের হয়। এক তামসিক, দ্বিতীয় রাজসিক, তৃতীয় সাত্ত্বিক। তামসিক ও রাজসিক প্রার্থনা অতি নিকৃষ্ট স্তরের, ইহা ব্যক্তিগত। এবং সাত্ত্বিক প্রার্থনা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত হইয়া থাকে। এই সাত্ত্বিক প্রার্থনায় গভীর স্বার্থের ভাব কম বলিয়া কিছু উচ্চাঙ্গের। প্রার্থনার সীমারেখা মনস্তত্ত্বের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ।

তম-ভাবে ও রজ-ভাবে প্রার্থনা করিয়া মানব কি চায়? সে চায় বাহিরের লোভনীয় উপকরণ জগৎ হইতে পুঞ্জিত করিবার গর্ব্ব। অর্থাৎ জগতের ভৌতিক বিষয়ের বিশেষভাবে ভোগ। দার্শনিক বলিলেন, এ যে বিষম বর্ব্বরতা ও আত্মাবমাননার কথা। যাহাতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়, যেখানে বিরামহীন অতৃপ্তি এবং তাহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ ঈর্ষা, অবিশ্বাস, হতাশা দেখা দেয়, তাহার মাধ্যমে বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনার মূল্য কি? অহঙ্কারকে আত্মগৌরব বলিয়া মনে করা, এমন কি মনোমধ্যে স্থান দেওয়াও মূঢ়তা, বর্ব্বরতা ও ক্ষিপ্তভাবের লক্ষণ। অহঙ্কারকে, ভোগাসক্তিকে, উত্তীর্ণ করিতে হইবে বিনা প্রার্থনায়, কেবল বিশ্বগত আত্মীয়তার প্রেমে।

সাত্ত্বিকপ্রার্থনায় মানব ব্যষ্টিগতভাবে চায়সামান্য উপকরণও ঐশিত্ব লাভ এবং সমষ্টিগতভাবে জনকল্যাণ। ব্যষ্টিগত সাত্ত্বিক প্রার্থনায় মানব চায়, তার পূজার নিরিবিলি স্থান, পূজার উপকরণ, কাষায় বসন, বাধাশূন্য উদরান্নের সমাধান, ইহাই ঈশ্বরের নিকট তাহার আবেদন। অতৃপ্ত মনের আশয় লইয়া, ঈশ্বরের নিকট ইহাও প্রার্থনা করে যে, হে ভগবান, আপনার সাকার মূর্ত্তি যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আপনার কৃপায় যেন অদ্ভুত বিভূতি লাভ করি, জনমণ্ডলী আমার বিভূতি দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হন ও শিষ্যত্ব স্বীকার করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রার্থনায় অন্তর বাসনাচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া আত্মদৃষ্টির অভাব প্রতিপন্ন করে। আর সাত্ত্বিক ভাবে সমষ্টিগত প্রার্থনা হইতেছে ঃ

"সৰ্ব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝাহোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, সৰ্ব্বে সত্তা দুক্‌খাপমুঞ্চন্তু, সৰ্ব্বে সত্তা মা যথালদ্ধ সম্পিতো বিগচ্ছন্তু।"

'সকল জীব সুখযুক্ত হউক, নিঃশত্রু হউক, অবধ্য হউক, সুখী হইয়া কালহরণ করুক, সকল জীব দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হউক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক।'

সত্যই কি এই বহির্দৃষ্টিগত প্রার্থনায় সকলের ঈশ্বরকৃপা লাভ হয়, জনকল্যাণ দেখা দেয়! এই সমষ্টিগত প্রার্থনায় সমাজে মনোজগতের গন্ধ বাতাবরণ কিছুটা পরিশুদ্ধ হয় মাত্র। হিংসাত্মক মনোবৃত্তির অবসান ঘটে না। ঈশ্বর অতি গূঢ়ভাবে সৰ্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি অনেকগুলি কোষের আবরণের মধ্যকেন্দ্রে বিরাজমান। প্রথম কোষ স্থূল, তন্মধ্যে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, অতি সূক্ষ্মতম অবস্থায় আছে। প্রথম অন্নময় কোষ স্থূল, তন্মধ্যে প্রাণময় ও মনোময় কোষ সূক্ষ্ম, তাহারও গভীরে বিজ্ঞানময় কোষ সূক্ষ্মতর, তদপেক্ষা গভীরে আনন্দময় কোষ সূক্ষ্মতম, আর অতি গভীরতম প্রদেশে হিরণ্ময় কোষ-মধ্যে 'সৎ' বা 'চিৎ' অবস্থিত। সেখানে নির্গুণস্থিতি, দ্বন্দ্ব-ভাবের লেশ মাত্র নাই।

প্রার্থনা মনোজগতের ব্যাপার। মনোজগতে তীব্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা উচ্চকম্পন ভাষার সাহায্যে উৎপন্ন করা যায়। তাহাতে জাগতিক মনের উপর শুভাশুভ ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই বহির্ম্মুখী মন, জীবন সংগ্রামে সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধোগতি বা প্রতিবন্ধক উল্লঙ্ঘন করিয়া সময়ে সময়ে প্রার্থনাদ্বারা জয়ী হয়। কিন্তু অন্তর্ম্মুখী

মনের গতিশক্তি সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত। অতি সূক্ষ্মতম কোষে মনের গতি থাকে না। আনন্দময় কোষে মন পৌঁছিলেই নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। ইহা সমাধিস্তর, এখানে মন পৌঁছিলেই অপূর্ব্ব তন্ময়তা আসে। পরন্তু হিরণ্ময় কোষে পৌঁছিবার শক্তি থাকে না, তৎপূর্ব্বেই মনের নিবৃত্তি দেখা দেয়। সুতরাং ঈশ্বর কি করিয়া যে প্রার্থনা শুনেন তাহা প্রতিপন্ন করা সম্ভব হইবে।

ঈশ্বর বা জগৎপিতা তাঁহার অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ্য রাখিতে অসমর্থ হইয়া প্রত্যেক জীবে—এমন কি স্থাবর জঙ্গম ও বৃহৎ হইতে অণু পরমাণুর মধ্যে নিজ সত্তা নিজ চিন্‌কারী বিলাইয়া, সর্ব্বাত্মক হইয়া, মায়া-লিপ্ত অবস্থায় নিজ দায়িত্ব ও অস্তিত্ব বিভাগ করিয়া অর্থাৎ সকলের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছেন। এখন তিনি গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে আত্মরূপে, সর্ব্বব্যাপী সনাতন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা কোথায় কোথায় গিয়া পৌঁছিবে! তিনি যে প্রত্যেক হৃদয়ে অদ্ভুতভাবে বাসা বাঁধিয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া স্তবস্তুতি করিয়া যে মঙ্গল কামনা করি, তাহা আস্তিক্য ভাবের আবেশমাত্র। শাস্ত্রে বলেন, জগতের হিতসাধন করিয়া, বিশ্বাত্মার আনন্দঘন বৃত্তের মধ্যে পৌঁছাইয়া আনন্দ লাভ ও কল্যাণ লাভ সম্ভব হয়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে :

—দৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীত ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্ ॥

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥

নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ ॥

গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ ॥

লোকাতীতো লোকহেতুরবাঙ্‌মানসগোচর।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন ॥

— ২য় উল্লাস।

'হে দেবি! হে পরমেশ্বরি, জগতের হিত সাধিত হইলে জগদীশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন; কারণ তিনি বিশ্বের আত্মস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি এক সৎস্বরূপ নিত্য, অদ্বিতীয়, সত্য, পরাৎপর ও স্বপ্রকাশ; তিনি সতত পূর্ণ ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনি নির্ব্বিকার, নিরাধার, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্ব-দ্রষ্টা ও বিভু (অনাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন)। তিনি গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সনাতন; তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয় ও তাহার শক্তি প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই। তিনি লোকাতীত অথচ তিনিই সকলের কারণ; তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সকলই জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারেন না।'

ঈশ্বরকে যে কয়টি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে তিনি নির্ব্বিকার, সর্ব্বদ্রষ্টা, ইন্দ্রিয়হীন, গুণাতীত, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, সকলই জানিতে পারেন ও গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করেন। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকট প্রার্থনার আবশ্যকতা বা অবকাশ কোথায়! তিনি তো সকলই জানিতেছেন; অতএব ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা একটা ভ্রান্ত অভিনয় মাত্র। তিনি যে ত্রিগুণাতীত; সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণের দ্বারা প্রার্থনা পাঠান সম্পূর্ণ নিষ্ফল। আর তিনি বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া, বাক্য ও মনের দ্বারা প্রার্থনা প্রকট করা অতি অসম্ভব। সেই জন্যই বলিয়াছেন বিশ্বকারণ ঈশ্বর, জগতের

হিত সাধন করিলে তিনি তুষ্ট হন। যেহেতু তিনি সমষ্টিরূপে বিরাজমান।

আমরা প্রার্থনা করিয়া থাকি ঘোর সগুণ ভাব লইয়া; নির্গুণ ঈশ্বর সেখানে স্তব্ধ বা বধির। আর নির্গুণে প্রার্থনা হয় না। তবে ভাবের ঘরে চুরি করা যায় না। যেহেতু ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে মায়া সংস্পর্শজনিত মায়িক বিষয়, অতি তরল ভাবে একটা আভাস পোঁছায় মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কাহিনীর কতকটা সঙ্গতি আছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ, হে গোলোকবিহারী গোবিন্দ, হে দ্বারকানাথ, হে বৈকুণ্ঠপতি মধুসূদন, বিপদে রক্ষা কর—রক্ষা কর। কিন্তু তৎকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ বধির, দ্রৌপদীকে বস্ত্র দিয়া লজ্জা নিবারণ করিলেন না। যখন অঙ্গ হইতে বসন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন কাতরভাবে অন্তরের ভাষায় যাজ্ঞসেনী একবার মাত্র বলিয়াছিলেন, হে হৃদয়বিহারী অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ, তুমি অগতির গতি। তখন তাঁর বিভূতি-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই যে আত্মসমর্পণ—এ ঠিক প্রার্থনা নয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন প্রথম, যাহাতে কোন সাড়া মিলে না। শ্রীকৃষ্ণ যে অন্তরে আছেন, তাঁকে বিশ্ব, গোলোক, দ্বারকা, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ খুঁজিলে আর তথায় প্রার্থনা পাঠাইলে, তিনি সাড়া কেন দিবেন! হৃদয়বিহারী বলিতেই আত্মবিভূতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। মর্ম্মার্থ এই, আত্মসমর্পণেই যত কিছু মঙ্গল। প্রার্থনা হইতেছে বিপদে ধৈর্য্য লইবার, নিঃশঙ্ক হইবার কৌশলমাত্র। ইহা দ্বৈতবাদীর বহির্ম্মুখী মনের একপ্রকার জড়তা বা লৌকিক অভ্যাস। ঈশ্বর প্রার্থনা শুনেন না, যদি শুনিতেন তাহা হইলে জগতের সকলেই সেই প্রার্থনা অনুভব করিতে পারিতেন। কারণ তিনি সমষ্টিভাবে বিরাজমান।

পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের স্তোত্র

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্ ॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপপ্রকাশিন্ অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণং ব্রজামঃ ॥

তুমি সর্ব্বলোকের আশ্রয়স্বরূপ, তুমি চৈতন্যময়, তুমি বিশ্বের আত্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরেণ্য, তুমিই একমাত্র জগৎকারণ বিশ্বরূপ; তুমিই একমাত্র জগতের কর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, প্রহারকর্ত্তা; তুমি নিশ্চল পরমাত্মা ও নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞান। তুমি ভয়েরও ভয়, ভীষণেরও ভীষণ, তুমি প্রাণিগণের গতি, পবিত্রকারকেও পবিত্রকারক, মহোচ্চৈঃ পদ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পদের নিয়ামক। তুমি প্রধান হইতেও প্রধান, রক্ষকদিগেরও রক্ষক।

হে প্রভো, তুমি সর্ব্বরূপে প্রকাশমান; তুমি অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য, সকল ইন্দ্রিয়ের অগম্য, অচিন্ত্য, পরমপুরুষ সর্ব্বব্যাপক অব্যক্ততত্ত্ব সত্যস্বরূপ। তুমি জগতের ভাসকাধীশ অর্থাৎ দীপ্ত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক, তুমি আমাকে নাস্তিকতারূপ অপায় অর্থাৎ ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা কর। হে জগতের আত্মস্বরূপ, আমি সেই সৎস্বরূপ অদ্বিতীয়, নিরালম্ব, ভবসাগরের একমাত্র পোতস্বরূপ তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম।

পরমাত্মার ধ্যান

হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং,
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জনম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপং,
সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে ॥

পরমাত্মার প্রণাম

ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥
শান্তায়াব্যক্তরূপায় মায়াধারায় বিষ্ণবে।
স্বপ্রকাশায় সত্যায় নমোঽস্তু বিশ্বসাক্ষিণে

পূজার মন্ত্র

'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম'।

হৃদয়কমল মধ্যে যিনি নির্ব্বিশেষ, যিনি হরি-হর-ব্রহ্মার জ্ঞেয়বস্তু, যিনি যোগীন্দ্রগণের ধ্যানলভ্য, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জন্ম মৃত্যু ভয় বিদূরিত হয়, যিনি সকল ভুবনের কারণস্বরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যময়, তাঁহার ধ্যান করি।

তুমি পরব্রহ্ম (১) পরমাত্মা তোমাকে নমস্কার, তুমি গুণাতীত, তোমাকে নমস্কার, তুমি সৎস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি।

যিনি শান্ত, অব্যক্তরূপ, মায়ার আশ্রয়, বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, স্বয়ম্প্রকাশ, সেই সত্যস্বরূপ বিশ্বসাক্ষী পরমাত্মাকে নমস্কার।

(১) পরব্রহ্ম— একমেব, পরংব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্বার্চ্চয়া তদর্চ্চা স্যাৎ যতঃ সর্ব্বং তদন্বিতম্ ॥
শ্লোঃ ২১০।১০ উল্লাস মহানির্ব্বাণ

'একমাত্র পরব্রহ্মই বরণীয়, তিনি বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব জগতের যে কোন বস্তুর পূজা করিলেই পরব্রহ্মের পূজা করা হয়। যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক।' সুতরাং উপরোক্ত প্রণামে বিশ্বকেই প্রণাম করা হয়।

মানবীয় সম্পদ মোক্ষের হেতু।

সকলেই বলিয়া থাকেন মানব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে—

চৌরাশি লক্ষ তির্য্যগ্-যোনি ভ্রমণ করিবার পর মানব জন্ম হয়। সত্যই মানব শ্রেষ্ঠ জীব, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। পরন্তু কোন্ বিশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠত্বের মুখ্য হেতু কি, কয়জন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর পান! অনেকেই তো সারাজীবন শিশুভাব অবলম্বনেই শেষ করিয়া দেন। আর যদি মানবজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্মই হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক মানবই উত্তম জন্মলাভজনিত সংযমী, শমগুণবিশিষ্ট, যথার্থদর্শী, সম্যক্ জ্ঞানী স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু কোথায় সেই উচ্চ ভাব! আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন লইয়া যেমন সাধারণ জীব থাকে, এই শ্রেষ্ঠ মানব জন্ম লাভ করিয়াও অনেকে সাধারণ জীবের মতই নিম্নস্তরের খেলা খেলিয়াই চলেন। আত্মোন্নতি তো দূরের কথা, মনের জড়তা লইয়া পতনের রাস্তা ধরিয়া দুর্গতির দেশে যাত্রা করেন। দুঃখের বিষয় এই, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবের পরিশুদ্ধ বিবেকের জন্য শাস্তা-শাস্তির ব্যবস্থা রাখিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শাস্তা-শাস্তির ব্যাপার বহু পুরাণ যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অথচ মানবজাতি নিজেকে যুগ যুগান্ত হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। এখানে অধিবেত্ত্ব ব্যক্তিও বিস্ময়ে স্তব্ধ ও মূক হইয়া ভাবিবেন, মানবীয় সম্পদ গেল কোথায়! এ যে, অযথা আত্মশ্লাঘাকারী অহমিকাভরা জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের অভিনয়!

আমাদের প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত যে, আমরা যখন শ্রেষ্ঠ জীব, এবং ক্রম-বিবর্ত্তনে উত্তম জীবন পাইয়াছি, তখন ভাবিতে হইবে কোন বিশেষ মানবীয় সম্পদের আমরা অধিকারী। কেবল গোত্র,

পিতার নাম এবং বর্ত্তমান বিকৃত বর্ণাশ্রমের উল্লেখ করিলেই তো শ্রেষ্ঠ হইব না।

এই সংসারে মানবজাতি একই প্রক্রিয়ায় জন্ম লইয়া যে যাহার কর্ম্মানুসারে যেরূপ এ জগতে বহু স্তরে বিভক্ত রহিয়াছেন, তদ্রূপ পরলোকে যাইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আমাদিগের গতি হইয়া থাকে। এমন কি, সেখানেও শ্রেষ্ঠত্ব উন্নত রাখিতে হইলে সদ্ভাব ও ভগবৎ নিষ্ঠার বিশেষ অবশ্যক হইয়া থাকে।

বিশ্বপিতা মানবজাতিকে কি অমূল্য সম্পদ দিয়াছেন তাহা মনন করিবার বিষয়। কিন্তু এ অনুধ্যানের অবসর কোথায়! তাহা যদি অনুভব করিতে যত্ন লই, আমাদিগকে আর জন্মান্তরীণ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। আমরা পরম পিতার কৃপায় পাইয়াছি আনন্দময় কোষের পূর্ণ বিরতি। আমরা বিজ্ঞানময় কোষের ক্রিয়াদ্বারাই প্রশ্ন করিয়া থাকি, কি? কেন? কে? কোথা? ইত্যাদি।

এইবার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, সাধারণ জীবের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষের সম্যক ক্রিয়া আছে কি না? মনে করুন একটি রাস্তার মধ্যে বড় গর্ত্ত বা কুয়া খনন করিয়া রাখা হইল, আর কতকগুলি গরুকে সেই রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। গরুগুলি যখনই কুয়াটির সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখনই পাশ কাটাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে। কেহই কুয়ায় পড়িবে না। ইহার কারণ প্রাণময় ও মনোময় কোষের বিকাশ প্রাণী মাত্রেরই আছে। তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার কৌশল অবলম্বন করিবেই। কিন্তু বিজ্ঞানময় কোষের ক্রিয়া স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। মনে করুন একটা গরু বা ছাগলকে তলোয়ার দিয়া দুই টুকরা করিয়া রাস্তার মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইল; এবং দশ বারটি গরু ছাগলকে সেই দিক দিয়া লইয়া যাওয়া হইল, তাহারা সেই মৃতটির পাশ দিয়া সকলেই চলিয়া যাইবে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কে কাটিল, কেন কাটিল, এ বিস্ময় তাহাদের ভিতর গভীর ভাবে দেখা দিবে না।

আর কোন মানুষকে যদি তলোয়ার দিয়া কাটিয়া রাস্তায় ফেলিয়া রাখা হয়, শত শত মানুষ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া যাইবে এবং প্রত্যেকেই উৎকণ্ঠার সহিত মৃত ব্যক্তিটি সম্বন্ধে জানিতে চাহিবে। তখন জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের উপর প্রশ্ন চলিবে ; কে মারিল, কোথায় বাড়ী, অপরাধ কি, কখন মারিল, কত জনে মারিয়াছে, কোন দেশের লোক ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রশ্ন বিজ্ঞান-ময় কোষ হইতে উঠে। সুতরাং মানব পরম পিতার কৃপায় পঞ্চ কোষের বিকাশ প্রাপ্ত একটি বিশেষ জীব। তিনি মানবকে দিয়াছেন বাক্ শক্তি ও কর্ম্মকুশল অঙ্গ সৌষ্ঠব। তিনি বহু ভাবে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন কেবল মানব জাতির মধ্যে। সুতরাং মানবই যে শ্রেষ্ঠ জীব তাহাতে কিছু মাত্রও সংশয় নাই।

কিন্তু মানব মনে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের দিকে লক্ষ্য কোথায় ? তাহার অনাবিল সদ্ব্যবহার কোথায় ? কত প্রকারের মিথ্যা চিন্তা করি ; স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিচার করি ; কল্পনা রাজ্যে ঢুকিয়া কত সুখ দুঃখ ভোগ করি ; সমাজে নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য কত বাদ-বিতণ্ডা করি ; আলস্য ও অনবধানতার মধ্যে তত্ত্বানুভূতির পরিচয় দিই, কত বুজরুকি বাহাদুরি ও সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান, তার ইয়ত্তা নাই ; কতই না আশ্চর্য্যজনক জড়তাপূর্ণ অব্যবস্থিত ভাবের অভিনয় করিয়া থাকি। অথচ আমরা বিজ্ঞানময় কোষের 'কেন' প্রশ্ন লইয়া কেহই গাঢ় ভাবে ভাবি না যে, কেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কোথা হইতে জন্মিয়াছি, জ্ঞাতব্য কি, পরলোক আছে কি না, যদি বিবর্ত্তনের খেলায় পুনর্জন্ম হয় সেই পরজন্মের অবস্থা কি হইবে, মানবীয় ধর্ম্মে নিষ্ঠা জাগে না কেন, ছাব্বিশটি দৈবী সম্পদ কি, সেই সম্পদ লাভ কিরূপে ঘটে, ইহজন্মে যে প্রাক্তন ভোগ করিতেছি পরজন্মের জন্য উত্তম প্রাক্তন কিরূপে লাভ করিব এই সকল উত্তম চিন্তার অভাব সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের এরূপ কর্ম্ম করার প্রয়োজন যাহাতে পরজন্মে

চিত্ত-শুদ্ধি-জনিত দৈবী সম্পদ লাভ করিয়া আমরা উচ্চ স্তর প্রাপ্ত হই। এবং ভগবৎ চিন্তনের সুযোগ পাইয়া আত্মবেদী হইতে পারি। পরলোক যাত্রার পর নির্ব্বাণের পথ, শান্তির পথ প্রাপ্ত হই। মূলকথা স্বর্গীয় আনন্দের অধিকারী হইতে হইলে, আসুরী ও রাক্ষসী স্বভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে, পবিত্র সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা।

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষয়ে। গীতা ১৬।৫

'দৈবী যে সম্পদ্ তাহা মোক্ষের হেতু।' গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন।—

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত!॥ ৩

'ভগবান, অর্জ্জুনকে ছাব্বিশটি মানবীয় সম্পদের কথা বলিতেছেন যথা,—অভীরুতা, ব্যবহার কালে প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথা ত্যাগ, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা-লব্ধ জ্ঞান, স্বসামর্থ্যানুসারে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, শ্রৌত বা স্মার্ত্ত যজ্ঞ, শুভ অদৃষ্টের জন্য ঋগ্বেদাদি অধ্যয়ন বা স্বাধ্যায়, অন্য বেদপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎচিন্তা ও অসৎকর্ম্মে লজ্জা, চপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ (শরীরের ও মনের), অবৈর ভাব ও অনভিমান। যাঁহারা দৈবী বা সাত্ত্বিকী সম্পদের অবস্থালাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের এই ছাব্বিশটি সম্পদ লাভ হয়।'

সুতরাং মানবমাত্রেরই দৈবী সম্পদ লাভ করা কি যুক্তিযুক্ত নয়! যাঁহারা ভাগ্যবান এবং সতত বিজ্ঞানময় কোষের কিংকর্ত্তব্য বিচার লইয়া অন্তরের মধ্যে চিন্তা করেন, সদ্বুদ্ধি ও বিবেককে সজাগ রাখেন, পরলোক ও পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা রাখেন, মৃত্যুর পর যে সংসারে কর্ত্তৃত্ব থাকে না, যে বিষয় সম্পত্তির উপর আমাদিগের কোন অধিকার থাকে না, সেই বিষয় মমতায় মুগ্ধ না হইয়া, আশা হীন হইয়া কর্ম্ম সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; কাম, ক্রোধ লোভ (১) এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ, ইহারা জীবের অধোগতি দায়ক, যাঁহারা এই তিনটি বিষবৎ ত্যাগ করেন, তাঁহারাই জন্মান্তরে মানবীয় সম্পদ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন ও উত্তম জীবন প্রাপ্ত হইয়া অনুদ্বিগ্ন অর্থাৎ স্বস্থ অবস্থা লাভ করেন। তাঁহাদের ক্রমশঃ শান্তাত্মা হইয়া মোক্ষের পথে গতি হয়।

(১) গীতায় আছে :—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ১৬অঃ ২১

'সমস্ত আসুরী-বৃত্তি যে তিনটির অন্তর্ভুক্ত সেই তিনটি হইতেছে কাম, ক্রোধ ও লোভ। ইহা জীবের অধোগতি দায়ক নরকের দ্বার স্বরূপ। ইহা ত্যাগ করা উচিত।'

অবয়বই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম শরীর অথবা লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত। এই সূক্ষ্ম শরীরেই কর্ম্ম ভোগ সাধন হয়।

বাদরায়ন বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে জীবের উৎক্রান্তির (মৃত্যু সময়ের) প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। তাঁর বক্তব্যের সার মর্ম্ম এই, মরণ কালে জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি ভূত সূক্ষ্মে সম্পিণ্ডিত হয়। জীব সেই সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে স্থূল দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

সূক্ষ্মং প্রমাণ তশ্চ তথোপলব্ধেঃ।

ব্রহ্মসূত্র ৪।২।৯

'জীব মরণ কালে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোক গমন করে।' অনেকেই বলিবেন এই, অনুমান নির্ণীত ব্যাপারে কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়! তজ্জন্য গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ের দশের শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন,—

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥

'উৎক্রমনশীল শরীরকে অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরকে, পার্থিব শরীরধারী যিনি বিষয় ভোগ করেন বা ত্রিগুণের পরিণাম সুখ দুঃখ মোহের সহিত সংযুক্ত, সেই বিমূঢ় ব্যক্তিগণ জানিতে পারে না। কারণ তাহাদের মন বিষয়াকর্ষণে বহির্ম্মুখী, তাহারা সে চেষ্টা করেন না। জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পশ্যন্তি অর্থাৎ দেখিতে পান।'

একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে, যদি কাহারও সম্পূর্ণ হাতটি কাটিয়া যায় সে ব্যক্তি মনে মনে অনুভব করেন যে, যেন তার সম্পূর্ণ হাতটাই আছে। ইহার কারণ এই, সূক্ষ্ম অবয়ব তার নষ্ট হয় না। অতএব ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ না হইলেও অনুভব সিদ্ধ। যেহেতু সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে এই ভৌতিক জগতের স্থূল শরীরের একটা অন্তর্গুপ্ত বিশেষ

সম্বন্ধ ঘটে। প্রায় সকলেই বিরুদ্ধ ভাবের চাপে স্বেচ্ছায় এই জটিল বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করেন না। সত্যবোধের জন্য দর্শন, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি উপযুক্ত গুরুর নিকট মনন সহকারে অধ্যয়ন না করিলে, এবং গুরু কৃপা করিয়া বুঝাইয়া না দিলে, তাহাতে অতি সামান্য কিছুটা বুঝা যায় মাত্র। সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আত্মচিন্তনেরও আবশ্যক আছে।

এইবার সামান্য একটি উপমা দিয়া জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। মনে করুন এই স্থূল শরীর একটি ভাড়াটে বাড়ী; আমি তাহাতে বাস করি। আর সকলকে বলিয়া বেড়াই এইটি আমার বাড়ী; এই অহংভাবাপন্ন বৈকারিক উক্তিতে সত্য-জ্ঞানের পরিচয় না দেওয়ায়, প্রকৃত বাড়ীওয়ালা, ভাড়াটের যথাভূত জ্ঞানের অভাব দর্শনে তাহাকে রেণ্ট কণ্ট্রোলারের মারফত নোটিশ দিলেন, বাড়ী খালি কর। মোকদ্দমা শুরু হইল, অর্থাৎ শরীরে ব্যাধি দেখা দিল। মোকদ্দমায় জবাবদিহি, উকিল নিযুক্ত, সাক্ষী প্রমাণ সব চলিল; অর্থাৎ শরীরের চিকিৎসা, পথ্য, সেবা শুশ্রূষা সবই হইল। শেষে কণ্ট্রোলার আদেশ দিলেন, ভাড়াটিয়ার অযথাভূত উক্তি সম্বন্ধে প্রমাণাভাবরূপ দোষ সঙ্ঘটিত হওয়ায় বাড়ী খালি করিতে বাধ্য। বাড়ীওয়ালা খালি করিবার জন্য জজের নিকট দরখাস্ত দিলেন। এইবার ভাড়াটে আতান্তরি, কি হবে কি হবে চিন্তায় অস্থির। একদিন আদেশ হইল, দুই দিনের মধ্যে বাড়ী খালি না করিলে পুলিশের সাহায্যে খালি করা হইবে। তখন ভাড়াটে পুলিশরূপী যমদূত দেখিয়া নিজের বাসনাজাত জীবনের সমস্ত কর্ম্মফল যাহা আসবাবপত্র আছে, যথা মায়ারূপী স্ত্রী পুত্রের সংস্কার প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া বাসনাত্মক সূক্ষ্ম শরীরে বাড়ী খালি করিয়া দিয়া চলিল। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত না থাকায়, অসহায় অবস্থায় নিজের চিত্তস্থিত আবরিকা ও বিক্ষেপিকা কোষের মালপত্র লইয়া ভূলোক হইতে

ভূবর্লোকে যাইয়া ঘুরিতে লাগিল। ভাড়াটে জানে না তার দেশ কোথায়! আদি জন্মভূমি কোথায় !!

ইহলোকে কাম, ক্রোধ, লোভের খেলায় কত নিপুণতার পরিচয় দিয়াছে; সে যে ত্রিগুণাত্মিক মহিমাময়ী মহামায়ার অপূর্ব ইন্দ্রজালে ফাঁসিয়া সসীম জীবরূপে মোহাবিষ্ট ও সীমাবদ্ধ থাকিয়া, খেলা খেলিতেছে তাহার আদৌ খেয়াল নাই। এই নিপাত বুদ্ধি পরলোক-বাসী জীবরূপী সূক্ষ্মদেহী সেই ভাড়াটিয়া কি, অন্য বাড়ীর চেষ্টা করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। যেহেতু তাহার সঙ্গে প্রবৃত্তিজাত বহু স্পৃহনীয় বস্তু রহিয়াছে। সুতরাং সে এর দ্বার, তার দ্বার, ঘুরিয়া বেড়াইবে, এবং তাহার মনে কেবল চিন্তা চলিবে একটি নূতন ভাড়াটে বাড়ীর, অর্থাৎ এই পার্থিব জগতে পুনরায় নূতন শরীর লাভের চেষ্টা। যাহাতে তাহার স্পৃহনীয় বস্তুগুলি রাখিয়া আরাম পায়। ইহাকেই বলে প্রাক্তন।

এই সূক্ষ্মদেহী ভাড়াটিয়ার সহিত বাসনাজাত বহু মালপত্র দেখিয়া উচ্চস্তরের কোন পরলোকবাসী তত্ত্বজ্ঞানী, বন্ধুভাবে মৌখিক উপদেশ দিবেন যে, হে বন্ধু, এরূপ অযথা মালপত্র না থাকিলে শান্তি পাইতেন, এত অস্থির পঙ্ককে পড়িতে হইত না। আর মনে মনে হাসিবেন ও বলিবেন পার্থিব জীবনের কর্ম্মফল ভোগ কর।

ইহলোকে সংসারী ভাড়াটে তার আশার ধন ও কামনাজাত সম্পত্তিগুলি মায়ার টানে যেমন ফেলিয়া দিবার যোগ্যতা হারায় অথচ জীবনে ভুলের জন্য সেই আসবাবপত্র লইয়া এখান সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আর অন্য ভাড়াটে বাড়ীর সন্ধান করে; ঠিক সেইরূপ অবস্থা হয় পরলোকগত আত্মিকগুলির। তাহারা সতত চেষ্টা করে পার্থিব শরীর লাভের জন্য। যখন পরলোকের ভোগ শেষ হয়, তখনই আত্মিকগণ জন্মগ্রহণের যোগ্য হয়।

অবিদ্যামায়ার খেলায় অনিত্যে নিত্যজ্ঞান লইয়া, অর্থাৎ পূর্বজন্মার্জ্জিত বিবিধপ্রকার ত্রিগুণাত্মক বাসনা ও সংস্কার লইয়া জন্মান্তর প্রাপ্তির

নিমিত্ত এই পার্থিব জগতে ব্যাকুল ভাবে ঘুরিতে থাকে। এখানকার ভাড়াটে যেমন তার সামর্থ্য মত স্থায়ী বাড়ী পাইলে তাহাতে আশ্রয় লয়, সেইরূপ বিদেহী আত্মিকও নিজের সংস্কার মত ক্ষেত্র খুঁজিয়া তাহাতে আশ্রয় লইয়া থাকে।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এষণা (১) হীন অর্থাৎ ইচ্ছাহীন হইয়া কোন গৃহে বাস করেন এবং নিয়তির বিধানে সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, তখন সেই ব্যক্তির অন্তরে ত্যাগ থাকার কারণ, সতত শান্ত থাকেন, মনে কোন দুঃখ বা ক্লেশ অনুভব না করিয়া স্বচ্ছন্দ ভাবে কোন বৃক্ষতলে বা অন্যত্র গমন করেন।

সেইরূপ সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাঁর আত্মিক পরলোক হইতে জন্ম পরিগ্রহের জন্য অবিদ্যাবশে ব্যাকুল হয় না। পরন্তু অসমাপ্ত অহংকার নাশের জন্য এবং আত্মরতি নিষ্ঠা প্রাপ্তির জন্য পরলোকে কর্ম্মফল ভোগান্তে পুনরায় স্থূলদেহ ধারণের স্পৃহা জাগে, তখন সেই বিদেহী উত্তম ক্ষেত্রে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে আশ্রয় লইয়া থাকেন। যে যেমন কর্ম্ম করে সে সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ যোনিপ্রাপ্ত হয়।

ভোগী ও ত্যাগীর উপমা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, ভোগী তাহার ভোগেচ্ছা বলবতী থাকায় তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য, স্থূল অবজ্ঞাত শরীর প্রাপ্তির হেতু অবিদ্যাবশে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর ত্যাগ ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থায় থাকে। ভোগী পার্থিব জগৎ হইতে পরলোকে যাইতে আতঙ্ক বোধ করে. আর ত্যাগী পরলোক হইতে এই পার্থিব জগতে আসিতে ক্লেশ বোধ করেন।

পরলোকে বাসনার অধীন থাকিয়া প্রপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম শরীরে ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার উপর বিদেহী আত্মিক

---

(১) এষণা, পুত্রৈষণা তথা বিত্তৈষণা লোকৈষণা তথা।

এষণাশ্রয়মিত্যুক্তং তদ্বিস্যাৎ বন্ধকারণম্॥

পুত্রের আকর্ষণ, বিত্তের আকর্ষণ, সুখ্যাতির মোহ, এই তিনটি মোহ বন্ধনের কারণ।

গণের নৈতিক শাসন অর্থাৎ আজ্ঞা, আদেশ, উপদেশ, দণ্ড, দমন প্রভৃতি চলিতে থাকে। প্রত্যহ ভগবৎ চিন্তনের আদেশ আসে। এ সব কি ভোগীর ভাল লাগে! তখন যে মনে মনে উচ্ছৃঙ্খল হয় এবং নিরালোক ভূবর্লোকের নিরালা স্তর হইতে এই ভূর্লোকে আসিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত আসা যায় না কর্ম্মফল ভোগ শেষ না হইলে, জন্ম লইবার অধিকার কিরূপে পাইবে। তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল তাহাকে দুঃখ কষ্টে প্রেতলোকে অপেক্ষা করিতে হয়। ইহলোকের মৃত্যু, এবং পরলোকের মৃত্যু, যাহা পরস্পর জন্মের কারণ, তাহার ফলে নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় চিরকাল অজ্ঞাতই থাকিবে। ইহা মহামায়ার লীলার মধ্যে গুহ্য ভাবে নিহিত।

ইহলোকে মৃত্যুর সময় প্রাণময় কোষের উদান বায়ুর ক্রিয়ায় পরলোকে জন্মগ্রহণ করে। এবং ভূর্লোকে জন্মগ্রহণের সময় প্রাক্তন ফল ভোগের হেতু চিত্তের আবরিকা ও বিক্ষেপিকা কোষের সঞ্চিত বিষয় লইয়া, পুনরায় প্রাণময় কোষের মধ্যে আশ্রয় লইলেই পরলোকে বিদেহী আত্মিকগণ বুঝিতে পারেন ইহার জন্মের সময় উপস্থিত। তখন সেই আত্মিক জন্মগ্রহণের যোগ্য হইয়া আপন সংস্কারানুযায়ী নিজ নিজ ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে; এবং গর্ভাধান সময়ে গর্ভকটাহে আশ্রয় লয়।

পারলৌকিক জীবন ও পার্থিব জীবনের মধ্যস্থল বিরোধ

এই মধ্যস্থল দুই প্রকারের হয়। একটি পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ও তৎকালীন প্রপঞ্চীকৃত দেহ প্রাপ্তি। এবং আর একটি অবস্থা আসে পারলৌকিক জীবনের শেষে, পঞ্চীকৃত শরীর অবলম্বন। এই দুইটি অবস্থাই অত্যন্ত কষ্টকর। প্রথমটি উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহমধ্যস্থ সূক্ষ্ম শরীরের বহির্গমন, দ্বিতীয়টি পারলৌকিক সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত শরীরের মাতৃগর্ভে স্থূল আবরণের মধ্যে আশ্রয়। এই যাওয়া-আসারূপ আবর্ত্তনের মধ্যস্থলটি অত্যন্ত ক্লেশকর ও সঙ্কটজনক। এই আসা-যাওয়া ব্যাপারটি সকলেই জ্ঞাত আছেন; কিন্তু আমাদিগকে যে, জীবনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইতেই হইবে, সে বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে অনেকেই প্রায় উদাসীন। তথাপি এই সংসারে জন্ম মৃত্যুর বিষয় লইয়া দুই চারিজন ব্যক্তিকে নিজ্রের পরিচয় দিয়া মর্ম্মবেদনার উল্লেখ করিতে দেখা যায়; কিন্তু পরক্ষণেই ঐ ব্যক্তিগণ এই জড়জগতে ত্রিগুণাত্মক মায়ার খেলায় মত্ত থাকেন। সুতরাং মানবীয় ধর্ম্মের প্রতিকূল এই ন্যাকা বোকা ভাব মানব চেতনার পরিচয় নয়।

ইহলোকে কর্ম্মানুসারে যেমন পরমায়ুর একটি সাধারণ নিয়ম আছে, তদ্রূপ পরলোকে নিম্নোচ্চ স্তর হিসাবে অবস্থিতি ও অবসানের একটা নিয়ম আছে। ইহলোকে শরীরের ব্যাধিই মৃত্যুর কারণ হয়, পরলোকের মৃত্যু, মনের উপর ব্যাধি আশ্রয় করিলেই অবসান হইয়া থাকে। এবং সেই মন ব্যাধি বাসনা হইতে জাত। ওপারে সকলই সূক্ষ্ম ব্যাপার।

ইহলোকে সকলেই জানেন শরীর ধ্বংস হয় কিরূপে। এই স্থূল শরীর জরা ব্যাধি অনাচার, ব্যভিচার, দুশ্চিন্তা, হিংসা, শোকে প্রায় অনেকেই নিজ নিজ পরমায়ু শেষ করিয়া থাকেন। পূর্ণ পরমায়ু ক্বচিৎ ভাগ্যবানের ভাগ্যে ঘটে। সেইরূপ পার্থিবাবস্থায় অশোধিত মন ও

অজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া মলিন বাসনা ও দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া যাঁহারা পরলোক যাত্রা করেন, চিত্ত জড়তার কারণ, তাঁদের পরলোকে অবাস্থিতি অতি অল্পই হয়। আত্ম-দীপ্তি প্রকাশ না হওয়ার হেতু, ঊর্দ্ধরাজ্যের আলোকে যাইতে পারেন না। সুতরাং ভূবর্লোক হইতে সত্বর ভূর্লোকে জন্ম লইবার জন্য ফেরত আসেন। ঘন ঘন আসা-যাওয়ারূপ আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন বড়ই যাতনাদায়ক। অতএব যাহাতে অধিককাল ইহলোকে বা পরলোকে থাকা যায় সকলের পক্ষে তাহাই শ্রেয়।

পরলোকে শান্তিতে অধিক কাল থাকিবার উপায় হইল অন্তরে ত্যাগী হওয়া। ত্যাগী হইতে হইলে এই পার্থিব জগতে গীতা, দর্শন, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের জারক সংযোগে মনের কালিমা বিধৌত করিয়া, পরিশুদ্ধ করিয়া, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য সাধনা করা, সাম্যাবস্থা লাভ করা প্রয়োজন। সংসারে পরিচিত হইবার মানসে শাস্ত্রের গুটিকতক শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া অন্যের নিকট ভাঁওতা মারিয়া পণ্ডিত বা সাধু হওয়া নয়। ইহাতে আত্মদীপ্তি প্রকাশ পায় না। পরমাণুবৎ অতি স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিই জীবাত্মা। তাঁর উপর কয়েকটি আবরণ আছে। অন্তর্মুখী বুদ্ধি সেই আবরণ ভেদ করিয়া যতই চিৎস্বরূপ আত্মার নিকটস্থ হইবে, (অবশ্য বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত যাইবার শক্তি রাখে না) তথাপি দীপ্তির বিকাশ সূক্ষ্ম শরীরে এমন কি স্থূল শরীর পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইবে।

মোটামুটি আবরণের বিষয় বলিতেছি, সর্ব্বপ্রথম 'চিৎ' তদুপরি ক্রমান্বয়ে হিরণ্ময় কোষ বা মায়াবরণ; দ্বিতীয় আনন্দময় কোষ, তৃতীয় বিজ্ঞানময় কোষ, চতুর্থ মনোময় কোষ, পঞ্চম প্রাণময় কোষ, ষষ্ঠ অন্নময় কোষ। প্রত্যেক কোষের সাধনানুযায়ী সূক্ষ্মগতি সেই লোকের মহাকোষে অন্তর্নিবেশ হইয়া থাকে। ভূর্লোকে অন্নময় কোষের ধ্বংসের পর, লিঙ্গ শরীর হয় ভূবর্লোকে, বা স্বর্গলোকে কিংবা মহালোকে অথবা জ্ঞানলোকে বা তপোলোকে গমন করেন। সর্ব্বশেষ

অখণ্ড জ্ঞান লইয়া নির্ব্বাণের পথে সত্যলোকে আত্মময় হইয়া যায়। মৃত্যুর পর যে কয়টি মুখ্যস্তরে গতি হয়, তাহা আত্মনিষ্ঠার উপর নির্ভয় করে। জীব আত্মচিন্তায় যতটুকু অগ্রসর হন উৎক্রমণের পর ঠিক সেই লোক প্রাপ্তি হয়। কোন্ মহাশক্তিএই বিধান ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা মানব জ্ঞানের অজ্ঞাত।

মানব ঋতসত্যকে পরম উত্তমকে লক্ষ্য না করিয়া বাহিরের দিকে অর্থাৎ অন্নময় কোষের জন্য সতত উৎভ্রান্ত থাকিয়া, অযথা ক্লান্ত হইয়া খুঁজিয়া বেড়ায় তার জীবনের সার্থকতা। কিন্তু সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আনন্দঘন আত্ম-দীপ্তি বাহিরে যে কোথায় পাইবে বহির্মুখী মন প্রাণময় কোষের সহিত অবিরত সম্বন্ধ যুক্ত হইলে, উনপঞ্চাশ বায়ুর ক্রিয়ায় অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় থাকিবে। আর যদি পবিত্র শান্তি বিবেচনায় মন সতত অন্তর্ম্মুখী হয় তখন বুঝিবে যে চিত্তবৃত্তি নিরোধ থাকার কারণ বিজ্ঞানময় কোষের আবরিকা ও বিক্ষেপিকায় তেমন কোন অভিজ্ঞান সঞ্চিত হয় নাই। অথবা দেখিবে তথায় অপবিত্র জীবনের কামনা বাসনা সঞ্চিত কুকর্ম্মের বহু অকল্যাণকর স্তূপীকৃত অভিজ্ঞান। মনোময় কোষটির নিম্নে প্রাণময় ও উর্দ্ধে বিজ্ঞানময় কোষ। এখন যদি 'মন' এই দুই কোষের মধ্যে জড়মুখী বিকারগ্রস্ত, অর্থাৎ নিম্নমুখী না থাকিয়া আনন্দময় কোষের দিকে লক্ষ্য করে, তখন অনুভব করিবে নির্গুণ মায়া বা হিরণ্ময় কোষ ভেদ করিয়া এক অপূর্ব্ব আত্মজ্যোতি স্ফুরিত হইতেছে। এই আত্মদীপ্তি অনুভব করিলেই মন শান্ত হয় ও আনন্দে মগ্ন হয়। সমাধিস্থ যোগিগণ এই আনন্দে বিভোর থাকেন। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরলোকে গিয়া স্বর্গলোক বা তদূর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হয়। সেজন্য পরীক্ষায় জানা গিয়াছে স্বর্গলোকবাসী কোন আত্মিককে মিডিয়মের সাহয্যে চক্রে আনিলে তিনি' প্রকাশ মধ্যে থাকায় পার্থিব আলোক সহ্য করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেন না; নিম্নস্তরের আত্মিকগণ অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করেন, আলোক আদৌ সহ্য করিতে পারেন না।

মানব যতকাল অহং ভাবাপন্ন বাসনার দাস থাকিবেন, ততকাল পুনঃ পুনঃ মাতৃগর্ভে ও পরলোকে যাতায়াত করিতেই হইবে। ইহাদের পারলৌকিক জীবন ও পার্থিব জীবনের সম্বন্ধ ব্যাহত হইবার নয়। মায়া অতিক্রম না করিলে জন্মান্তর গ্রহণ অর্থাৎ উৎপত্তি ও উৎক্রান্তি চলিতেই থাকিবে। আসা-যাওয়া এই মধ্য স্থলের সম্বন্ধ-জনিত দারুণ ক্লেশ ভোগ শেষ হইবে না।

পুন্যভূমি ভারতের আর্য্য ঋষি ও দার্শনিকগণ এই দুঃখ নিবৃত্তির বহু প্রকার বিধি ব্যবস্থা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় হইল নিঃশ্রেয়সই ক্লেশ নিবৃত্তির হেতু। বারংবার জন্মান্তর গ্রহণ রোধ করিবার জন্য জীবনের পরমকাম্য হইবে পরিপূর্ণ নিবৃত্তি; নির্লিপ্ত চিত্ত, ও বাসনা পরিহার। অতএব ইহ ও পর জীবনের মধ্যস্থল, জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সাধনা দ্বারা আত্মজ্যোতি দর্শনে অপার তৃপ্তি ও পরম শান্তি লইতে হইবে। বহু জন্মে, সাধনার পর জীবনের আবর্ত্ত ঋটি কাটিয়া থাকে।

গর্ভাধানের পর সূক্ষ্ম শরীর ভ্রূণকে অবলম্বন করে কিরূপে

জন্মগ্রহণ-যোগ্য আত্মিক আপন আপন সংস্কার মত পিতামাতার তৎকালীন মনবৃত্তি মিলিলে তথায় উপস্থিত থাকিয়া, যখনই গর্ভধান সম্পূর্ণ হয়, তৎসঙ্গেই পরলোকবাসী অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ যাহা মৃত্যুর পর হইতে সপিণ্ডিত অবস্থায় ঘুরিতেছে, তাহা অন্নময় কোষে এক্ষণে সদ্যোজাত ভ্রূণকে আশ্রয় করিয়া গর্ভাশয়ে বাস করে। একবার পঞ্চীকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় ইচ্ছা করিলেও সহজে অপঞ্চীকৃত হইবার শক্তি থাকে না। মহামায়ার লীলায় তার অপঞ্চীকৃত অবস্থার অবসান হইয়া যায়।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকাংশ মানবই, সংস্কারের নিম্নস্তরে সংকীর্ণ গণ্ডীমধ্যে থাকিয়া অনির্বচনীয় আবির্ভাবের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল রিপু চরিতার্থতা একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া আনন্দ-তরঙ্গে ব্যাকুল ও মত্ত হইয়া পড়েন। বিচিত্র রসলীলায় যাহা খুশি তাহাই গান করেন। শাস্ত্রের বিধি নিষেধ উপেক্ষিত হয় প্রবল অনুরাগের চাপে। তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বুঝা উচিত, নবজীবনের উৎপত্তির উৎস সন্ধানে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কি? শিথিলতা অবলম্বন করিলে, নিবিড়ভাবে অন্তর দিয়া বুঝিবার চেষ্টা না করিলে, মুহ্যমান পিতা গর্ভাধান-মুহূর্ত্ত জ্ঞাত না থাকিলে, জগতে বহু অকাল-কুষ্মাণ্ড ও দুর্নীতি পরায়ণের জন্ম হইবে, পিতা মাতা সেই সন্তান লইয়া সংসারে সুখী হইতে পারেন না। আমার বলিবার ধারা দেখিয়া হয়ত অনেকে হাসিবেন। কিন্তু সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারিণী মা মহামায়ার মহিমায়, তাঁহার ঐন্দ্রজালিক সমীক্ষায়, এই বহিঃপ্রকৃতির অন্তরালে শুক্রকীট ও ডিম্ব মিলিত হইয়া, অপঞ্চীকৃত মহান্ সূক্ষ্ম শরীরীর সংযোগে কত মহা-মানবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কেহ চিন্তা করেন কি! বিন্দু প্রমাণ ভ্রূণে কিরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, কিরূপে তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহার নিয়ামক কে, নিমিত্ত কারণ কি, সে সম্বন্ধে ঋষিগণ তাঁহাদের দিব্য দৃষ্টি দিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন। প্রতিপাদ্য বিষয়টি বিষয়ান্তরের দোষ যুক্ত হইবার ভয়ে যথাসম্ভব সঙ্ক্ষেপে লিখিতেছি।

শুক্রে পিতৃদত্ত জীবৎ পরমাণু প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহা হইতে স্নায়ু, লোম, অস্থি, মজ্জা হয়। আর ডিম্বে মাতৃদত্ত প্রচ্ছন্ন জীবৎ পরমাণু হইতে ত্বক্, মাংস, রক্তের উপাদান বীজরূপে নিহিত। এই যে দ্ব্যণু দুই জাতীয় দুইটি পরমাণু, ইহা একত্রে সম্বদ্ধ থাকিয়া সঞ্জীবিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহা কোন্ শক্তি দ্বারা? মাতাপিতার নিকট হইতে পঞ্চভূতের মাত্র তিনটি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ স্থূলভাবে প্রাপ্ত হয়। এমনই মহামায়ার লীলা' গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গেই পরলোক হইতে মরুৎ ও ব্যোম তন্মাত্রাশ্রয়ী জন্মাশয় প্রাপ্ত আত্মিক অজ্ঞাত

ঐশীশক্তির প্রেরণায় অভিলষিত গর্ভে উপগত হয়। সেই অপঞ্চীকৃত আত্মিক প্রাণময় কোষ অবলম্বনে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত মিলিত বিন্দু প্রমাণ ভ্রূণে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এবং নূতন পঞ্চীকৃত শরীর গঠনে প্রবৃত্ত হয়। গর্ভে সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে ঋষিদিগের অভিমত ইহাই।

মানব উৎক্রমণ কালে প্রাণময়াদি পঞ্চকোষ সহ সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে পরলোক যাত্রা করেন। এবং এই পার্থিব জগতে আসিবার কালে, সেই সূক্ষ্ম প্রাণময়াদি কোষ সহ গর্ভাধানের সময় গর্ভে আশ্রয় লইলেই গর্ভস্থ ভ্রূণ-প্রাণ সঞ্জীবিত হয়। নচেৎ ভ্রূণ অঙ্কুরিত হইবার শক্তি না পাইয়া অকালে নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গে যদি সূক্ষ্ম শরীরী গর্ভে আশ্রয় লয়, তাহা হইলেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে ও বৃদ্ধি পায়।

জন্মের পর পূর্ব্বস্মৃতির প্রতিচ্ছন্ন সংস্কার থাকে

স্মৃতি কি সে সম্বন্ধে প্রথমতঃ সংক্ষেপে যৎসামান্য বিচার করা আবশ্যক। আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া মনোময় কোষে পৌঁছাইয়া দিই। মন সেই বিষয়বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত করিলে, বুদ্ধি তাহা অহংকার ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া কাম ক্রোধাদি, রিপুর সাহায্যে অতি অদ্ভুতভাবে অবিকল তাহার অভিজ্ঞান তৈয়ার করে, অর্থাৎ বিষয়টির ফটো তৈয়ার হয়। এবং সেই অভিজ্ঞান চিত্তে স্থিতিলাভ করে। স্মৃতি সেই অভিজ্ঞানকে অভিনিবেশ ও অনুশীলন দ্বারা বিলুপ্ত হইতে দেয় না। বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে চিত্ত অবস্থিত। সেই কারণ বিজ্ঞানময় কোষকে প্রতিভার কোষ বলে। অর্থাৎ যোগবিঘ্নকারী কোষ। পতঞ্জলি বলেন, চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নামই 'যোগ'। অভিজ্ঞান চিত্তে যতই স্থান পায়, স্মৃতির কর্ম্মবৃত্তি ততই বাড়িতে থাকে। চিত্তস্থিত অভিজ্ঞান চিন্তা বা স্মরণ দ্বারা মনের অনুরক্তিতে মানসে প্রতিবিম্বিত করিয়া উপলব্ধি করার নাম স্মৃতি।

মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এই চারিটি অন্তরেন্দ্রিয়। মনের বৃত্তি সংশয়, বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয়, রিপুর দাস অহংকার, চিত্তের সখা স্মৃতি। চিত্ত মধ্যে দুইটি কোষ আছে, একটি বিক্ষেপিকা, অন্যটি আবরিকা। প্রথমটিতে গভীর ভাবে অঙ্কিত বিষয়গুলি অর্থাৎ জীবনের বিশেষ বিশেষ প্রতিকূল ঘটনা পরম্পরায় থাকে। এবং অন্যটিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের ছবি স্তূপাকারে থাকিলেও তাহা সময়ে সময়ে স্মৃতির সাহায্য না পাইয়া, ক্ষয় হইয়া যায়। বাসনা-জাত জীবনের প্রতিকূল চিন্তা, যাহা চিত্তে মৃত্যুর পরও থাকে, তাহা পরলোকে সর্ব্বতোভাবে প্রকট হইয়া ভীষণ বিক্ষোভ আনিয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বে স্মৃতির ক্রিয়া। আর স্মৃতি বহুকাল চিত্তস্থিত বিষয় চর্চ্চায়, নিরীক্ষাহীন ও নিষ্ক্রিয় থাকিলে বহু অভিজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু গভীর ভাবে অঙ্কিত বিষয়গুলি পার্থিব জীবনের শেষেও পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে যায়।

পুনরায় পঞ্চীকৃত পার্থিব শরীরে, প্রাক্তনরূপে ফিরিয়া আসে, এবং যথাযথ স্বরূপের প্রতিচ্ছায়া লইয়া চিত্তে দেখা দিয়া থাকে। প্রথমে তাহা অস্পষ্ট আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, অনুস্মৃতি সুযোগ পাইলেই ফুটিয়া উঠে।

মৃত্যুর পর পরলোকবাসীর দুঃখ নিবৃত্তির জন্য, তথাকার শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মীকগণ আদেশ উপদেশ দিয়া তাহার দুঃখ কষ্ট লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। তখন এই পার্থিব জীবনের প্রতিকূল চিন্তার বহু অভিজ্ঞান পরলোকে সৎচিন্তা দ্বারা অর্থাৎ ভগবৎ চিন্তায় যেন ধূম্রলিপ্ত ম্লান ভাব হইয়া যায়। পুনরায় পার্থিব জীবন লাভের সময় যদি উত্তম পিতামাতার সাহায্যে সদ্‌বংশে জন্ম হইয়া শিক্ষা ও জ্ঞানার্জ্জনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মনিষ্ঠা জাগে, তাহাতে পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের অর্থাৎ প্রাক্তনের উপর, কতকটা বিস্মৃতি আসে; এইরূপ অবস্থা হইলেই জীবনে উন্নতি দেখা দেয়। এই স্মৃতি-নিষ্ক্রিয়তাই আত্মোন্নতির কারণ হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যেক জন্মেই দুঃখ পাইয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, ইহ ও পরলোকে কিছু না কিছু যত্ন লইয়া উন্নতি করিয়া থাকি। বাসনাজাত জীবনের অমঙ্গল চিন্তা শেষ না হইলে, আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিলে, জন্মান্তর গ্রহণ বন্ধ হইবে না।

এই আবরিকা ও বিক্ষেপিকার স্মৃতি লইয়া মাতৃগর্ভে যখন থাকি, তখন মাতা পিতা সৎ ভাবাপন্ন থাকিলে অনুকূল বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য অবিদ্যা সংস্পর্শে জায়মান পুরাণ স্মৃতি, যাহা ভ্রূণাবস্থায় প্রাক্তনরূপে সঙ্গের সাথী হইয়াছে, তাহা সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে দশ মাস গর্ভে পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়া থাকায় কিছু লোপ পায়। তথা বিক্ষেপিকা কোষের গভীর অভিজ্ঞান প্রাক্তনরূপে জন্মের পর শুভাশুভ ফল প্রদান করে। যদি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গ মিলে, তাহাতে জীবন উন্নত হয় ও উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বজন্মের আচ্ছন্ন স্মৃতির সমজাতীয় ভাবধারা

পরজন্মে কোন কারণে দেখা দিলেই পূর্ব্বস্মৃতি স্ফুরিত হয়। এবং তাহা প্রবুদ্ধ হইয়া জীবনকে সেই পথেই লইয়া যায়। মোট কথা উত্তম পিতামাতার কল্যাণে পূর্ব্বজন্মের বহু অনুস্মৃতি সামান্য বিলুপ্ত হয়; বিশেষ সংস্কার, সুযোগ পাইলে জাগে। এবং কখন বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পিতা মাতার জন্য সুযোগহীন হইয়াও অকল্যাণকর অনুস্মৃতি আপনা আপনি জাগিয়া উঠে। পরন্তু যে কোনরূপ অনুস্মৃতি, জন্মান্তরে জড়তা লইয়া মলিন হইয়া বিস্মৃতির কোলে বিনা কারণে অযথা গা ঢালিয়া বসে না অর্থাৎ ভুলিয়া যায় না।

সার কথা এই. জন্ম হইবার পর পূর্ব্বস্মৃতির বিষয় যেন স্পষ্টভাবে লোপ পাইলেও তাহার সংস্কার থাকে। যেমন মৃত্যুভয়, সর্প দেখিয়া আতঙ্ক ইত্যাদি। সুতরাং অনুস্মৃতি একেবারে লোপ পায় না, তাহা অস্পষ্ট অবস্থায় থাকেই। আমরা জন্ম মৃত্যুর দেখা যেমন অনুভবের মধ্যে আনিতে না পারিয়া ভুলিয়া বসি, সেইরূপ আত্মবিস্মৃতির ভুলের জন্য জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া চলিতেছি। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত আছে ঃ—

হেতু বিহরণে তেষামাত্মবিস্মরণাদৃতে।
ন কশ্চিল্লক্ষ্যতে সাধো জন্মান্তর ফলপ্রদঃ॥

উৎপত্তি প্রকরণ ৯৫।৮

'জীবগণ যে জন্মপরিগ্রহ করিয়া বিচরণ করিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের আত্মবিস্মৃতি।'

এই পার্থিব জীবনের বাসনা ক্লিষ্ট কর্ম্ম সংস্কার যাহা স্মৃতিরূপে চিত্তক্ষেত্রে থাকিয়া. পারলৌকিক জীবন ঘুরিয়া পুনরায় পার্থিব জীবনে কষ্টের কারণ হয়, তাহাতেই মানব পুনঃ পুনঃ দুঃখ দৈন্য ও অপার কষ্ট ভোগ হইতে মুক্তি পায় না। যাঁহাদিগকে বুঝাইলেও বুঝেন না; সেই সকল তার্কিকের জীবন সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান লইয়া, মিথ্যা কল্পিত শুষ্ক জ্ঞানের উচ্ছল ভাব মধ্যে, কেবল অস্বাভাবিক অবিশ্বাস

ও সন্দেহ ভরা বিকল্প মনের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। আত্মচিন্তন, ভগবৎ প্রীতি, তাহাদের আদৌ ভাল লাগে না। তজ্জন্য জ্ঞানিগণ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদেষ জায়তাং ম্রিয়তামপি।
পুনঃ পুনর্দ্দেহ লক্ষৈঃ কিংনো দাক্ষিন্য তো বদ॥

পঞ্চদশী-১২ গ ২ শ্লোঃ।

'মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃ এই অনাদি সংসারে লক্ষ লক্ষ দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং কালগ্রাসে পতিতও হয়. অতএব তাহাদের গতি নিরূপণে আগ্রহের কি প্রয়োজন।'

প্রাক্তন ও পাপের প্রভাবে জীবনের পরিণতি

পূর্ব্বজন্মের বিদ্যা মায়াজনিত সত্ত্বভাবাপন্ন উত্তম কর্ম্মের সংস্কারের নাম প্রাক্তন। আর বাসনা জড়িত রজ-তম ভাবাপন্ন অবিদ্যা মায়ার খেলায় যে ভ্রান্তি আছে, তাহা যে ক্ষণিক, ক্লেশদায়ক ও পরিবর্ত্তনশীল, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া, কেবল জড়ের বাহ্যিক সত্তায় মাতিয়া থাকার নাম পাপ। এই পাপ যে কতবড় সর্ব্বনাশা তাহা বুঝিতে পারি যখন আমরা পরলোক সম্বন্ধে চর্চ্চা করি। পাপিগণ মৃত্যুর পর ভূবর্লোকে যাইয়া তথায় ঘন অন্ধকারে 'হা অদৃষ্ট' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

মানব জন্মান্তরের আবর্ত্তনের মধ্যেও ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিতেছে তাহা শুদ্ধ প্রাক্তন ফলের সাহায্যে। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার। যখন আমরা মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই, তখন মনুষ্যত্ব লাভের জন্য স্বভাবসিদ্ধ চিত্তজড়তা, অন্তরের মলিনতা, মনচাঞ্চল্য দূর করা এবং পশু সত্তার বিকার পরিহার করা আবশ্যক। মন ব্যভিচার-দুষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদিগের পারমার্থিক সত্য বোধের পথে প্রাক্তন ফলই সহায়ক। প্রায় সকলহে জীবনে সৎকর্ম্ম কিছু না কিছু করেনই।

আমরা পূর্ব্বজন্মের প্রাক্তন ভাণ্ডারে যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখি, পরজন্মের মঙ্গলের জন্য তাহার সাহায্য পাইয়া থাকি। সৎকর্ম্মের প্রেরণা দ্বারা যাহা অর্জ্জন করি, তাহা প্রাক্তন ভাণ্ডারে পরজন্মের জন্য আরও কিছু জমা দিই অন্তরতম সার্থকতার বোধে। জন্মের পর জন্ম লইয়া যখন আমরা জীবনের পথে যাত্রা করি, তখন প্রাক্তনের ফল জীবনের দুর্গম পথে সংস্কারের আবিলতার মধ্য দিয়া লইয়া যায় বিশুদ্ধ সত্যের দিকে; লইয়া যায় মানব মনের তমিস্রা ভেদ করিয়া জ্যোতির দিকে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া থাকে অমৃতের দিকে; দুঃখের, মূঢ়তার জঞ্জাল সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে সাধনার পথে প্রসক্তি যোগায়।

এইরূপেই মানুষ ক্রমে বিবর্ত্তনে আত্মোন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভের পথে বিঘ্ন সঙ্ঘটন ও গতিরোধ করে 'পাপ'। সে জন্মান্তরকে বাড়াইয়া দিয়া, দিগভ্রান্ত করিয়া, স্বখাত সলিলে হাবুডুবু খাওয়ায়। আমাদের সত্য পরিচয় প্রেমে, পরন্তু 'পাপ' তাহার প্রেমহীন স্বার্থপরতা লইয়া মানবের ভবিষ্যৎকে দীর্ঘসূত্রী করিয়া বৃথা জন্মের পর জন্ম ব্যতীত করায়, আত্মোন্নতির গতিরোধ করিয়া জঘন্য বৃত্তির প্রেরণা যোগায়। তাহাতে মানব জন্মের সার্থকতা কোথায়!

পাপীর মনের অবস্থা হয় চঞ্চল ও মন্থর, তত্ত্ব চিন্তায় তৎপরতা থাকে না, পাপী ব্যক্তির উক্তি এই যে, যাহা আছি তাহাই ভাল। তাহাদের অন্তর বাসনা-তুষ্ট বলিয়া জ্ঞান স্পৃহা লোপ পায়। তাহারা মানবীয় স্বভাব-বিরোধী অধঃপতিত অবস্থায় থাকিয়া বলেন, প্রত্যক্ষ বিষয়, বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞেয় বিষয় হইবে; মৃত্যুর পর জন্ম হয় কি না, তাহাতো সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ; সুতরাং তাহাকে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। এই সকল জ্ঞানার্জ্জনের দ্বারা, কি এমন সমৃদ্ধি লাভ ঘটিবে?

পরিতাপের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে ইহাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়বোধে। ইহাদের প্রাক্তন ভাণ্ডারে আছে অতি সামান্য বস্তু সঞ্চয়, তাহার উপর পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিলে, জ্ঞানের পরিসর ঐরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং পাপীর জীবনে শ্রেয়লাভ হয় না। আত্মিক বিশ্বের সহিত তাহাদিগকে বহু জন্ম অপরিচত থাকিতে হয়। নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বনকারী মানবকে নিকৃষ্ট ক্ষেত্র জাত বলা চলে। স্বার্থপরতা, মূঢ়তা পশুভাব মানবের আদর্শ নয়। প্রত্যেক মানব জীবনে জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে।

সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখিলেই, তাহার জ্ঞান হইল না, দৃষ্টি মাত্র হইল। দেখিলাম মাত্র, দেখিয়া কি জ্ঞান লাভ করিলাম? যাঁহাদের সমীক্ষণ নাই, বিচিত্রতার মধ্যে একত্ব সন্দর্শন করিতে চেষ্টার অভাব,

জ্ঞানে চির শিশুভাব, সেইরূপ অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর মধ্যগত হইয়া পাপ ও প্রাক্তন সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্ফলই হইয়াথাকে। “অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি”। ‘জল দিয়া কেবল দেহের শোধন করা যায়, মনের শোধন হয় সত্যে।’ এই সত্যচিন্তা, ও সত্যে বিশ্বাসী কয়জন? এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ তাদের সত্যকে, অন্তরের জ্যোতিকে দেখিতে দেয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি সত্য পরিচয় হয় প্রেমে। প্রাক্তন ও ভবিতব্যতার ক্রিয়া এক নয়। একটি হইল পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম প্রেরণা ইহজন্মে লাভ করা; এবং ইহজন্মেই ইহজন্মের কর্ম্মফল ভোগ করার নাম ভবিতব্য।

দেখা গিয়াছে কোথাও অজ্ঞের পুত্র পণ্ডিত হয়; কোথাও দস্যুর পুত্র সাধু হয়, ভিতরে যাই থাক। এ কেবল নিছক উত্তম প্রাক্তনের ফল। অপিতু পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল, প্রতিকূল, ভাল মন্দ অপেক্ষা করে। যে সংসারে সৎচিন্তার অভাব, বিদ্বেষ বুদ্ধি অহংকার ও মূঢ়তার আশ্রয়, তথায় জন্ম লইয়া মানব প্রথম হইতেই আপন প্রাক্তনের ফল জীবনে সম্যক্ লাভ করিতে পারে না; কোনক্রমে শেষ জীবনে শুভ ফল পাইয়া থাকে। এইরূপ সংসারে বালক অবস্থায় ভগবৎ চিন্তন করিলে তার কর্ত্তৃপক্ষ হিরণ্যকশিপু হইয়া উঠেন। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, প্রাক্তন ফলের উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

পাপের ফল বড়ই কঠিন, তাহা ইহকালে ও পরকালে ভোগ করিতে হয়। সুতরাং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই মানব জীবনের সন্তোষ ও উন্নতির কারণ। বিশ্বাস ও আস্তিক্য প্রাক্তনের এই শুভ ফল বহু জন্মের পর ধীরে ধীরে দেখা দেয। মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত যেমন বালকের স্বভাব দেখিয়াতার মাতা-পিতার চরিত্র ও স্বভাব বলিতে পারেন,তদ্রূপ অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, মানবের ইহজীবনে কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া, তাহার পূর্ব্বজন্মের প্রাক্তন ভাণ্ডার কিরূপ ছিল, তাহা বলিতে সমর্থ।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কি

এ সমস্যার সমীক্ষণ খুবই কষ্টসাধ্য। শাস্ত্রের দিক দিয়া, এবং পরলোক চর্চ্চার আভাস হইতে ও বর্ত্তমান ধরিত্রীর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া একটি সমাধান করা যায়। পূর্ব্বকালে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাঁদের সূক্ষ্ম জ্ঞানের সাহায্যে জগৎ-কল্যাণের জন্য যে সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম ঘটায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইং ১৯০০ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল একশত ষাট কোটি আশি লক্ষ, আর ১৯৪০ সনে দুইশত সত্তর কোটি দশ লক্ষ। পৃথিবীতে দুইটি ভীষণ যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এই বৃদ্ধি চিন্তার বিষয়। এবং নৈসর্গিক বা স্বাভাবিক নিয়মেও বহু মৃত্যু-পথের যাত্রী আছেন। সুতরাং তিরোভাব অপেক্ষা আবির্ভাবের সংখ্যা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে চারিটি বিষয়ের উপর :—

প্রথমতঃ,—এষণা ভাবের বৃদ্ধি হেতু অনিয়মিত মনোভাব।

দ্বিতীয়তঃ,—শাস্ত্রীয় অনুশাসন না মানা।

তৃতীয়তঃ,—বর্ণাশ্রমের গুরুত্ব বুঝিবার শক্তির অভাব।

চতুর্থতঃ,—মানবীয় ধর্ম্মের পতন।

এষণা—অর্থে প্রবল ইচ্ছা, বিশেষ প্রজনন ভাব। এই ইচ্ছা বহু প্রকারের হয়। যত প্রকারের ইচ্ছা আছে তাহাকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন শাস্ত্র ; যথা :—

পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা তথা।
এষণাত্রয়মিত্যুক্তং তদ্ধিস্যাৎ বন্ধ কারণম্ ॥

'সংসার বন্ধনের কারণ এই তিন প্রকার এষণা, যথা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা।'

যে এষণা দ্বারা মনোবিকার উপস্থিত হয়, কর্ত্তব্যের দিকে দৃক্‌-পাত থাকে না, আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়া কেবল ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করে, শান্ত সংযত স্ত্রীর অসম্মতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া রুক্ষ ব্যবহার করে, কাম চরিতার্থের

জন্য অস্ত্রোপচারের সাহায্য লয়, সেইখানেই পুত্রৈষণা ভাবের ব্যতিক্রম জনিত বন্ধনের কারণ হয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম লইতে হয়, নিজকৃত প্রাক্তন কর্ম্মফল লইয়া গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। বিত্তৈষণা—সম্পত্তি ও অর্থের উপর প্রবল আকর্ষণ। অতি সামান্য ক্ষতিতেও হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হওয়া। লোকৈষণা—নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে প্রচেষ্টা নাই। অথচ সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, লোকপ্রিয় হইবার ইচ্ছা, নিজ জঘন্য বৃত্তিকে গোপন করিয়া জনসমাজে নির্দ্দোষ থাকিবার ইচ্ছা, অর্থের সাহায্যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গলোকে, মহ, জন, সত্যলোকে যাইবার বাসনা। এখানে পুত্রৈষণাই নিবন্ধের নিষ্পাদ্য বিষয়। সৎপুত্র লাভের জন্য, পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য, কিরূপ নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়, শাস্ত্রে তাহার কী বিধিব্যবস্থা আছে পূর্ব্বে তাহার সামান্য ইঙ্গিত দিয়াছি। নচেৎ বহু সন্তানের জনক হইয়া ব্যসনাসক্ত হওয়া কোনক্রমেই জীবনের শ্রেয় ধর্ম্ম নয়।

শাস্ত্রের অনুশাসন ঃ—

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য মনোবলের আবশ্যক করে। ভগবৎ চিন্তার অভাব ঘটিলে মন দুর্ব্বল হয়, বিবেকহীন হয়, জীবনের নশ্বরতায় লক্ষ্যহীন হইয়া সত্য একেবারে ভুলিয়া যায়। সুতরাং তখন ব্যসনাসক্ত হয় ও ভোগ স্পৃহা বাড়িতে থাকে। ভোগী শাস্ত্রের অনুশাসন দেখেনা, মানে না, জানে না ও বুঝে না। ইংরাজি গোঁড়ামী এবং অর্থই তাহাদের সর্ব্বস্ব। জীবনের মানদণ্ড তৌল হয় অর্থ দিয়া। তাহারাই প্রমদ হইয়া পরমেশ্বর ও পরলোক স্বীকার করে না। কিন্তু প্রজনন বা সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞানে স্বাধীন ও বিশারদ।

আর্য্যশাস্ত্র এরূপ বিশাল এবং যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ যাহা অন্যান্য দেশের বিধিব্যবস্থার উপর স্থান পাইতে পারে। বহু প্রাচীন কালে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যপথে লক্ষ্য রাখিয়া এবং সমাজের দিকে দৃষ্টি দিয়া, ঋষিগণ শ্রুতি, স্মৃতি, জ্যোতিষ, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমানে সংস্কৃত শিক্ষায় ঔদাস্য ও শিক্ষার ব্যভিচার দেখা দেওয়ায়

আমরা নীতিভ্রষ্ট। আমাদের কোন গ্রন্থই আমরা বিশেষভাবে চর্চ্চা করি না। যদি চর্চ্চা রাখিতাম তাহা হইলে আমরা জীবনের ও সমাজে বহু কল্যাণ-জনক বিষয় দেখিতে পাইতাম।

মানবীয় ধর্ম্ম কি ? জীবনে সম দম অবলম্বন করিলে কেন জ্ঞান লাভ করা যায় ? তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধিবৎ নির্দ্দেশ আছে আমাদের শাস্ত্রে। আমরা মৃত্যুর পর কোন্ কোন্ পথে পরলোক যাত্রা করি এবং কর্ম্মদোষে কেন ঘন ঘন স্থূলদেহ ধারণ করি তাহারও নিরূপণ আর্য্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রুতি বাক্যানুসারে জানা যায় যে, আমাদের মৃত্যুর পর তিনটি মার্গের মধ্যে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নিসর্গপাত নিয়মে যে কোন একটি মার্গ দিয়াই পরলোক গমন করি। যাঁহারা রজোগুণ শূন্য, হিংসা, অসত্য, কপটতা ও অব্রহ্মচর্য্য পরিহার করিয়া, শত্রুর প্রতি দ্বেষ ও মিত্রের প্রতি অনুরাগ না থাকা অবস্থায় সগুণ অথবা নির্গুণ ব্রহ্মকে জানেন, বা ঐকান্তিক ভাবে জানিবার জন্য সাধনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সূর্য্যালোক অতিক্রম করিয়া মহ, জন, তপ যে স্তরের যোগ্য সেই স্তর প্রাপ্ত হন।

এখানে ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপিয়রের আত্মিকের বিষয় যাহা লবসাহেব তাঁহার 'Busy life beyond life' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সামান্য কয়েক লাইন দিতেছি ;—সেক্সপিয়রের আত্মিক মিডিয়মের সাহায্যে বলিতেছেন : "মৃত্যুর পর আমার শয্যা পার্শ্বে যে সকল আত্মিক ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, এক্ষণে তুমি পরলোকে চল। তোমাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি। তথায় গমন করিতে অযথা বিলম্ব করার কোন প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাঁহারা গগন মার্গে উত্থিত হইলেন, আমিও তাঁহাদিগের সহিত গগনে উঠিলাম। সূর্য্যমণ্ডলেরও বহু উর্দ্ধদেশে উঠিলাম ; পৃথিবী হইতে কত উর্দ্ধে উঠিলাম তাহা বলিতে পারি না। তাহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে যে কত, তাহা গণনা দ্বারা স্থির

করা যায় না। কিন্তু আমরা এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সেই দূরবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলাম!"

আর একটি উদারচেতা ধর্ম্মপ্রাণ সদাশয় ব্যক্তির আত্মিক (বিচারক এডমণ্ড সাহেবের আত্মিক) ইংলণ্ডের কোন সিয়ান্সে অর্থাৎ চক্রে নীত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহারও দুই চারি লাইন দিতেছি। ইহাও লবসাহেব 'Busy life beyond death' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী বিচারক এডমণ্ড সাহেবের আত্মিক মিডিয়মের সাহায্যে বলিতেছেন: "জীবিত সময়ে স্থূলদেহে আমার আমিত্বের যে পূর্ণ ভাব ছিল, মৃত্যুর পরও আমার আমিত্বের সেই পূর্ণ ভাব রহিল।...আমি স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইতে, আমার মৃতা স্ত্রীর আত্মিক ও বহু আত্মিক উপনীত হন।...আমি তখন যে শরীর পাইয়াছিলাম তাহা ব্যোম বিচরণের উপযোগী ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়াইয়া এক অপূর্ব্ব নগরের দ্বারদেশে উপনীত হইলাম। সেই স্থান পৃথিবী হইতে কতদূরে অবস্থিত উহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না।" এই দুইটি পাশ্চাত্ত্য মনীষী যে দেবযান মার্গে গমন করিয়াছিলেন, ইহা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর যে সমস্ত গৃহস্থ ব্যক্তি, ইষ্ট অর্থাৎ স্ববৈদিক কর্ম্ম, পূর্ত্ত অর্থাৎ জনসাধারণের উপকারার্থ বাপী, কূপ, তড়াগ, উপবন, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থাৎ দীন দুঃখীকে যথাশক্তি ধনাদি দান, পরিচর্য্যা, পরিত্রাণাদি অর্থাৎ শ্মশানবন্ধু, অগ্নিভয়, রুগ্নের এবং বিপন্নের সেবা করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে জীবনাতিবাহিত করেন, এবং সাকার ভাবে উপাসনা করেন, তাঁহারা আত্ম জ্ঞানের অনুশীলন ঠিকমত না করায়, দেহান্তে ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন।

তথায় ইষ্টফলকে উপভোগ করিতে করিতে যতদিন না কর্ম্মের ক্ষয় হয়, ততদিন চন্দ্রলোকে বাস করিতে হয়। কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় মানবদেহ

প্রাপ্ত হয়। ইহা সংক্ষেপে বলিলাম। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং গীতাতেও আছে। শ্রুতিবাক্য—

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশম্,
আকাশচ্চন্দ্রমসম্, এষ সোম রাজা তদ্দেবানামন্নং
তং দেবা ভক্ষয়ন্তি। ৫।১০।৪ ছান্দোগ্য।

'দক্ষিণায়ন ছয় মাসের পর পিতৃলোকের পর আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোক গমন করেন, এই চন্দ্রই রাজা অর্থাৎ দীপ্তিমান্ সোম, তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ, দেবগণ তাহাকেই ভক্ষণ অর্থাৎ উপভোগ করেন।' ইহার শঙ্কর-ভাষ্য পাঠ করিলে তবে ভালভাবে বুঝা যায়।

এই দেবযান মার্গ ও ধূমাদি মার্গের কথা সঙ্ক্ষেপে বলা হইল। এইবার যাহারা তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঘন ঘন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেন তাঁহারাই আমার অলোচ্য বিষয়।

যাঁহারা এই পার্থিব জগতে নিন্দনীয় আচরণ দ্বারা মৃত্যুকালে অশুভ অতৃপ্ত বাসনার মোহজালে অতিশয় চঞ্চল হন, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ সম্বরণে অশক্ত হইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাদের গতি কিরূপ হয়, উপনিষদে উল্লেখ আছে,—

অথৈ তয়োঃ পথোর্ণ কতরেণ চন, তানি মানি
ক্ষুদ্রান্য সকৃদা বার্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি, জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেঃ
তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে,
সম্মাজ্জুগুপ্সেত। ছান্দোগ্য—৫।১০.৮

অর্থাৎ 'আর যাহারা এই অর্চ্চিরাদি ও ধূমাদি মার্গরূপ কোন মার্গই গমন করিতে পারে না, তাহারা অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলন ও কর্ম্মানুষ্ঠান বিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ অসকৃৎ আবর্ত্তনশীল অর্থাৎ পুনঃপুনঃ আগমনকারী জায়স্ব ম্রিয়স্ব' নামক অতি হীন ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে; ইহাই হইতেছে তৃতীয় স্থান। এই কারণেই এই লোক অর্থাৎ চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ

হইতে পায় না ; এই জন্য ঐরূপ সংসার গতি বিষয়ে জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা করিবে।'

জায়স্ব অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর, ম্রিয়স্ব অর্থাৎ মরিয়া যাও। এই দুইটি দশা হইতে বোধ হয় যে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভোগ কর। আর ঘন ঘন গর্ভ কটাহে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ কর। সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে চন্দ্রলোক অপূর্ণ থাক, আর পৃথিবী ভরিয়া যাক। বর্ত্তমানে মানবীয় ধর্ম্মের দীনতাবশতঃ দেবযান মার্গ ও ধূম মার্গ উভয় মার্গই অনেকের পক্ষে কণ্টকাকীর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় মার্গে যাঁহারা পরলোক গমন করেন, তাঁহারা বহুকাল তথায় বাস করেন। পৃথিবীর ভার বাড়াইতে ভূবর্লোকের অন্ধকার হইতে এখানে ঘন ঘন আসেন না।

ইহা অখণ্ডনীয় সত্য যে, পুণ্য ও পবিত্র কর্ম্মে স্পৃহাবর্জ্জিত ব্যক্তি, নগ্ন নাস্তিকতার মধ্যে কেবল অন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভ লইয়াই থাকেন। আর পূর্ব্বকালের ন্যায় শোধন করার নীতি নাই। ভারতে আছে কেবল প্রশংসনীয় প্রাচীন অসার ঐতিহ্য। বর্ত্তমানে দেখা যায় কেবল মূঢ়তাপূর্ণ শাসন করার হিংস্রতা, সংসার সমাজ রাষ্ট্র সকলেই সেই এক নীতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহাকেই বলে যুগধর্ম্ম। আত্মিক উন্নতি ভুলিয়া যায় হা হা হৈ হৈএর মধ্যে ; সংসারের তাগিদ ও রাষ্ট্রের তাগিদ মিটাইয়া, সভ্য সমাজে বাহ্যানুষ্ঠানকে ঠিক রাখিয়া গৌরব বজায় রাখিতে হইলে ক্লান্তি পরিশ্রান্তি ও অবসাদ দেখা দিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় আত্মচিন্তা হয় কি করিয়া ; এই কথাই অনেকে বলেন।

কিন্তু অন্য দিকে জনক-জননী হইবার বলবতী স্পৃহাও যথেষ্ট। কেহ কেহ ভাবেন একটি বা দুইটি সন্তানের পর আর যেন না হয়। তজ্জন্য তাঁহারা প্রতিষেধকব্যবস্থা গ্রহণ করিতেও ত্রুটি করেন না। মানুষ আপন দুর্নিবার ভোগ স্পৃহাকে স্বচ্ছন্দ রাখিতে গিয়া অহিত বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি লইয়া স্বভাবের বিকৃতিতে যত্ন লওয়া, যেমন 'পুরুষের স্টেরিলাইজেশন, আর পাপ বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া একই কথা। সংযমের অভাব দেখা দিলে বর্ত্তমান

সমাজে বা গুরুজনের নিকট কোন দণ্ডনীয় বাধা নাই। এই জন্যই ত শ্রেয়োহীন দুর্য্যোগ মাথা চাড়া দিয়া আমাদের সৌভাগ্যের মূলে তীক্ষ্ণ আঘাত হানিতেছে। সংযমী বিবেকী সন্তানের জন্য যদি জনক-জননী হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে অভ্রান্ত শাস্ত্রনীতি মানিতেই হইবে, সংযম লইতেই হইবে। তাহাতে অল্প সন্তান হইবে সত্য, কিন্তু সেই সন্তান কীর্ত্তিমান ও উত্তম সংস্কার সম্পন্ন হইয়া জগতের কল্যাণ ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে; বিশ্বমানবকে খোঁজ করিবে; পিতামাতাকে অর্ঘ্য দিবে তাহার অন্তরতম বেদীতে বসাইয়া।

জ্যোতিষ শাস্ত্র, চরকাদি চিকিৎসা শাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বহু নীতিপ্রদ বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সৎপুত্র লাভের সঙ্কেত দেওয়া আছে। যুবক যুবতীর উক্ত স্বচ্ছ মনোবৃত্তি অবলম্বনেই, উচ্চস্তরের আত্মিকগণ জন্ম লইয়া থাকেন। সনাতনধর্ম্মী সন্তানগণের যখন বিবাহ হয়, তখন সংসারের চতুর কর্ত্তৃপক্ষ কত রকমের গণনাই না করেন! বিবাহের মাস বর্ণ, বশ্য, তারা, যোনি, গ্রহমৈত্রী, গণ, রাজ যোটক, ষড়ষ্টক প্রভৃতি বিচার করিয়া শুভ লগ্নে ও যোগে বিবাহ দেন। তার পর আসে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব কোথায়। শাস্ত্রের অন্যথাচরণ অর্থাৎ ব্যভিচার দোষ কেন আসে? কর্ত্তৃপক্ষ এখন নীরব কেন? তাঁহার জ্যোতিষ শাস্ত্র গেল কোথায়?

এই বিবাহিত জীবন ব্যভিচার দুষ্ট না হয়, তজ্জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের নীতি এই যে, ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভাধানের মুখ্য কাল। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ দিবস ত্যাগ করিবে। আর লগ্নে সূর্য্য ও চন্দ্র পাপযুক্ত ও পাপ মধ্যগত না হইলে ও ইহাদের সপ্তম স্থানে অশুভ গ্রহ না থাকিলে, এবং লগ্নের অষ্টমে মঙ্গল চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ না থাকিলে, আর নবম, পঞ্চম, লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে চন্দ্র শুভগ্রহ যুক্ত হইলে, গণ্ড সময় ত্যাগ করিয়া, যুগ্ম রাত্রিতে পুরুষের চন্দ্রাদি শুদ্ধ হইলে গর্ভাধান প্রশস্ত। গর্ভাধানে জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, রেবতী, উত্তর-

ফাল্গুনি, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং পর্ব্ব (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি) পরিত্যাগ করিবে।

কতজন যুবক আজকাল এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া ইহাতে পূর্ণ আস্থা রাখেন? কামাবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মনে হইবে এই উৎকট নীতি পালন ও ধৈর্য্যের গণ্ডীর মধ্যে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব কিছুই নয়; গর্ভাধানের দিন পঞ্জিকায় দেওয়া আছে, শুধু ধৈর্য্য লইয়া নিজ চন্দ্রশুদ্ধি দেখিয়া ঋতুর সহিত মিল করিয়া লইতে হইবে, মাত্র এইটুকু পরিশ্রম। এখানে একটি শ্লোক মনে আসে: "প্রেয়ো যোগ ক্ষেমাদ্, বৃণীতে" অর্থাৎ মন্দবুদ্ধিগণ (মূঢ়গণ) শ্রেয় অপেক্ষা প্রেয়কে বরণ করেন, অধিক পছন্দ করেন।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্ তো সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু হীয়তেঽর্থাৎ য উপ্রেয় বৃণীতে॥

'মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইটিকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে, মঙ্গলকে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।'

পশু বিকার দেখা দিলে বহু সন্তানের জনক হয় সত্য, কিন্তু তাহার পরিণাম হয়, অযোগ্য নিম্নস্তরের মানবের সংখ্যা বৃদ্ধি। তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে কেবল দুঃখ, অভাব ও ব্যাকুলতা ভোগ করিতে করিতে শ্রেয় কি তাহা ভুলিয়া বসেন। সুতরাং আমরা সার্থক মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কতই না ভুল পথে চলি। আমরা একটিবারও ভাবি না মানুষের অন্তরের একদিকে প্রেমসিক্ত পরম মানবের খেলা, আর একদিকে ভোগবিলাসী, স্বার্থান্বেষী, সীমাবদ্ধ, নিম্নমুখী জীব মানবের পরিহাস। একটি জমা অন্যটি খরচ। এই জমা-খরচ জ্ঞান থাকিলেই মানব অন্তরে ধনী হইয়া উঠেন, সঞ্চয়ী হন। শ্রেয় কি তাহা জানিতে পারেন। বৃথা প্রেয় লইয়া পাগলামি করিতে তাঁহাকে বিবেক বাধা দিয়া থাকে। অন্তরে ধনী হইতে হইলে বর্ণাশ্রমের সহায়তার আবশ্যক করে। যেমন একই শ্রেণীতে জীবনের পাঠেও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়।

বর্ণাশ্রমের গুরুত্ব—

বর্ত্তমানে আমরা বর্ণাশ্রমের ভূরি প্রমাণ বিকৃতির সংস্কার না করিয়া. তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর স্তর এক করিতে ইচ্ছুক। ঋষিদিগের নিঃস্বার্থ বহু পুরাতন যুগের দান, মানবকল্যাণের ব্যবস্থাকে, ভোগের আচ্ছন্নতায় ঘৃণা করিয়া, অজ্ঞতায় চিত্তজড়তা লইয়া, সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান বুদ্ধিতে, সাম্য ভাবের অভিনয়ে, কেবল বাক্যে ও বিধায়ে সর্ব্বভূত ভূমাকে দেখিলে কি প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হইবে? আধুনিক ভিন্নদেশীয় সাম্যভাবের সংস্কৃষ্টিকে আদর্শরূপে সহায় করিয়া রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সদ্গতির বাসনা করিয়া থাকি কিন্তু ইহাতে সুচিন্তার কোন উৎকর্ষ নাই, আছে পতনমুখী নিরর্থক চিন্তার সমাবেশ। ভিন্নদেশীয় সাম্যবাদ ভোগের ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু ভারতের সাম্যবাদ ত্যাগের পরিণতির উপর অভিব্যক্ত। সুতরাং এই দুইপ্রকার সাম্যবাদের মধ্যে একটি পর্ব্বত-প্রমাণ ব্যবধান আছে।

যদি এক স্তরের মানুষ হইতে হয়, তাহা হইলে সেই সার্ব্বজনীন ভূমাকে দেখিতে হইবে বিশুদ্ধ জ্ঞানে, নির্গুণ প্রেমে, হৃদ্গত সাম্যে। শুধু বর্ণাশ্রমকে ধ্বংস করিয়া যথেচ্ছচারী হইয়া নয়। এই প্রেম ও সাম্যমৈত্রীর ভাব লাভ করিতে হইলে, স্তরে স্তরে উন্নীত হওয়াই সম্ভব হইবে। প্রত্যেক মানবকেই তাহার জ্ঞানের, আত্মচিন্তার পথ অনুসরণ করিতে হইবে; এই বর্ণাশ্রম তাহারই একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা বা পন্থা মাত্র। এই বর্ণাশ্রম কাহারও জন্মগত নয়, তজ্জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'গীতায়' ৪পঃ ১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন, বর্ণাশ্রম গুণ ও কর্ম্মগত, ইহাও মায়িক। এইখানেই বর্ণাশ্রমের গুরুত্বের নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হইতে আদ্য, মধ্য, ও উপাধির বিদ্যার্থিগণ যদি এক সঙ্গে হৈ চৈ করিয়া পাঠ করে, তাহাতে যেমন শিক্ষার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, উৎকর্ষ ও চিন্তনশক্তি ব্যাহত হয়, যোগ্যতা অর্জ্জনে বিঘ্ন ঘটে, তদ্রূপ মানব সমাজের 'সু' ও 'কু' ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ, এক স্তরে থাকিয়া যদি কেহ সুসংযত ভাবে আত্মোন্নতির

চেষ্টা করেন ; হীন, অবিশ্বাসী, অহংকারী, ব্যঙ্গকারী, 'কু' সংস্কার সম্পন্ন বেহায়া মানবের অসংযত অবৈধ শূদ্রভাব সেখানে বিঘ্ন ঘটাইবে। সুতরাং উচ্চ মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানবের সৎভাবকে বিবশ করিয়া দিয়া সংযমে ব্যাঘাত হানিবেই। তাহাদের ব্যভিচার ক্রমে ক্রমে অন্যে সংক্রামিত হইবেই। অবশেষে আত্মোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া, ভোগের বাসনায় ভক্তি মুক্তি জলাঞ্জলি দিয়া বসিবে। অতএব স্কুলে ক্লাসের যেমন আবশ্যক আছে, সমাজে বর্ণাশ্রমেরও ঠিক সেইরূপ আবশ্যকতা।

চিত্তের নির্ম্মলতা লইয়া, পারমার্থিক সত্যকে জানিয়া, আত্মোন্নতির চরম জ্ঞান লাভ করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়া ভেদাভেদ ভুলিয়া, মানব ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তখনই সেই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইল যে সকল মানব ভুল ভ্রান্তি লইয়া কাম, ক্রোধ, লোভে ক্লিষ্ট হইয়া, চিত্তের সহিষ্ণুতাকে হারাইয়া, দুঃখে অবরুদ্ধ থাকিয়া, 'আমি কি' তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া। তজ্জন্য এই পবিত্র ভারত ভূমিতে উদাত্ত কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন :—

যঃ আত্মা অপহতঃ পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ,
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

ছান্দোগ্য ৮।৭।১

'আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরা মৃত্যু শোক ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিত, যিনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিতে হইবে।'

কেন জানিতে হইবে? পারমার্থিক সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য, আত্মজ্ঞান লাভ জনিত মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধলোকে গমন হেতু, এবং তথায় বহুকাল অবস্থিতির জন্য।

ব্রাহ্মণগণ আগম নিগমের রহস্য অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া যখন সম্যক্ ঈশিত্ব প্রাপ্ত হইতেন তখন ক্রমপরিণতির তত্ত্ব বুঝাইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য প্রচার করিতেন। সেই আগম ও নিগমকে

সহজ কথায় যাহাকে বর্ত্তমানে আপ্ এবং ডাউন বলে, সঙ্ক্ষেপে তাহার আভাস মাত্র নিম্নে দিতেছি।

আগম UP	নিগম DN.	উৎক্রান্তির পর শরীর প্রাপ্তি	লোক বা তত্রত্য শরীর	প্রমদক মার্গের গতি	ধূম মার্গের গতি	দেবযান মার্গের গতি
চিন্ময় পরব্রহ্ম	সংসাক্তি অব্যক্ত চিৎপরমাণু	জ্যোতির্ম্ময় মুক্ত শরীর	সত্যঃ মুক্ত শরীর			সত্যঃ সাযুয্য বিদেহ কৈবল্য
নির্গুণ মায়াজনিত চিৎপরমাণু (কূটস্থ) ঈশ্বর	মায়া (নির্গুণ)	মায়াজনিত সূক্ষ্ম কারণ শরীর	তপঃ অতি-সূক্ষ্মতম শরীর			সালোক্য তপস দীপ্ত
পরব্যোম + শব্দ তন্মাত্র	কাল স্থির বুদ্ধি	(অবিদ্যাস্রাত) আনন্দময় কোষ সূক্ষ্মতম শরীর	জনঃ সূক্ষ্মতম শরীর			জন সামীপ্য দীপ্ত
মরুৎ + + স্পর্শ তন্মাত্র	সত্ত্ব পঞ্চ প্রাণ ও মন	বিজ্ঞানময় কোষ সূক্ষ্মতর শরীর	মহঃ সূক্ষ্মতর শরীর			মহস দীপ্ত
তেজ + + + রূপ তন্মাত্র	রজ অহংকার ও চিত্ত	মনময় কোষ সূক্ষ্মশরীর	স্বঃ সূক্ষ্ম শরীর		মনময়শরীর স্বর প্রকাশ	
অপ + + + + রস তন্মাত্র	তম চারিকোষ, ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয় সগুণ মায়া	প্রাণময় কোষ বিম্ব শরীর	ভুবঃ বিম্ব শরীর	বাসনা শরীর ভুবস অন্ধকার		
ক্ষিতি + + + + + পঞ্চীকৃত	স্থূল পঞ্চকোষাত্মক পার্থিব শরীর	উৎক্রান্তি অন্নময় কোষ জীব শরীর	ভূঃ স্থূল শরীর	মৃত্যু ভূস স্থূল শরীর	উৎক্রান্তি স্থূল শরীর	উৎক্রান্তি স্থূলশরীর
↑		↑	↑	পুনর্জন্ম কয়েক বৎসরের মধ্যে	পুনর্জন্ম কয়েকশত বৎসর পরে	পুনর্জন্ম বহু শত বৎসর পরে

সৃষ্টির ক্রম পরিণতি তত্ত্ব যৎসামান্য আগম নিগমের আভাস দিয়া ঠিক বুঝান যায় না। তত্রাপি অতি সামান্য উপলব্ধি হয় মাত্র। আর্য্য ঋষিগণ বহু পুরাণ যুগে অমানুষিক বিজ্ঞান বলে স্থির করিয়াছিলেন, চুরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। এবং কর্ম্মসাধন আরম্ভ হইয়া থাকে। মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কতক জলৌকাবৎ কতক বা পরলোক ঘুরিয়া বিবর্ত্তন ক্রিয়া চলে।

শাস্ত্রে আছে ঃ—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং স্বেদজং নবলক্ষকং।
কূর্ম্মশ্চ রুদ্রলক্ষঞ্চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিনাম॥
ত্রিংশ লক্ষং পশুনাঞ্চ চক্ষুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাম্প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মানি সাধয়েৎ॥

'উদ্ভিজ্জ বিশ লক্ষ, স্বেদজ জীব নয় লক্ষ, মৎস্য কূর্ম্ম বার লক্ষ, পক্ষী পতঙ্গাদি দশ লক্ষ, আর জরায়ুজ প্রাণী পশু যোনি প্রাপ্ত হয় ত্রিশ লক্ষ, বানর জন্ম হয় তিন লক্ষ ; এই সকল তির্যগ যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্য জন্ম প্রাপ্তি হয়। তৎপরে কর্ম্ম সাধন আরম্ভ হয়।'

বর্ত্তমানে শিক্ষাভিমানিগণের, পাশ্চাত্যের যুক্তি আদর্শের উপর শ্রদ্ধা অধিক, তাঁহারা বলিলেন, ডারউইন আবিষ্কার করিয়াছেন বানর হইতে মানুষ। কিন্তু তাহাত ৬০।৭০ বৎসরের কথা। পরন্তু আর্য্য শাস্ত্রে বহু পুরাতন যুগে লিখিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচ্য ঋষিগণের আংশিকমাত্র জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে বিবর্ত্তনের ক্রম পরিণতিতে চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া প্রত্যহই বহু মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইতেছে। আর আত্ম-কর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া, সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়া, অবিশ্বাস লইয়া, অসংখ্য অসংযমী মানবাত্মা ভূবর্লোক হইতে ঘন ঘন এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহার পরিণাম হইতেছে উর্দ্ধগতি বা কারণাভিগমন অবরুদ্ধ হইয়া, শান্তির পরম আশ্রয় না পাইয়া,

কর্ম্ম দুর্গতি ভোগের জন্য, উভয় দিক হইতে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিতেছে।

মনুষ্য জন্মের পর যদি মানবীয় ধর্ম্মের পতন ঘটে, তাহাতে ক্ষতি এই যে, মানবের বোধগম্যতায় জড়তা আসিয়া প্রত্যয়হীন মানব মন, সত্যের সন্ধান করিতে অস্বীকার করে। এই পাঞ্চভৌতিক জগতের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া যায় তাহার মন।

মানবীয় ধর্ম্ম কি? মানবের অন্তরের যে শান্ত, শুদ্ধ, পবিত্র অবস্থা সেইটি তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। এবং জ্ঞানানুশীলন ও ভগবৎ চিন্তন তাহার গুণকর্ম্ম। গুণ হইতেছে তিন প্রকার—সত্ত্ব, রজ ও তম। সত্ত্বগুণাত্মক মানবীয় ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলে, রজোগুণাত্মককে উপধর্ম্ম, এবং তমোগুণাত্মক মানব, পশুধর্ম্মী বা পরধর্ম্মী। নীতি শিক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিতেছেন :—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ, সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

২।৪৪ উত্তর গীতা

ভাবার্থ এই,—আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশু ও মানবের ভিতর এই সাধর্ম্ম্য বিদ্যমান, তবে কি মানুষ ও পশু সমান স্তরের? না; পশুগণ তমোগুণাশ্রয়ী কিন্তু মানবীয় ধর্ম্ম সত্ত্বগুণের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সেই সত্ত্বগুণ বর্জ্জিত হইলে অবিশ্বাসী হয়, জ্ঞান আসে না, মানব তখন পশুর সমান হয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিতেছেন :—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ৩।৩৫

'উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অপূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্ম শ্রেয়, স্বধর্ম্মে নিধন হওয়াও মঙ্গলজনক কিন্তু পরধর্ম্ম ভয় সঙ্কুল।'

যাহাকে স্বধর্ম্ম বলে বা মানবীয় ধর্ম্ম বলে তাহা বাহিরের শ্রেণীগত ধর্ম্ম নয়। বাহিরের জাতিগত বা দলগত ধর্ম্মকে ইচ্ছানুসারে গ্রহণ বা ত্যাগ করা যায়। স্বীকার বা অস্বীকার করিতে বিশেষ কোন বাধা আসে না। কিন্তু প্রকৃত মানবীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না, তাহা আপন স্বভাবের সঙ্গে মিলাইয়া থাকে। সেই মানবীয় ধর্ম্ম যিনি সমীচীন ভাবে পালন করেন, তিনি বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হন। সত্যের সন্ধানে আত্মানুভূতির পথে চরম পরিতৃপ্তি লাভের জন্য তাঁহার মন অন্তরের দিকে গমন করে। যখন শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা তিনি সকলকে এক করিয়া লয়েন, সমদর্শী ও অবিরোধী হন, তখনই মনুষ্যত্বের লক্ষণ দেখা দেয় ও বিশ্ব ভূমার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এইটিই মানব ধর্ম্ম। ইহাই ভারতের সাম্যবাদ।

আর যাহারা অন্তরে ভোগ বিকার লইয়া রজোগুণাশ্রয়ী, তাহারা ঠিক মানবীয় ধর্ম্মকে বুঝিতে অক্ষম হইয়া বাহিরে বিক্ষিপ্ত মন লইয়া মাতিয়া থাকে। তাহারা 'আপন'-হারা অহঙ্কারী মানুষ। পরমের দিকে দৃষ্টিহীন হইয়া পাগলের মত বাহিরের সার্থকতা খুঁজিয়া বেড়ায়। ধর্ম্ম সেখানে ন্যায় নীতির তরল আবরণে ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণ ও জীবিকার কৌশল হয়, অশ্রান্ত যাত্রা তাহার অন্ন বস্ত্রের জন্য। সুখ দুঃখের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া, অহং সীমায় অবরুদ্ধ থাকিয়া, ভুল ভ্রান্তি নিষ্ফলতার পথে জীবনকে ছুটাইয়া দেয়। তাহারা ধারণাই করিতে পারেন না, ধন সম্পদ স্তূপীকৃত করিলেও এমন একদিন আসিবে যে, এই নশ্বর জগতে সকল ফেলিয়া, বাসনা বৃদ্ধির মনঃপীড়া লইয়া চলিয়া যাইতে হইবে বিদেহ অবস্থায় 'পরলোকে'। উপধর্ম্মাবলম্বিগণ অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করিতে শিখেন না। তাঁহারা জানেন না, তাহার পুঞ্জীকৃত দ্রব্য ভাণ্ডারের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বস্তু তদীয় অন্তরতম প্রদেশে রহিয়াছে। সেই কারণ 'উপধর্ম্ম' আশ্রয় করিয়া যেটুকু ক্ষণিক আনন্দ পায় তাহা লইয়াই সে জীবন কাটায়।

মানব পরধর্ম্ম আশ্রয় করিলে, করুণাশূন্য হইয়া অন্যের কাতরতায়

রহস্য করিয়া থাকে। ধনজনের উপর তীব্র আসক্তি লইয়া অপহরণ, দস্যুবৃত্তি, হিংসাদ্বেষ, বিরোধ, উৎকোচ প্রভৃতি লইয়া অন্যের ক্ষতিতে আনন্দ পায়। ঘনীভূত মূঢ়তায় স্বেচ্ছাচারী হয়। স্বার্থান্ধ হইয়া আত্মীয় বুঝে না। রিপুর বশে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মঙ্গল বুঝে না। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাসক্ত হইয়া উন্মাদের মত ভ্রান্ত পথে চলে। সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় ত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্বে জলাঞ্জলি দেয়। ভগবৎ তত্ত্বে প্রমদক অর্থাৎ নাস্তিক হইয়া মানবীয় ধর্ম্মকে ব্যঙ্গ, উপেক্ষা ও কটূক্তি করিয়া থাকে। মোটকথা মানব সভ্যতার অতি দুর্নীতি পূর্ণ খেয়াল লইয়া চিন্তাহীন গর্ব্ব দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। ইহাকেই বলে পরধর্ম্ম বা পশুধর্ম্ম।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আলোচনায় আমরা দেখিলাম জন্মের কারণ যে 'ইচ্ছা' প্রথমে তাহাতে, তাহার পর বিবর্ত্তনবাদে বহু জন্মের পর অর্থাৎ ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া মানব হইয়া জন্মাইতেছে। এবং অন্যদিকে অসংযমিগণ শাস্ত্রীয় নীতি অবহেলা করিয়া, তমোভাবাপন্ন অবস্থায় গর্ভাধান দিয়া ভূবর্লোকের আশ্রয়ে পীড়িত দুর্ভাগা আত্মিকগণকে এই কর্ম্মজগতে আসিবার সুযোগ করিয়া দিতেছে। তাহাতে ঘন ঘন তাহারা পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতেছে। মানব, কর্ম্ম সাধনের জন্যে পৃথিবীতে আসেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় স্তরে স্তরে আত্মোন্নতি করিবার বিশেষ উপায় বর্ত্তমান সংসারে অবসাদগ্রস্ত। ঋষিদিগের ব্যবস্থিত সত্যোপলব্ধির সোপান স্বরূপ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা (দশম ও একাদশ শতাব্দী হইতে বংশানুক্রমিক হওয়ায়) বিনাশের পথে। সত্ব গুণাশ্রয়ী মানবীয় ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পরধর্ম্মাশ্রয়ী ব্যক্তিই অধিক। আলোচনার মধ্যে যে আগম, নিগম সংক্ষেপে দেখান হইয়াছে তাহাতে প্রমদক মার্গ ও দেবযান মার্গের একটি ছক্ দেওয়া আছে। তাহার গভীর মর্ম্ম এই যে, আত্মোন্নতির ক্রমপরিণতিতে আত্মোন্নতি প্রকাশ হইয়া থাকে; ইহা উর্দ্ধ রাজ্যে বা লোকে গমনের সহায়ক। নাস্তিক বা অবিশ্বাসিগণ ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় সতত থাকে, তাহা আত্মজ্যোতি প্রকাশের সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থা; সুতরাং

ভূবর্লোক হইতে পুনরাবর্ত্তন করিতেছে। মনের বিপর্য্যয় ও বিকল্প অবস্থায় অতি সামান্য জ্যোতি প্রকাশ পায় তাহাতে 'স্বঃ' লোক পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন ও দীর্ঘকাল তথায় থাকিয়া ফিরিয়া আসেন। মনের একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায়, নিষ্কম্প জলে চন্দ্রবিম্বের বা স্থির দীপশিখার ন্যায় মনের অবস্থা হয়, তখন আত্মজ্যোতি অধিকতর প্রকাশ পায়। এবম্বিধ আত্মিকগণ পরলোকে মহঃ, জন, তপঃ লোক গমন করেন ও বহুকাল তথায় শান্তিতে বাস করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাশ্চাত্ত্যের পবিত্র আত্মিক 'সিলভা বার্চ্চের' উল্লেখ করা যায়। তিনি দুই হাজার বৎসর পরলোকে আছেন। ১৯১৮ সালে চক্রে আসেন ও উপদেশ দেন! আমারও চক্রে আত্মিকগণ বলিয়াছেন ২০০ হইতে ৭০০ বৎসর সেখানে আছেন। চক্রের বিবরণ মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন।

পরলোকে দুঃখ, সুখ ও শান্তির পরিমাপ হয় আত্মজ্যোতি বিকাশের উপর। এবং মায়ার গাঢ়ত্ব ও তরলত্বের উপর। পরলোকে যতই উচ্চস্তরে গতি হয় আত্মিক শরীর ততই পবিত্র ও হাল্কা হয়। আমাদের এই পার্থিব শরীরকে তাঁহারা ঘৃণা করেন। স্বর্গলোক হইতে ও তপোলোক হইতেও মায়ার খেলায় পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু তাহা বহুশত বৎসর পরে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পরলোক যাত্রার তিনটি পথ হইতে 'বিদেহ কৈবল্য' না হওয়া পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। এবং চৌরাশিলক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়াও প্রত্যহ নিম্নস্তরের বহু মনুষ্য জন্মলাভ করিতেছে। এবং প্রমদক মার্গ হইতেও ঘন ঘন আসিতেছে। অতএব বেহিসাবী ভাবে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়িতে থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি!

এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুশীলন অনুমান সিদ্ধ, কল্পনা নয়। কল্পনাও অনুমানের (Theory) মধ্যে, কল্পনার কোন বাস্তবতা নাই, বিষয়বস্তুর অভাব। কিন্তু অনুমানের তাহা আছে। জঙ্গলে একটি ভগ্ন শূন্য অট্টালিকা দেখিয়া অনুমান করা যায়, তাহার নির্ম্মাতা কেহ ছিলেন; পরন্তু কল্পনায় কোন অট্টালিকাই জঙ্গলে থাকে না, বাস্তবে

স্বপ্নবৎ কিছুই নয়। অনুমানের উপরেই এই সমস্যার সংক্ষিপ্ত সমাধান করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বেদান্তের সার কথা এই :—

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তি শব্দাৎ॥ ২২ শ্লোঃ ৪ অঃ ব্রহ্মপুত্র।

'অনাবৃত্তিঃ—পুনরাগমন বা পুনর্জন্মের অভাব, শব্দাৎ শ্রুতিবাক্য হইতে, অনাবৃত্তিঃ পুনরাগমনের অভাব, শব্দাৎ শ্রুতিবাক্য হইতে।'

অর্থাৎ নিরন্তর পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া অবিদ্যা দূরীভূত ও বাসনা না থাকায় সত্য সঙ্কল্প হইয়া, অতীব দুঃখাবহ অনিত্য সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন না।

গীত

বুঝাইয়ে দে মা ওমা শ্যামা
তোর মায়ার খেলা কি রকম
তোর ইন্দ্রজালের নাইক সীমা
মোরা বুঝতে নারি তার মহিমা
ওগো ভেল্কি দেখায় ন্যাংটা হয়ে মা—
ভবে, ভোগে পাগল নাই সরম।
যাদের প্রকাশ বহু জন্ম পরে
যারা সভ্য সেজে মা পোশাক পরে
থাকে কেন তারা রিপুর বশে—মা
ভুগে গর্ভাধানের সেই নিয়ম।
মায়া দিয়ে তুই করিস মজা
তাই মায়ার খেলায় জন্ম সাজা
ধন পুতেতে ভুলাইয়ে রেখে—মা—
কর বিশ্ব খেলার হদ্দ চরম।
তুই কোথায় থাকিস বলে দে মা
এযে মায়ার খেলায় হাসি কান্না মা—
(এভাবে) এই আছি নাই আবার জনম। —ফণি

তৃতীয় স্তবক

সৎভাবে থাকিবার উপায়

সৎ—অর্থে ব্রহ্ম, সত্য, সাধু, উত্তম প্রভৃতি। অসৎ ঠিক তাহার বিপরীত। সৎ ও অসৎ এই দুইটি অন্তরের ভাব বা বৃত্তি। যে চিন্তা দ্বারা চিত্ত প্রসাদ লাভ করা যায় তাহাই আমাদের সৎ চিন্তা। সৎ চিন্তায় মানব ভগবৎ ও পরলোক বিশ্বাসী হয়। এবং সৎমার্গের আশ্রয় লইলে, পরোক্ষে কূটস্থ শক্তির সাহায্য পাওয়া যায়। তাহাতে সুখ, শান্তি, সন্তোষ ও আনন্দ লাভ ঘটে। অপ্রীতিকর অমঙ্গল চিন্তায় মানবের পতন হয়। যাহারা উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তির জন্য নিরয় পথ আশ্রয় করে, মনস্তত্ত্বের চশমা পরিয়া তাহাদিগকে দেখিলে, মনে হইবে সেই দুশ্চরিত্র স্খলিত স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তির অব্যবস্থিত চিত্তের বাচালতা কিছু অধিক। ইহাতে হয় কি? অসৎ চিন্তায় কুপ্রবৃত্তির অতি তীব্রতা বশতঃ সৎবৃত্তিগুলির জড়তা আইসে ও পবিত্র চিন্তাশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়।

যে সকল মানুষ অসৎ পথে বা পাপ পথে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তাহার ভিতর যে সৎচিন্তার বীজ ভর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে মানবীয় প্রত্যয় লোপ পাইয়াছে, সৎচিন্তা ও উচ্চাশা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ, তাহা মনে করা ভ্রম। আছে সকলই, কেবল বহির্ম্মুখী মন, ভোগলালসায় সাংসারিক অন্ধকারে আকর্ষিত হইয়া দুর্ব্বল ইচ্ছা

শক্তি সম্পন্ন দশায়, কখন অন্য কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বা জন্মার্জিত সংস্কার হেতু অথবা অভ্যাস বশে বুদ্ধিবৃত্তি শিথিল হইলে, কুপথে পদার্পণ করিয়া থাকে। মলিন চিন্তার সংস্পর্শে আসিয়া মনোবিকার জনিত আত্মচিন্তায় উদাসীন হইয়া যায়। তজ্জন্য পরিণামে বিড়ম্বিত জীবন বহন করে। পরন্তু ইহাদের উদ্ধারের পথ অতি সহজ। ইহারা সুপ্ত, ধাক্কা খাইলেই জাগিয়া উঠে।

মনুষ্য চরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমবায়ে গঠিত। সন্মার্গে অর্থাৎ উত্তম পথে মনকে লইয়া যাইতে হইলে কতকগুলি সৎবৃত্তির আশ্রয় লইতে হয়। বহু মানবের ভিতর যথার্থ মানবীয় প্রতিভা অবিকশিত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহা বিকাশের জন্য অভ্যাস, সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, সৎনীতি, সৎসঙ্কল্প, সৎচর্চ্চার অনুশীলন আবশ্যক করে। এবং মাতা পিতার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রাখিতে হয়। সৎপথে বা অসৎপথে, মন অভ্যাসের দ্বারাই চালিত হয়। মনে করুন, কোন একটি স্থানে আমি প্রত্যহ যাই, পনের দিন যাইবার পর সেই স্থানে যাইবার জন্য মন ব্যস্ত হইবে। মন সেই স্থানে বা সংঘে যাওয়ায়, উত্থান কি পতন হইতেছে, সাধারণ ব্যক্তি তাহা বিচার করিয়া দেখিবে না। সুশীলত্ব বা কুশীলত্বের বিবেচনা করিবে না। অভ্যাসের কুহকে পড়িলে মনের অবস্থা এরূপই হয়। এই মনস্তত্ত্বের সামান্য জ্ঞান যাহার আছে, তিনি অভ্যাসকে সৎপথেই চালিত করিয়া থাকেন।

জীবনকে কালরজ্জু বন্ধন করিয়া, 'মৃত্যু' ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সহিত তাহার নিকটে টানিতেছে, তাহা আমরা মায়া মোহের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকিয়া বুঝিতেই পারি না যে, ক্রমশঃ প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত মৃত্যুর নিকট যাইতেছি। উদয় অস্তের ঘটিকা যন্ত্র কেহই আমরা লক্ষ্য করি না। যখন একেবারে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হই তখন অন্তর কাঁপিতে থাকে, ভীত হই, সন্ত্রাস দেখা দেয়, হতাশ হইয়া পড়ি। তদনন্তর পরলোকে পৌঁছাইলে, অপূর্ণ আশা ও

ভোগ-বাসনার তীব্র স্মৃতি পীড়ায় জর্জ্জরিত হইয়া থাকি। নিজের কর্ম্মদোষেই নিজেকে অস্থির হইতে হয়। যাঁহারা পরলোক সমীক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন, যাহারা সুপথ ভ্রষ্ট, কুকর্ম্মী ও বাসনার দাস, তাহাদিগের জন্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এমন একটি দুঃখময় ছায়া বা অন্ধকার স্থান সৃষ্ট আছে, তথায় মৃত্যুর পর তমোগুণাশ্রয়ীগণ যাইয়া থাকে।

সুতরাং আমাদিগকে এবম্ভূত পবিত্র অভ্যাসের সেবক হইতে হইবে, যাহাতে ইহলোকে ও পরলোকে শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের ভিতর দুইটি অন্যোন্য বিরোধী ভাব বিদ্যমান, একটি প্রবৃত্তি অন্যটি নিবৃত্তি। প্রকৃতির খেলায় আমরা সবাই মগ্ন। মনের যাচ্য কি, চায় কি? সে চায় সুখ সম্পদ, যশ গৌরব, ধনধান্য ইত্যাদি। চাই না নিবৃত্তির ভাব। কেন চাই না? আমাদের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া, চৈতন্য প্রবুদ্ধ করিতে আমাদের অন্তর অবসাদগ্রস্ত থাকে বলিয়া। পরমার্থ চিন্তার অভ্যাসে বীতরাগ এই হেতু। প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির ভাব অতি উচ্চস্তরের। মানবের পক্ষে ইহা কাম্য। কিন্তু ইহা সাধনা ব্যতীত লাভ করা যায় না। রজ-তম গুণাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে অতি দুষ্প্রাপ্য কৌস্তুভসদৃশ। বাহ্যিক অন্ধতা অনেক ভাল, আন্তর অন্ধতা অপেক্ষা। বাহিরের অন্ধ সামান্য সাহায্য পাইলে চলিয়া যাইতে পারে তার নিজ আবাসে। কিন্তু অন্তঃকরণ যার অন্ধ হইয়াছে সে নিবৃত্তির স্বর্গীয় আলোক পথেও হোঁচট্ খাইয়া পড়ে। যেন তাহার নিরিন্দ্রিয় অবস্থা, যেমন রাত্রির উজ্জ্বল আলোকে রাত্র্যন্ধ অন্ধই থাকে। সে চায় প্রবৃত্তির গোলক ধাঁধায় গর্ব্বিত-ভাবে ঘুরিয়া মরিতে। জীবনের গন্তব্য পথ তাহার হারাইয়া গিয়াছে। যেখানে নিঃশ্রেয়সের অভাব সেখানে মনের অলীক ভোগস্পৃহায় মাতিয়া বৃথা জন্মের পর জন্ম কষ্ট পাইয়া থাকে। ব্যর্থ তার জীবন।

আমার অনুরোধ, ঋত সত্যের উপলব্ধির জন্য একটিবার চেষ্টা

করিয়া দেখুন, অভ্যাসই আপনাকে সিদ্ধি দিবে। সৎভাবে থাকিবার একমাত্র উপায় ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ভগবৎ চিন্তন। প্রথমে ঈশ্বর চিন্তায় বিরক্তি দেখা দিবে, ভাল লাগিবে না। যেমন ছেলেদের ক-খ-গ-ঘ পড়িতে ভাল লাগে না। বালক তার শিশুবুদ্ধিতে বুঝিতে পারে না, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষার ফল কি। প্রত্যহ অভ্যাসে তাহার মধ্যে বিরক্তি আসে। তজ্জন্য সে ফাঁকি দিয়া পালাই পালাই ডাক্ ছাড়ে। যখন সে শিক্ষার উচ্চস্তরে উঠে, ভালভাবে লিখিতে ও পড়িতে শিখে, তখন ভুলিয়া যায় ক, খ শিক্ষার কথা। জ্ঞান তাহাকে আনন্দ দিয়া মনুষ্য সমাজের উত্তম আসনে বসাইয়া থাকে। সুতরাং ফাঁকি দিয়া যেমন বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না, তদ্রূপ ধোঁকা দিয়া সত্যদর্শী হওয়া যায় না বা বিশ্বপ্রেম লাভ করা যায় না। সে প্রেমে (নিজ মনেই বিচার করিলে) আসল মেকী ধরা পড়ে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মন অভ্যাসের বশ। অতএব সৎপথে থাকিবার একমাত্র উপায় হইতেছে অভ্যাস। প্রতি প্রভাতে পবিত্রভাবে প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তির সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া, সুখাসনে নির্জ্জনে বসিয়া নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বর চিন্তন। গুরুদত্ত বীজমন্ত্র বা প্রণবসুরে তন্ময় হইয়া মন দিয়া অন্তর মধ্যে ধ্বনি তুলিলেই একাগ্রতা আসিবে। কিন্তু এই ধ্বনি, প্রবাহের মত হাওয়া চাই। এইরূপ চিন্তনের পরিণামে অহেতুক জাগ্রত হইবে, শুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি। অন্তরে তখন বিবেক ও জ্ঞানের উদয় হইয়া, মনের মালিন্য ও সংকীর্ণতা দূরে চলিয়া যাইবে। তৎকালে মানব পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মানুষ ভুল করিলেই অশান্তি জাগে। বিক্ষিপ্ত মানবমন বহু ভুল করিয়া থাকে। সাধনার পথেও ভুল হয়। কিন্তু সে ভুলে বিশেষ পতন হয় না। এই ভুল করার ভিতরও সামান্য সার্থকতা আছে। যেমন আমরা সৎভাবে থাকিবার জন্য অথবা সাধু ভানের আড়ম্বর

দেখাইবার জন্য, চঞ্চল মনে বাহিরের একটি উপাস্য দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকি, যদিও তাহাতে পরম জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না; তথাপি উদ্দেশ্য সাধু থাকায় এই প্রতীক উপাসনায় প্রেম ও ভক্তির তরল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথার্থ সাধনায় মনের চঞ্চল অবস্থা দূর হইয়া যায়। ইহাই হইতেছে সৎচিন্তা বা আত্মচিন্তন। তাহা কেবল শুদ্ধ প্রেমের সাহায্যেই লাভ করা সম্ভব হয়। বিশ্বের সম্যক্ জ্ঞান, সত্যপরিচয়, প্রেমে হয়। এই সংসারে রজ-তম গুণাশ্রয়ী ভোগের প্রেমিক যেরূপ, শত কর্ম্মের মধ্যেও তাহার প্রেমিক চিন্তায় সতত বিভোর থাকে, সেইরূপ যাঁহারা ভগবৎ প্রেমী, তাঁহারা একটু নিরালা পাইলেই ভিতর বাহিরের সমস্ত ব্যাঘাত নিরস্ত করিয়া তন্ময় হইয়া যান, সেই ঋত সত্যের ভাবে। যাঁহারা যথার্থ প্রেমিক তাঁহারা অন্তরতম সার্থকতা বোধে, অন্তর্মুখে ধাবিত করেন তাঁহার মনকে। সে প্রেমে ভোগের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহা নির্গুণ প্রেম। সে প্রেমে আতঙ্ক নাই, ভ্রান্তি নাই, ব্যর্থতা নাই। আতঙ্ক কেবল অসৎ ভাবনায়।

সৎভাবে থাকিবার উপায় সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অধিক কথার আলোচনা করা বৃথা। বহির্ম্মুখী জীব মানব, ভুলপথে যেরূপ বৃথা ভোগের কল্পনায় আনন্দ বোধ করে, তদ্রূপ 'মনের মানুষ' অনুসন্ধানকারী সাধক সৎভাবে থাকিয়া ত্যাগের মহিমায় নির্ম্মল আনন্দে পরিতৃপ্ত হন।

আউল বাউল গীত

বিশ্বপ্রেম কি যা-তা কথা ভাই
সে প্রেম জান্‌তে হলে মনন চাই।
মালা গলে শির মুড়ালে, সে প্রেম না মিলে
মিলে না জটে, কপ্‌নি এঁটে, তিলক আঁকিলে,

মিলে না কষায় বসন পরিলে ;—
ভূরি ভূরি শাস্ত্র পড়ে ভ্রান্তি ভাঙ্গে কি ?—
গুরু-গিরি যোগভেল্কি তাতে আছেই বা ছাই কি ;
কিছু খাটবে না, ফন্দি চালাকি,

মনের পাপ মনের মানুষ করে যাচাই,—
তাতে আসল মেকি হয় বাছাই।
বিশ্বপ্রেম কি···

নিয়ে মদ মৈথুন মায়ার খুলি পঞ্চ-মকারে
মিলেনা পাক্‌ড়ি বেঁধে, ছাই, সিন্দূর পোরে,—
সেজে গুজে প্রার্থনা ঘরে—
ভাইরে মনকে ডুবাইয়ে মার, শুদ্ধ প্রেমের সাগরে,
নির্গুণ প্রেম পেতে হলে মনটা খাঁটি চাই
বিশ্বপ্রেম কি···

ফণি বলে,—বিশ্ব জুড়ে আকাশ যেমন—
আত্মভরা বিশ্ব তেমন ;
সে পরম জ্ঞানে আনন্দ সদাই—
তাতে ধোঁকা খাবার নাই।

—ফণি

বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা

বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা প্রগাঢ় মূঢ়তা নষ্ট হয়; ভাব প্রবণতা দূরে যায়; বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ ঘটে; জাগতিক সূক্ষ্মাংশের ভিতর বুদ্ধির প্রবেশ করিবার শক্তি জন্মে; সিদ্ধান্ত ও সঙ্কল্পে মার্জ্জিত বুদ্ধির স্থিতিলাভ ঘটে; সংযম, নিয়ম, কর্ত্তব্য, ও বিতর্কে স্বচ্ছ মানবীয় চিত্তের পরিচয় প্রকাশ পায়; নিজ দেশে স্বতন্ত্র থাকিবার স্পৃহা ও উদ্দীপনা জাগ্রত হয় এবং জ্ঞানের বিকাশ হয়। পরমার্থ চিন্তা ও পরলোক চর্চ্চার জন্য শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। প্রকৃত শিক্ষার সহিত জ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ।

বৈদিক কালের অতি প্রাচীন ভারত, শিক্ষার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। পুরাকালে উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞানী ও তপস্বীদিগকে ঋষি আখ্যা দেওয়া হইত। ধর্ম্মের তপোবন ভারতে ঋষি জ্ঞানের উচ্ছ্বাসময়ী অলকনন্দার অমৃত প্রবাহে তরঙ্গায়িত হইত। সেই কামগন্ধহীন আসক্তিহীন স্বচ্ছ অমিয়ধারা পান করিয়া মানব সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানী হইতেন। পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমানে সেই অমৃত প্রবাহের-উচ্ছ্বাস মন্দীভূত; সৌভাগ্যের ইতিহাস কীটদষ্ট। এখন আর সে ঋষিও নাই, নব নব আবিষ্কারের চেষ্টাও নাই। ভারত আজ পারমার্থিক জ্ঞানে দরিদ্র, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এই দেবভূমি গুরু বা আচার্য্যের আসন ত্যাগ করিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষা কেবল অন্নবস্ত্রের সমাধান চেষ্টায় ব্যাপৃত। এবং বিলাসতার রঙ্গিন নেশায় ভ্রান্ত মনোবৃত্তির চাপে মুগ্ধ। পূর্ব্বকালের শিক্ষা বিভূতিকে অনুসন্ধান না করিয়া অনেকেই নিরস্ত। তজ্জন্য পুঁথিগত বিদ্যাকে কেন্দ্র করিয়া অনেকে পাণ্ডিত হন। তাঁহাদের জ্ঞান-মান অতি অল্প। তথাপি শিক্ষাভিমানিগণ আপন বৈশিষ্ট্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য, জ্ঞানে নিরংশু হইয়াও জ্ঞান নিষ্ঠার পরিচয় দেন। বর্ত্তমানে বহু বিপ্লবী, আর্য্যশাস্ত্রে আস্থা হারাইয়াছেন। এ দোষ তাঁহাদের নয়, শিক্ষার!

ঋষিগণ যে কত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ভূতত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, গ্রহতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, ভূততত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, পরমাণুতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব বা পরমতত্ত্ব প্রভৃতি বহুতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জগতের কল্যাণার্থে দান কারয়া, তাঁহারা এই দেশকে জগৎ-পূজ্য করিয়াছিলেন। এই সকল কথায় অবিশ্বাস করিবার মত মনোবল বায়ু বিকারগ্রস্ত নাস্তিক অবিশ্বাসী-গণের আছে। তাঁহারা আর্য্য অবদানের প্রামাণিকতায় সন্দিহান হইয়া, কেবল জড় বিজ্ঞানের আবিষ্কারে মুগ্ধ থাকিয়া যুক্তিবাদী সম্প্রদায়, শুধু তর্কই করেন না, ঋষি গ্রন্থের উপর ব্যঙ্গও করেন। তাহার কারণ বোধের বিস্তৃতির অভাব, যাহাকে বলে, গণ্ডূষ জল মাত্রেণ···। তাহাদের নিকট আমার নিবেদন প্রত্নতত্ত্ববিদ পাণ্ডিত প্রফুল্লকুমার গুহ বি, এ, মহাশয়ের গ্রন্থ একবার পাঠ কারবেন।

আমার নিজের একটি ঘটনা বলিতেছি ঃ—তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে সেই সময়কার কথা। তখন আমি থাকিতাম মধ্য-প্রদেশের জব্বলপুর সহরে। মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলার এক শিক্ষিত ব্যক্তি, আমার লিখিত দর্শনসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থের হিন্দি অনুবাদ পাঠ করিয়া, তুই একটি বিষয়ের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য আমার নিকট আসেন। কথায় কথায় হিরোসিমা ও নাগাশাকির ব্যাপার লইয়া জার্ম্মানীর 'এটম্' আবিষ্কারের কথা উঠে। ভদ্রলোকের বক্তব্য এই, ভারতে পরমাণু সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিগণ কিছুই জানিতেন না। আমি তাঁহার মন্তব্যে অসম্মতি জানাইয়া বলিলাম যে, ঋষিগণ সম্যকরূপে পরমাণুতত্ত্ব ও তাহার ধ্বংসকারী শক্তি পরিজ্ঞাত ছিলেন। ভদ্রলোক বলিলেন, আমি বহু গ্রন্থ পড়িয়াছি কিন্তু কোথাও পাই নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম আর্য্য শাস্ত্র সমুদ্র বিশেষ, তাহা পড়া ত সহজ কথা নয়! এই কথায় কিছু অভিমান বোধ করিলেন, কারণ তিনিও একজন গ্রন্থকার। আমাকে তিনি বলিলেন, আপনি যদি পড়িয়া থাকেন বলুন? আমি তখন তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে

বলিলাম ; ঋষিগণ অসুরনাশিনী মা মহাশক্তি দেবীকে প্রণাম করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"পরমাণু স্বরূপেচ দ্ব্যনুকাদি স্বরূপিণী।
স্থূলাতিসূক্ষ্ম রূপেচ জগদ্ধাত্রী নমোঽস্তুতে।"

'মা, পরমাণুর মত ধ্বংসকারী শক্তি তোমাতে, দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্রিত হইলে যে শক্তি হয় সেই শক্তি তোমাতে, মা, তুমি স্থূল ও সূক্ষ্ম, তোমাকে নমস্কার।'

তখন ভদ্রলোক ঋষিদিগকে শ্রদ্ধাবনত শিরে নমস্কার করিয়া উপরোক্ত প্রণামটি লিখিয়া লইলেন। যাক, এহ বাহ্য ; যে বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে তাহার মধ্যে আসা যাক।

প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষার ফলে আমরা সত্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। আমরা শিক্ষার ভিতর দিয়া ঠিক ভাবে যখন বুঝিব, শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তখন নিজের ও সন্তানগণের পরম কল্যাণের জন্য বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া ঋষি ঋণ পরিশোধের জন্য মানবীয় কর্ত্তব্যে যত্ন লইব। তাহাতে আমরা লাভ করিব মনুষ্যত্ব, সভ্যতা, পারমার্থিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। এই মুখ্য উদ্দেশ্যের সহিত, গৌণভাবে কৃষি, শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য অর্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া সুখী থাকিবার ব্যবস্থা করিব। জীবনের স্বচ্ছন্দতা, শিক্ষার ভিতর দিয়াই লাভ করা সম্ভব। যাঁহারা বিদ্যা শিক্ষায় শৈথিল্য করেন, তাঁহারা জ্ঞান জ্ঞাতব্য কিছুই বুঝেন না, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া থাকেন। শিক্ষার অভাবে কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারা যায় না। যেখানে বুদ্ধির স্বচ্ছতার অভাব, সেখানে আস্তিকতা নাই, সঙ্কল্প নাই। চিত্তের জড়তা ও মূঢ়তা প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষাতেই নষ্ট হইয়া থাকে। যথার্থ শিক্ষার অভাব হইলে, সন্তান মাতা-পিতা ও গুরুজনকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, বিনয় ও কর্ত্তব্যে অবহেলা দেখা দেয়। সামর্থ্যহীন দরিদ্র পিতার

কথায় তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। এই সকল দীন শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিতের অন্তর সর্ব্বজ্ঞতার অভিমানে, অশিষ্ট বৈশিষ্ট্যে ভরিয়া থাকে। আত্মোন্নতি ও পরলোক চিন্তা জীবনে না করিয়াও তাঁহারা বিজ্ঞের মত যোগ্যতা দেখাইবার জন্য বিতর্ক বাদে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি শিক্ষার অভাববশতঃ যথাকালে হারাইয়া বসেন তাহার খেই। যাহাদিগের ইহকালই সর্ব্বস্ব ও প্রেয়, তাহারাই নাস্তিক চার্ব্বাকের সিদ্ধান্তে নিজ নিজ চলার পথ বাছিয়া লইয়া থাকেন।

যথার্থ বিদ্যা শিক্ষার অভাববশতঃ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সকল বিগড়াইয়া যায়। তখন হইয়া যায় অন্তরে সন্তোষের অভাব; তাহার পরিণাম হয় মনের ভোগ চঞ্চল অব্যবস্থিত অবস্থার জন্য সুখ দুঃখের অব্যক্ত অশেষ যাতনা ভোগ। সুতরাং যথার্থ বিদ্যা শিক্ষা আমাদের জীবনে সর্ব্বোত্তর প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য। যেরূপ আহার নিদ্রা শরীরের প্রয়োজন, তদ্রূপ বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করিলে, উদ্বেগশূন্য হইয়া স্বস্তি লাভ করা যায়। জগতের নশ্বরতা বিচার করিয়া ত্যাগী হওয়া যায়। নিবৃত্তির পথে গিয়া ইহ পরলোকে আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায়।

কৈশোরে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার দেখা দেয় কেন

কৈশোরে পূর্ব্বজন্মের যে সংস্কার দেখা দেয়, তাহা অনুসরণকারীর পূর্ব্বজন্মসম্ভূত কর্ম্মের অনুভূতির প্রতিভাসমাত্র। তাহা কেবল ছায়ার স্মৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইহাকে বলিয়া থাকে পূর্ব্বজন্মের অণুস্মৃতি বা সংস্কার। বেদান্ত দর্শনে এই অণুস্মৃতি সম্বন্ধে ২অঃ ২পাঃ অন্যভাবে উল্লেখ আছে। আমরা পূর্ব্বজন্মে যে সকল কর্ম্মে বিশেষভাবে ব্যাপৃত বা আসক্ত ছিলাম, তাহারই সঞ্চিত স্মৃতি শৈশবে বা পর অবস্থায় প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। তাহার কারণ এই :—

পূর্ব্বজন্মের উৎক্রান্তি সময়ে, যখন মানবের সূক্ষ্মাংশ সম্পিণ্ডিত হয়, তখন তন্মধ্যে অন্তঃকরণও থাকে। যাহাকে আমরা অন্তঃকরণ বলিয়া ব্যক্ত করি তাহা চারিটি বিভাগের সমবায়,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। ইহা মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরে অপঞ্চীকৃত অবস্থার মধ্যে কিছুকাল থাকিবার পর, যখন গর্ভে আশ্রয় লইবার সময় আইসে, তখন এই সূক্ষ্ম শরীর পঞ্চীকৃত দেহের বৃদ্ধির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যথাস্থানে সন্নিবদ্ধ হইয়া থাকে। যথাকালে স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা শক্তি প্রবুদ্ধ হইলে, চিত্তস্থিত বিষয়েরই একে একে ক্রিয়া দেখা দেয়; প্রাক্তনের ক্রিয়া নষ্ট হয় না। জীবের কৈশোর হইতেই তাহা অল্প বিস্তর প্রকাশ পাইতে থাকে। আমাদের এই চিত্তকেই চিত্রগুপ্ত বলে। চিত্তের ভিতর পূর্ব্বজন্মে যে সকল সংস্কার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা কোষে জড়িত ছিল, তাহা যথাকালে পরজন্মে অন্তঃকরণ হইতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্থূল ভাবে প্রকাশ হইতে থাকে। যদ্যপি সেই সংস্কারে, উত্তর জীবনে প্রকৃষ্ট অনুকূল বাতাবরণে পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কৈশোরে বা শৈশব হইতেই কোন বালক ধীর, শান্ত, বিনয়ী ও মাতা-পিতার বাধ্য থাকে; কেহ বা ঈশ্বরে ভক্তি করে; কাহার কামজ দোষ; কাহার নিষ্ঠুর আচরণ; এবং কটূক্তি, ঝগড়াটে স্বভাব প্রভৃতি কোপজ দোষ দেখা যায়। কেহ কেহ বা বাল্য খেলায় দোকান সাজায় মাটির জিনিসে; গাছ রোপে; মাটিতে ঘর বাঁধে; চোর-পুলিশ খেলায়; কেহ বা মন দিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে। বহু ভাবের বিচিত্র চরিত্রের লীলা খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকলই পূর্ব্বজন্মের অনুস্মৃতি বা সংস্কার।

কামজ ও কোপজ দোষ প্রভৃতি জঘন্য নিকৃষ্ট স্তরের ক্রিয়া কৈশোরে দেখা দিলে, মাতা-পিতাকে সতর্ক হইতে হইবে। যদি মাতা-পিতা তাহাতে পূর্ণদৃষ্টি রাখেন এবং অনুজ্ঞা ও শিক্ষাদান দ্বারা, দণ্ড শাসন না করিয়া বালকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে

সমর্থ হন, ভবিষ্যতে সেই বালক সৎপুত্র হইয়া মাতা পিতাকে আনন্দ নিশ্চয়ই দিবে। আর সেই বালক, জঘন্য বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উত্তরকালে উন্নত জীবনের অধিকারী হইয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিবে।

বালকের স্বভাব পরিবর্ত্তনের সহজ উপায় হইতেছে, প্রভাতে উঠিয়া স্তোত্রপাঠ, গুরুজনকে প্রণাম, ভজন সঙ্গীত গান করা, তৎপরে যথাকালে পাঠাভ্যাস এবং সন্ধ্যায় ভগবৎ প্রার্থনা, ভজন গান ও পিতা বা মাতার উপদেশ শ্রবণ। পিতা-মাতা যে পরম গুরু, তাহা তাঁহারা কেবল জন্মদাতা বলিয়াই নহে, বহুভাবে উপদেশ ও সহায়ক হইয়া সন্তানের কল্যাণ সাধন করেন বলিয়া। সৎপ্রবৃত্তি ও ভগবৎ নিষ্ঠা জাগরিত করিয়া পরম সুহৃদের কার্য্য করেন বলিয়া। পিতা-মাতার কামজ ও কোপজ দোষ যদি না থাকে, কিংবা বালকের অন্য অভিভাবক বা শিক্ষাগুরুর এরূপ কোন দোষ না থাকে, তাহারই পক্ষে বালকের উপদেষ্টা বা নিয়ামক হওয়া উচিত। নচেৎ আদর্শ অভাবে সুফল ফলিবে না। যেমন, সাঁতার না জানিয়া ডুবিয়া যাওয়া ব্যক্তিকে গভীর জল হইতে উঠাইতে যাইলে দুই জনেরই ডুবিয়া যাওয়া সম্ভব, ইহাতেও তদনুরূপ ঘটিবে।

আমাদের কি পার্থিব জীবনে, কি পারলৌকিক জীবনে, অন্তঃকরণ সঙ্গের সাথী। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সংস্কার বা অনুস্মৃতি পরজন্মেও হেতুরূপে পুনশ্চ অবিদ্যালীলায় আবির্ভাব হইবেই। অতএব যেরূপ সংস্কার দেখা দিবে সেই প্রকার শোধন করিয়া বাল্যজীবন গড়িতে পারিলে, বালকের উত্তর জীবন উন্নত হয়। সেই বংশের ক্রমোন্নতি ঘটিয়া থাকে।

যাঁহারা পার্থিব জীবনে দয়া, ক্ষমা ও সেবা লইয়া থাকেন পারলৌকিক জীবন তাঁহাদের কিরূপ

মানব জীবনে দয়া বা করুণাপ্রার্থী বিভিন্নরূপে প্রায় সকলেই। বলিষ্ঠ ও অর্থবানের তুচ্ছ অহমিকা প্রবল হইলে ক্ষমা করা বৃত্তি বাধা পায়। আর নিঃস্বার্থ সেবার অভাবে আত্মতা নষ্ট হয় ও চিত্ত-জড়তা দেখা দিয়া থাকে। যাহারা দয়া, ক্ষমা ও সেবাহীন, তাহারা এই নশ্বর ভৌতিক জগতে চিরস্থায়ী বুদ্ধিতে, পরম সত্যকে ক্রমশঃ হারাইয়া বসেন। ইহা একমাত্র বোধের অভাবের জন্য। আমরা বাসনা তৃপ্তি হেতু যখন প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যে অনন্যচিত্তে ভোগের পথে ধাবমান হই, তখন একে একে অন্তরের সদ্‌বৃত্তিগুলি লোপ পায়; এবং মনের স্বচ্ছন্দতা দূরে সরিয়া যায়। তাহাতে চিত্তের আবিলতার সংবৃদ্ধি ঘটে। তাহার পরিণাম হয়, যেখানে স্থূল জগতের সহিত সম্পর্ক নাই, সেই পরলোকে গিয়া, হীন প্রবৃত্তির জন্য পূর্ণমাত্রায় একরূপ যাতনা ভোগ করিতে থাকার ইচ্ছা ব্যাহত হইলে, স্বার্থসিদ্ধি না হইলে, ভোগীর প্রাণে কি যে যাতনা, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ইহার শতগুণ যন্ত্রণা পরলোকে হয়। স্থূল জগতে ভোগের পরিসমাপ্তি মৃত্যুতে, এবং মৃত্যু অতি সত্য; তাহা যদি অন্তরে দৃঢ়ভাবে একবার বোধের মধ্যে আইসে, তাহা হইলে মানব, দয়া, ক্ষমা ও সেবার অনুবর্ত্তী হন।

এই বিশাল বিশ্বে নিজের বলিতে কিছুই নাই। মাত্র উত্তম প্রাক্তন কর্ম্মের সমৃদ্ধিলাভজনিত যে বিষয় সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা স্বল্প দিনের; আমরা সংরক্ষকমাত্র। এই বিশ্ব করুণা-ময়ের অপূর্ব্ব রচনা বিন্যাস। তাঁহার অপার সান্দ্র করুণায় সকলেই নিরাপদ। তিনি 'মৃত্যু' দিয়া অধিকার ভ্রষ্ট করিয়া প্রমাদ হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন; কিন্তু বিবেক কয়জনের জাগে! অধিকাংশ মানব নিজ নিজ কর্ম্মদোষে জন্মান্তরের ক্লেশ ভোগ

করিতেই থাকে। এ সকল যে ঘটিয়া থাকে কেবল চৈতন্য জ্ঞানের অভাববশতঃ। সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যখন মরণান্তে এই স্থূল পৃথিবীর সহিত কোন সম্পর্কই থাকে না, তখন সুখের জন্য যতই কৃপণভাবে বাহিরের বিনাশী নশ্বর বস্তু সঞ্চয় করি, আর যতই ভোগার্হ সামগ্রী পুঞ্জিত করি না কেন, সকলই নিরর্থক, বৃথা। নিষ্ফল সংসারমুখী কৃচ্ছ্র সাধনের অন্তে, বহুব্যক্তি নিরানন্দ ও বাসনা লইয়াই পরলোকে বিদায় হইয়া যান। জীবনে এ কি উৎকট মূঢ়তা! কি দারুণ ভ্রম! তদপেক্ষা অর্থের ও সামর্থ্যের সদ্‌ব্যবহার করিয়া, আনন্দের সহিত ত্যাগের পুষ্পমাল্য গলায় লইয়া, মৃত্যুকে বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করাই কি শ্রেয় নয়? যাহাদের অন্তর কঠোর, করুণাহীন, অহঙ্কারী ও সম্পদপ্রিয়, মৃত্যু তাহাদের ভয়ঙ্কর মনে হয়।

লালসাশূন্য ত্যাগী ব্যক্তিই দয়া, ক্ষমা ও সেবায় প্রশস্তমনা; তিনি সুখ ও আনন্দ পান। এবং এই আনন্দ একবার চিত্তে জমিয়া যাইলে, পরলোকে আত্মিক জীবনে এই সৎকর্ম্মের শুভ ফল, সঙ্গের সাথী হইয়া আনন্দ দিয়া থাকে। ভোগার্ত্ত ব্যক্তির পরলোকে আনন্দ লাভ করা সহজ কথা নয়। ত্যাগের ভিতর দিয়া সেবা করিলে আনন্দ অতি সহজে লাভ করা যায়। দয়া, ক্ষমা ও সেবার সহিত ত্যাগ অভিন্নভাবে জড়িত। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। ত্যাগী হইবার জন্য সন্ন্যাস লইতে হয় না; প্রথমে নশ্বর সংসার জীবনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা ও যত্ন লইলেই, যথেষ্ট ফললাভ করা যায়। ভোগ্য বস্তু সম্মুখে রাখিয়াই ত্যাগী হইতে হয়, সংসারই তাহার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

বিচার ও যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, সংসারই আত্মোন্নতির উত্তম আশ্রয় ও সহায়ক। অন্নময় কোষের সংরক্ষণ, সংসারই তার সাধন। ত্যাগী, বৈরাগী, সাধু, সন্ন্যাসী দেহ রক্ষার জন্য সংসারেরই নিকট প্রতিগ্রহ বা ভিক্ষা করিয়া থাকেন। সেই সংসারে থাকিয়া যদি আমরা দীন দুঃখীর প্রতি, অন্তরের প্রীতি ভালবাসা লইয়া, সংসার-জীবন অতিবাহিত করি, সেই সেবা ও দয়ার পরিণাম অতি

মধুময়। কারণ মরণের পরে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতে স্থূল দেহের বিনাশ হয় মাত্র। জীবিত অবস্থায় যেরূপ স্বভাব ও বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে, আত্মিক-জীবনে তাহার কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং পাপ আর পুণ্য বলিয়া যে কথা আছে, তাহার ভোগ পরকালে ভোগদেহে হইয়া থাকে। উত্তম কর্ম্মে ও ব্যবহারে আমরা ইহ জীবনে শান্তি ও পরলোকে স্বস্তি পাইয়া থাকি। উচ্চ অন্তঃকরণের বৃত্তি হই-তেছে, জগতের নশ্বরতা অনুভব, স্পৃহাহীনতা ও দয়া, ক্ষমা এবং সেবা।

এই জগতে যাঁহারা নিরাকাঙ্ক্ষ, প্রেমের পথে যাত্রা করিতে চান, এবং নিষ্কামভাবে জীবনের কূলে গিয়া পৌঁছাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের আদর্শ ও লক্ষ্য হইবে শুদ্ধপ্রেম এবং সদ্ব্যবহার। নচেৎ জীবনের অশুভদায়ক প্রতিকূল ক্রিয়ায়, স্বার্থের সামান্য ব্যাঘাতে কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়া, ঘৃণিত তমোগুণী ব্যক্তি, গুরুজন, স্ত্রী, সন্তান, পরিচারক প্রভৃতির উপর কঠোর শাসন করেন, অপ্রিয় কটূক্তি প্রয়োগ করেন, নিজ ভোগ বিলাসের সামান্য ত্রুটিতে রুক্ষ ও কুপিত হইয়া মারপিঠ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, সেই সকল ভোগী বিচারশক্তিহীন জঘন্য অভব্য মানব প্রকৃত সংসার-মাহাত্ম্য বুঝেন না। মোহবশে মানবীয় প্রকৃতি যাহাদের পশুভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের ভোগদেহের পরিণাম পথও দুঃখময়। যাহাদের ভোগস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী, করুণাহীন জীবন, তাহাদের জন্য পরপারে ভূবর্লোক বলিয়া যে অন্ধকারময় স্থান আছে যথায় দুরিতকারিগণ পরিত্রাহি যন্ত্রণায় অধীর হন, কুটিল চিত্তগণ অনুশোচনা করেন, তথায় তাহার ব্যবস্থা কেবল শিক্ষার জন্য। ইহা পরমপিতার পতিত উদ্ধারের অপার অনুকম্পার আশ্চর্য্য কৌশল। নচেৎ দয়াময় দয়া না করিলে, মনুষ্য জন্মের যথার্থ সার্থকতা নষ্ট হইয়া যাইত, অন্তরে বিরাগ আসিত না।

জন্ম, মৃত্যু, জরা বড়ই ক্লেশদায়ক। আমরা ধনবান্ হই, মধ্য-বিত্ত হই, অথবা দরিদ্র হই সকলের জীবনেই এই ক্লেশ প্রায় সমান-ভাবে দেখা দিবে। সুতরাং এই বিশ্বের মানব জীবনকে বৃথা ব্যর্থ

না করিয়া আত্মোন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। তন্নিমিত্ত যিনি উপাসক, আত্মানুসন্ধানী, তিনি জীবনের শেষে অনুশোচনা করেন না, অবিদ্যাবন্ধনে প্রতারিত হন না। সংসারে অহঙ্কার লইয়া মোহমদে মত্ত হন না। বাসনা-বিরহিত মন যদি সত্য-নিরত হয়, তাহাতে পরম কল্যাণলাভ হইয়া থাকে। তৎসহ দয়া, ক্ষমা ও সেবা ভাব জীবনকে আরও উন্নত করিয়া থাকে। যাঁহারা আদর্শ পুরুষ তাঁহাদের ভিতর সৎগুণ সম্যকভাবে বিকাশ পায়। দয়া, ক্ষমা ও সেবার শত্রু 'দ্বেষ'। যাঁহাদের ভিতর ছোট বড় মানাভিমান বা মনোবিকার নাই তাঁহাদের এই দ্বেষভাবও থাকে না; সেই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিতর সংবিৎ শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেকে চিরসুখী হইয়াও দুঃখীর দুঃখ অন্তরের সহিত বুঝিতে ও অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। ইহাদের সৎমনোবৃত্তি আপনা হইতে জাগিয়া উঠে ও অনুকম্পা দেখা দিয়া থাকে। দ্বেষই সংসার বন্ধনের কারণ ও মোক্ষ পথের বিঘ্ন। ইহ-পরলোকে এই দ্বেষভাব অত্যন্ত দুঃখদায়ক। তজ্জন্য শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন :—

দ্বেষমূলো মনস্তাপো দ্বেষঃ সংসার বন্ধনঃ।
মোক্ষ বিঘ্নকরো দ্বেষস্তং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

ভগবতী গীতা ২।১৬

'দ্বেষ হইতে মনস্তাপ, দ্বেষই সংসার বন্ধনের কারণ, এবং এই দ্বেষ মোক্ষ-পথের বিঘ্নদায়ক, সুতরাং এই দ্বেষকে যত্নের সহিত পরিবর্জ্জন করিবে।'

অতএব দ্বেষ পরিত্যাগ করিলেই, দয়া, ক্ষমা ও সেবা ভাবের উদয় হইবে। তাহাতে প্রত্যুপকার পাইবার আশা না করিলে অর্থাৎ বাসনা-বিহীন অবস্থা লাভ ঘটিলে, মন সত্য নিরত হইয়া থাকে। সেই সত্য-নিরত ব্যক্তি পুণ্য জীবন লইয়া মুক্তিপথের যাত্রী হন; তাঁহারাই পরলোকে স্বস্তি ও শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

পার্থিব উত্তম জীবনের অনুসরণ পরলোকে শান্তি লাভের উপায় কি না

উত্তম জীবন কাহাকে বলে ? কর্ম্ম প্রবৃত্তি কিরূপ হওয়া উচিত ? এমন কি কর্ম্ম আছে যাহা ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধন করিবে ?

মানব জীবনে ইহাই বিশেষ ও প্রধান প্রশ্ন। ইহার উত্তর গীতায় পাওয়া যায়। কর্ম্মক্ষয় হেতু নিষ্কাম কর্ম্ম, পরোপকার, আত্মনিগ্রহ ও ঈশ্বরচিন্তন। তত্ত্ব কথা এই, চারিটি সৎকর্ম্ম উত্তম প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইলে, মনোমধ্যে জগতের সহিত বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে ও জীব জগতের সহিত রাসায়নিক আকর্ষণ বা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইহাতে জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় অবস্থার সামঞ্জস্য সাধিত হয়। ইহলোক 'জ্ঞেয়, স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য; কিন্তু পরলোক মনাদি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য; তজ্জন্য অজ্ঞেয় বলা হইল। সাধনার দ্বারা ইহার অনুভূতি হয়।

বিষয়টি উচ্চ জীবন লাভের চর্চ্চায় নিবদ্ধ। ইহা স্বয়ং বুঝিবার বিষয়, সুতরাং ব্যক্তিগত। সমষ্টিগতভাবে বা দলগত ভাবে হৈ চৈ এর মধ্যে বুঝিবার বিষয় নয়। তজ্জন্য উচ্চস্তরের ব্যক্তি বা তথাকথিত সভ্য সমাজ মধ্যে যাঁহারা অনুসন্ধানী, অনুরত ব্যক্তি, তাঁহারই আলোচ্য বিষয় হইবে। নিম্নস্তরের মননহীন মানবের মধ্যে একটা তাচ্ছিল্য ভাব বর্ত্তমান। ইহারা লোভ, সম্ভোগ বাসনা, অর্থস্পৃহা ও নাস্তিকতায় ভরপুর। তাহাদের মধ্যে পরলোক তত্ত্বানুসন্ধানী অতি বিরল। যেন অননুকূল শব্দ, পরলোকের সদ্গতির কথা; স্নেহশূন্য 'বিবেকের কথায় চমকে উঠেন; যথার্থ সত্য চিন্তার সার্থকতা বুঝার কোন স্পৃহা সে সব লোকের থাকে না। ক্রমে জীবনাবর্ত্তে তাহাদের যোগ্যতা আসিলে তখন এই মানসিক জড়তা ও সংশয় ভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইবে এবং উচ্চ জীবনাদর্শের কথা গ্রহণ ও চিন্তন করিতে সমর্থ

হইবে। অর্থাৎ বহু জন্মের পর, মনের বিকল্প ভাব দূর হইয়া অন্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া থাকে। তৎকালে নাস্তিকতা শিথিল হইয়া যায়।

মানুষের ভিতর বহুবিধ প্রবৃত্তির পরিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু উচ্চ জীবন লাভের আশ্রয়, বলিষ্ঠ সৎ প্রবৃত্তির অনুকূল গতি এবং ভগবানে একনিষ্ঠ বিশ্বাস; ইহাই প্রকৃত মানব জীবন। আর শিশ্নোদর পরায়ণ, মদান্ধ, বিবেকহীন, প্রপঞ্চমুখী প্রতিকূল গতিতে, ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ ক্লেশ সৃষ্টি করে বলিয়া, হীন প্রবৃত্তি ও পশুভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। দার্শনিক দৃষ্টিতে যদিও মনোজ সুখ দুঃখের অস্তিত্ব মায়া প্রসূত কাল্পনিক জড়ের খেলামাত্র, তথাপি কর্ম্ম বিপাক ব্যবহারিক গণ্ডীর মধ্যে উপভোগ করিতে হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ জ্ঞানার্জ্জনী প্রবৃত্তির সাধনায় সংস্কারবিচ্যুত হইয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হইলে, এবং ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তি দেখা দিলে, মায়া গণ্ডীর বাহিরে পৌঁছায়। তৎকালে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ সম্যকভাবে দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহলোকে সেই উত্তম জীবন লাভ করিতে পারিলে, চিত্তের অব্যবস্থিত ভাব তিরোহিত হইয়া, পরলোকে যাইলে প্রশান্ত অন্তঃকরণজনিত অপার শান্তিলাভ ঘটে। পরলোকের বিধি ব্যবস্থা তাহার সূক্ষ্ম আঘাত জীবনকে ব্যথিত করিতে পারে না। পার্থিব উত্তম জীবনের সাহায্যে পরকালে সুখ শান্তি লাভ করিতে হইলে কি কি প্রকৃষ্ট পন্থা অনুসরণ করা শ্রেয়? এই প্রশ্ন যখন অন্তরে উঠিবে তখন গীতার ন্যায় উপনিষদের সাহায্যে শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা জীবনের গন্তব্য পথ সর্ব্বতোভাবে জানিয়া, বিশ্বাসের সহিত স্থিরীকৃত করিতে পারিলে, এবং তাহাতে সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে ঠিকপথে চলা যায়। সেই চলার পথে ক্লান্ত না হইয়া পড়ি, পথভ্রষ্ট না হই, তজ্জন্য সদ্‌গুরুর আবশ্যক হইয়া থাকে।

যাঁহারা পার্থিব উত্তম জীবন গঠনে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সহায়ক হইবে সাধনার অঙ্গস্বরূপ, বিবেক পরিশুদ্ধ নিষ্কাম কর্ম্ম, পরোপকার, আত্মনিগ্রহ ও ঈশ্বর উপাসনা।

বিবেক,—অর্থাৎ অনিত্য সংসারে ঔদাস্য বোধে, ভাল মন্দ বিচার করিয়া মনের সদাচার-দিকে যে, স্বাভাবিক গতিশক্তি তাহাই 'বিবেক'। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধির পরিণতি ঠিকভাবে আইসে না। আত্মনিগ্রহ ও ঈশ্বর উপাসনায় সম্বন্ধ রাখিয়া সৎ ও অসৎ চিন্তার বিচার করিতে শিখিলে বিবেক বুদ্ধির পরিপক্কতা উদয় হয়। আর নিষ্কাম কর্ম্ম ও পরোপকার তাহার পোষক হয়।

নিষ্কাম কর্ম্ম কি? অর্থাৎ কর্ম্মে স্বাধীনতা লাভ, কর্ম্মে বশীভূত না থাকা। সৎকর্ম্মে সুখ, এবং অসৎ কর্ম্মে যাঁহারা অনুতাপ ভোগ করেন তাহারা কর্ম্মের বশীভূত। তজ্জন্য কামনাহীন কর্ম্ম হইতেছে যেখানে ফলাফলের উপর, সুখ দুঃখের উপর, দৃষ্টি না রাখিয়া দোলায়মান মনকে স্থির সাম্য রাখিয়া কর্ম্ম করা হয়। শ্বাস প্রশ্বাস যেরূপ দিবা রাত্র অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতেছে, তাহার কি ফল, তাহা যেমন কেহই চিন্তার মধ্যে আনি না, সেইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্ম করা। মন যদি একবার বুঝিয়া লয় যে, যাহা হইবার তাহাই হইবে, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র—তখনই বুঝিতে হইবে অন্তরে নিষ্কাম কর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে।

পরোপকার,—ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বিপন্নের সেবা, অথবা মোহাবিষ্ট অজ্ঞানী অহঙ্কারীকে, তাহার কল্যাণের জন্য অবিদ্যার খেলা বুঝান, বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে গুরুজনে ভক্তি, বিনয়, সাধুতা অর্থাৎ চরিত্রের দৃঢ়তা, চারুশীলতা প্রভৃতি উপদেশ দেওয়াও পরোপকার। ইহাতে ক্রমানুযায়ী হৃদয়ে দেবভাব, সন্তোষ ও তৃপ্তি উদয় হয়। পরোপকারী অথবা গুরু যদি প্রতিদান প্রতিপত্তির অপেক্ষা করেন তাহা হইলে সেই নিতান্ত অযোগ্য ও অতি অপকৃষ্ট ব্যক্তি, নিজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনেন। প্রকৃত কথা এই, লোভ সম্বরণ করিয়া, কাহারও অহিত চিন্তা না করিয়া, সকলের সহিত মৈত্রী ভাব পোষণ করিতে হইবে। অনেকে বলেন পরোপকারে জীবন ও সামর্থ্য

রক্ষা হয় না। যথাশক্তি পরোপকারে সামর্থ্যহীন হইবার আশঙ্কা কোথায়! পরন্তু বিবেচনা করিবার বিষয় এই, জন্ম, জরা, মরণশীল সংসারে জীবন ও সামর্থ্য কতক্ষণ স্থায়ী। অন্যের অভাব মোচনের নামই ত পরোপকার; এই বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলে, তাহা ভালভাবেই বুঝিতে পারা যায়। একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছিঃ—আমাদের যেরূপ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে, উদ্ভিজ্জেরও তদ্রূপ শ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতেছে; আমাদের শ্বাস, তাহাদের প্রশ্বাস এবং আমাদের প্রশ্বাস তাহাদের শ্বাস রূপে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এই নৈসর্গিক নিয়মে পরস্পরের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। নিঃস্বার্থ পরোপকারের ইহাই আদর্শ। ইহাতে জীবন ও সামর্থ্য নষ্ট হয় না। অথবা ইহাতে পুণ্য আছে বলিয়া মনোমধ্যে কোনরূপ প্রসন্নতার বিন্দুমাত্র ভাবনা আইসে না। লাভের মধ্যে হয় পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছন্দতার অনুভব। অতএব ইহলোকে যে গোপন পরোপকারবৃত্তি তাহা পরলোকের স্বচ্ছন্দতার কারণ। যে পরোপকারে অহঙ্কার নাই তাহাতে শান্তি পাওয়া যায়।

আত্মনিগ্রহ—আত্মনিরাকরণ, আত্মমীমাংসা, সংযম বা মনঃসংযম। সংসারী অবস্থায় জীবের আত্মবুদ্ধি থাকে, সেই আত্মবুদ্ধির নাশ হইলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দানুভূতি দেখা দেয়। ইহাকেই জীবনমুক্তি বলে। আত্মনিগ্রহের দ্বারাই সেই জীবন মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। আত্মনিগ্রহ সাধনে সাতটি মনোভাবের উন্নতি সাধন করিতে হয়। যথা শৌচ, সন্তোষ, স্বাধ্যায় প্রত্যাহার, অহিংসা, স্তেয় ও তপস্যা।

শৌচ—শুদ্ধ পবিত্র ভাব দ্বারা অন্তর শৌচ হয়। বাহ্য শৌচ প্রায় সকলেরই জানা আছে।

সন্তোষ—যদৃচ্ছা লব্ধতে যে তুষ্টি তাহাই সন্তোষ। এই সন্তোষ সর্ব্ব সুখের কারণ। শ্রীমদ্‌গীতাসারে উল্লেখ আছে যে, "যদৃচ্ছা লাভতস্তুষ্টিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণম্।"

স্বাধ্যায়—যাঁহারা সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত, দর্শন, গীতা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন, এবং ওঙ্করাদি মন্ত্র জপ করেন, বুধগণ তাহাকে স্বাধ্যায় বলিয়া থাকেন।

প্রত্যাহার—অসৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সৎবিষয়ে পরিচালিত করিয়া শেষে ইন্দ্রিয় নিরোধের নাম প্রত্যাহার।

অহিংসা—কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভূতে যে, হিংসার অনিষ্ট সাধন প্রবৃত্তির যে নিবৃত্তি, তাহাকেই অহিংসা বলে। এই অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আত্মপ্রসাদ লাভের সুখজনক উত্তম পন্থা।

স্তেয়—ইন্দ্রিয়গণ অসদ্বিষয়ে সাধারণতঃ বিচরণ করিয়া থাকে; তাহা অবরোধ না করিয়া, মনের চৌর্য্যবৃত্তিকে, কিংবা অন্যের অমার্জ্জিত বুদ্ধির উপর, বুদ্ধি চালনা করিয়া পরদ্রব্য অপহরণ বৃত্তিকে 'স্তেয়' বলে।

তপস্যা—বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনের, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের গতিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, একাগ্রতা আনয়নকেই পরম তপস্যা বলে। এইরূপ তপস্বী পরলোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।

ঈশ্বর চিন্তন,—এই ঈশ্বর চিন্তন সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে যে—

স্তুতি স্মরণ পূজাদি বাঙ্‌মনঃ কায় কর্ম্মভিঃ।
নিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বর চিন্তনম্॥

'স্তব স্তুতি নামস্মরণ, পূজাদি এবং কায়মনোবাক্যে ও কর্ম্মে যে হরিতে অচলা ভক্তি তাহাকেই ঈশ্বর চিন্তন বলে।'

ইহাই সাধনার প্রথম অবস্থা। এই ঈশ্বর চিন্তনের অবস্থা তিন প্রকার, অযোগ্যাবস্থা, যোগ্যাবস্থা ও প্রকর্ষ অবস্থা।

অযোগ্যাবস্থায়, ভিতরে অননুরাগী থাকিয়া, যথার্থ ঈশ্বর চিন্তার ভান করা। তৎকালে মানব মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এ অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান আইসে না। মায়িক অসত্য বস্তুতে প্রগাঢ় আসক্তি-জনিত অন্তরের যে প্রসন্নতা তাহা উদয় হয় না, তমসাচ্ছন্নই থাকিয়া

যায়। মনের অজ্ঞতা বাড়িতেই থাকে। তখন নিম্নস্তরের মনোবৃত্তির আবেশবশতঃ শঠ, কুটিল, নির্দ্দয়, কুতার্কিক ও উন্মার্গগামী অর্থাৎ কুপথগামী হয়। অচেতঃ ও নাস্তিক ভাব বৃদ্ধি পায়। অন্তিমে সেই বিড়ম্বিত জীবন তাপযুক্ত হয়, এবং তজ্জনিত পরলোকে ভীষণ কষ্ট পাইয়া থাকে। তাহারা কেবল বিপদে পড়িলে ভগবানের নাম করিয়া শ্রদ্ধা দেখায়।

যোগ্যাবস্থা, যাঁহাদের প্রাক্তনের ফলে দেখা দিয়া থাকে, তাঁহাদের অহেতুক ঈশ্বর চিন্তার স্পৃহা জাগে। ঈশ্বর চিন্তনের অপূর্ব্ব শক্তিতে মনের বিকল্পভাব ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যায় এবং অন্তরে উত্তম প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাতে মানব বিনীত, শরণাগত, শ্রদ্ধাযুক্ত বিষয়-বিরক্ত, সাধু, শান্ত, সরল এবং দ্বেষ ও ক্রোধবিহীন হন। তখন ক্রমে ক্রমে, শনৈঃ শনৈঃ অন্তঃকরণে শুদ্ধ ভাব ও সত্য সঙ্কল্প দৃঢ় হইয়া থাকে। তাহার ফলে নির্ম্মমতা আইসে। সেই হেতু পরলোকে শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন।

ঈশ্বর চিন্তন দ্বারা মনের গতি অন্তর্ম্মুখী হইলে, চিন্তাভাব প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বিকল্প অবস্থা দেখা দিলে, তখন সাধক চান বিরতি। যোগের প্রকর্ষ অবস্থা ইহাকেই বলিয়া থাকে। অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিতেছেন :—(গীতা সারগ্রন্থ হইতে)

তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতে নান্তরাত্মানা ॥ ৫৭

‘হে অর্জ্জুন, এইজন্য বলি, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে পাইবার জন্য অর্থাৎ আত্মদর্শন জন্য যোগাবলম্বন কর। যেহেতু যোগিগণ তদ্গত চিত্ত হইয়া অন্তরে আমার জন্য যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সর্ব্বসংকল্পনির্ম্মুক্তঃ পশ্যেদাত্মনমাত্মনি।
নিরালম্বে পদে শূন্যে যত্নেন উপজায়তে ॥ ৫৯

‘অধিক আর কি বলিব, যে ব্যক্তি সকল প্রকার বাসনা হইতে

বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছে তাহার অবলম্বনবিহীন: শূন্য পদে যে তেজ প্রকাশিত হয়, তাহাতে আত্মবস্তুর দর্শন ঘটিয়া থাকে।'

তদগর্ভমভ্যাসেন্নিত্যং ধ্যানমেতদ্ধি যোগিনাম্।
নিরালম্বে পদে প্রাপ্তে চিত্তে বিলয়তাং গতে ॥ ৬০

'অতএব যাহাতে সেই তেজের উদ্গিরণ হয় নিত্যকাল তাহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, ইহাই যোগিগণের ধ্যান, নিরালম্ব পদপ্রাপ্ত হইলে চিত্তের বিলীন দশা ঘটিয়া থাকে।'

নিবর্ত্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ যস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।
শিলমৃদ্দারুরচিতা দেবতা বুদ্ধিকল্পিতা ॥ ৬১

'তখন পরাবর ব্রহ্মবস্তু দৃষ্ট হয়, সুতরাং জীবের সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অধিক আর কি বলিব বুদ্ধিকল্পিত শিলা মৃত্তিকা বা কাষ্ঠনির্ম্মিত দেবতায় আস্থা থাকে না।'

অকল্পিতং স্বয়ং জ্যোতিরাত্মনো দেবতা ন কিম্।
দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ ॥ ৬২

'বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে অকল্পিত জ্যোতিঃ আত্মা হইতে সমুদ্ভূত হয় তাহা কি দেবতা না হইবার কথা? যথার্থ জ্ঞান ঘটিলে দেহীর দেহই দেবালয় এবং জীব সদাশিব দেবতুল্য হয়।'

ত্যজেদ্জ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ ॥ ৬৩

'সেই দেবতা অর্চ্চনা করিতে হইলে অজ্ঞান নির্ম্মাল্য অর্থাৎ দেবতার প্রসাদ বা অনুগ্রহ পরিত্যাগ ও সোঽহংভাবে পূজা করিতে হয়।' (প্রণবতার মন্ত্র)

স্নানং মনোমল ত্যাগ শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
অভেদ দর্শনং ধ্যানং জ্ঞানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ৬৫

'যে ব্যক্তি মনের মালিন্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন তাঁহার তাহাই স্নান, ইন্দ্রিয়সংযমই শৌচ, অভেদ দর্শনই ধ্যান, এবং বিষয়-বাসনা বিহীন অন্তঃকরণই জ্ঞান বলিয়া গণ্য হয়।'

অক্রিয়ৈব পরা পূজা মৌনমেব পরো জপঃ।
অচিন্তৈব পরো যোগ অনিচ্ছৈব পরং সুখম্ ॥ ৬৬

'ক্রিয়া-শূন্যতাই জীবের পরম পূজা, মৌনাবলম্বনই প্রধান জপ, চিন্তাবিহীনতাই উৎকৃষ্ট যোগ, এবং ইচ্ছার অভাবই প্রকৃত সুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।'

নাস্তি শান্তি পরো মন্ত্রো ন দেবশ্চাত্মন পরঃ।
নানুসন্ধেঃ পরা পূজা ন তু তৃপ্তেঃ পরং ফলম্ ॥ ৬৭

'ওঁ সচ্চিদেবং ব্রহ্ম' অপেক্ষা আর মন্ত্র নাই, আত্মা ব্যতিরেকে আর প্রধান দেবতা নাই, অনুসন্ধান অপেক্ষা পূজা আর নাই, এবং তৃপ্তি অপেক্ষা প্রকৃত ফল আর দেখা যায় না।'

ঈশ্বর চিন্তনের পরিণত অবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়। বিশ্ব-ভূমায় পরম প্রীতি দেখা দিয়া থাকে। সন্তোষ বা তৃপ্তিতে অন্তর ভরিয়া যায়। এক অপূর্ব্ব শান্তি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা যথার্থ সাধনপন্থী, যে আত্মচর্চ্চায় ভেল নাই, তাঁহারাই সন্তোষ ও তৃপ্তিজনিত উত্তম অবস্থা লাভ করিয়া পরলোকে শান্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। সুতরাং উত্তম জীবনই পরলোকে শান্তির কারণ।

ফলতঃ উপরিউক্ত বিষয়টির পরিপাক এই, রিক্ত মানবই মুক্তি পায়। জ্ঞানকৃত সাত্ত্বিক উপাসনাই মৃত্যুকালে পরম কল্যাণ আনিয়া থাকে; আর অজ্ঞানকৃত উপাসনা বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তাহাতে জীবনের যৎসামান্য উন্নতি ঘটে মাত্র। জ্ঞানকৃত উপাসনা এই যে, আত্মা পরিব্যাপ্ত ভাবে আছেন, তিনি নিষ্ক্রিয় ও স্থির এবং গুণাতীত; সুতরাং নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, মনকে নিষ্ক্রিয় ও স্থির করিতে হইবে। আর যাঁহারা অহংভাবযুক্ত, কামনা জড়িত বহুবিধ পাপ ও পুণ্যের সংস্কার লইয়া, বহুপ্রকার স্তবস্তুতি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক চঞ্চল মনের দ্বারা পৃথক পৃথক রূপের উপাসনা করেন, তাঁহারা অজ্ঞানকৃত আরাধনা করিয়া থাকেন। শেষে কর্ম্মভোগ হয় তাঁহাদেরই।

অবিশ্বাস মানবের পতন আনিয়া থাকে

যাঁহারা সম্পূর্ণ জড়বাদী, তাঁহারা প্রত্যক্ষ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম অধ্যাত্মতত্ত্বের বোধ যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই সাধারণতঃ কুতর্কী ও অবিশ্বাসী হন। অধ্যাত্মতত্ত্বে উদাসীন, ঐহিক সুখ বিলাসীগণের উক্তিতে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মবস্তু সম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। অধ্যাত্ম পদার্থ সূক্ষ্ম, সুতরাং ইহা মানবেন্দ্রিয়ের বোধ্য না হইতে পারে, কিন্তু মানব জ্ঞানের অতীত বিষয় নহে। চিত্তজড়তা ও ব্যসনাসক্ত মন আমাদের জ্ঞানের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে ও অবিশ্বাস আনিয়া সংশয়াপন্ন করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যেকে যন্ত্রবিশেষ ; অনুভব করে মন। মন অধ্যাত্মবিদ্যায় পুষ্ট না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভে অসমর্থ থাকে। তখন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি মনের সারথ্য করিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়। তৎকালে সন্দিগ্ধতা ও অবিশ্বাস প্রগাঢ় হইয়া সূক্ষ্ম সত্তা উপলব্ধিতে বিঘ্ন আনিয়া দেয়। পরলোকতত্ত্বই আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের প্রথম স্তর। যাঁহারা জড়বাদী তাঁহারা শিক্ষিত হইলেও উঁহাদের চিন্তার পথ ভিন্ন। তাঁহারা স্থূল বহির্ম্মুখী প্রকৃতির অনুসন্ধানী। সুতরাং অধ্যাত্ম পথের যাত্রী না হওয়ায়, ভিন্ন পথে চলার জন্য পথ প্রদর্শন বা পথের পরিণাম, এবং বিপত্তি ঠিকভাবে বলা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিংবা অধ্যাত্ম বিষয়ে অন্বেষণের অভাববশতঃ যুক্তি তর্কে নাস্তিক্যভাব দেখা দিতেও পারে। এই নাস্তিকতায় অর্থাৎ ঈশ্বর ও পরলোক অবিশ্বাস মানবের পতনের কারণ।

অতীন্দ্রিয় পদার্থের চর্চ্চায় প্রথমতঃ অধ্যাত্ম শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিয়া অনুমান সিদ্ধ বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। অভ্যাস, বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা থাকিলে পরিণামে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুভূতি হয়। সকল বিষয়েই মানব অবিশ্বাসী নহে ; কেবল লক্ষ্যের অভাববশতঃ বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, মনের গতি চঞ্চল স্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলে,

সূক্ষ্ম বিষয়ে অবিশ্বাস আসে। সুতরাং চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া জীবনের পরম উদ্দেশ্যের সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিলেই তত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এই বিশ্বে শব্দগুণাশ্রয়ী আকাশ ও বিধ্বংসী কাল ভৌতিক পদার্থ হইলেও অতি সূক্ষ্মতম পদার্থ; ইহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমেই বিশ্বাসের সহিত চিন্তা করিতে হইবে যে, নিয়তি বা কালের ঘাত-প্রতিঘাতে শিশু হইতে বৃদ্ধাবস্থা কি প্রকারে আসে? কলুষতা শূন্য আকাশের মধ্যে শব্দ কি করিয়া চলে? এই বিশাল আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইল কি করিয়া? অন্তরে এ প্রশ্ন উঠিলে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু তত্ত্বজ্ঞ গুরুর কৃপায় ইহার যথাযোগ্য উত্তর পাইলে এবং তাহাতে বিশ্বাস জন্মিলে তবেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি আকাশ ও কালের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পরমাণুতত্ত্ব বিরাজমান তাহাই যে ঈশ্বর তাহা তিনি প্রত্যয়ের সহিত চিন্তা করেন।

আমাদের পঞ্চীকৃত স্থূল শরীর ও অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম শরীর, ভৌতিক পদার্থ। তন্মধ্যে অতি সূক্ষ্ম জীবাত্মা স্নিগ্ধ জ্যোতিরূপে বহুকোষের কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, নাভির ঊর্দ্ধে কণ্ঠের অধঃস্থানে প্রাণবায়ু অবস্থিত। এই প্রাণবায়ুর সঞ্চার-স্থানে নালযুক্ত পদ্মকোষের ন্যায় হৃদয় পুণ্ডরীক। সেই অধোমুখী পুণ্ডরীকের উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহাকে দহরাকাশ বলে; তন্মধ্যে জীব অবস্থান করেন। অতি সূক্ষ্ম পরমাণুসদৃশ জীবের স্বরূপ। ইহার কিরণমালা শিরঃ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত অপঞ্চী-কৃত সূক্ষ্ম দেহটি সমব্যাপ্ত। এবং অপঞ্চীকৃত শরীর, পঞ্চীকৃত দেহ দ্বারা পরিবৃত। যথা, শাস্ত্রের প্রমাণ:—

আনখাগ্রং ব্যাপ্য দেহং তদ্ব্রুবেহবহিতঃ শৃণু।
সোঽহয়ং তদভিমানেন মাংসপিণ্ডো বিরাজতে॥

অঃ ১০।২৩ শিবগীতা।

'জীব এই স্থূল দেহের মস্তক হইতে পদ-নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটি সমব্যাপ্ত করিয়া হৃদয় দেশে অবস্থান করেন, এই দেহ মাংস-পিণ্ড ভৌতিক পদার্থ হইয়াও আত্মার সহিত ঐকান্তভাববশতঃ আমিত্বের অভিমান করিয়া থাকে।'

অধোমুখঞ্চ তত্রাস্তি সূক্ষ্মং সুষিরমুত্তমম্।
দহরাকাশামিত্যুক্তং তত্র জীবোঽবতিষ্ঠতে॥

অঃ ১০।২৫ শিবগীতা।

'এই হৃদয় পুণ্ডরীক অধোমুখে অবস্থিত, ইহাতে উত্তম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ইহাকে 'দহরাকাশ' বলে। এই স্থানে জীব অবস্থান করেন।'

বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥

অঃ ১০।২৬ শিবগীতা।

'কেশাগ্রকে শতভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে আবার শত বিভক্ত করিলে যে সূক্ষ্মাংশ হয়, তৎসদৃশ অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম পরমাণু সদৃশ জীবের স্বরূপ জানিবে।'

এই অপ্রত্যক্ষ প্রজ্ঞানসিদ্ধ বিষয়ের উপর বিশ্বাস করিতে পারিলে, যথাকালে আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হওয়া যায়। অবিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিলে স্থূল শরীরের সাহায্যেই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম শরীরের তত্ত্ব সহজেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বিশ্বাস লোপ পাইলে সফল মনোরথ হইবে না; তত্ত্ব মিলিবে না। সেইজন্যই কথায় আছে—'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর'।

বিশ্বাসকে তিনস্তরে ভাগ করা যায়, :—অন্ধবিশ্বাস, দ্বৈধবিশ্বাস ও তত্ত্ববিশ্বাস।

অন্ধবিশ্বাস—অর্থাৎ ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সরল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে কোন মারপ্যাঁচ নাই। ইহা এত তরল বিশ্বাস যে,

অসাধু ব্যক্তি সাধুভাগে ভেল্কি দেখাইয়া তাহাদিগকে অসৎ পথে লইয়া চলেন ও গুরু হইতে পারেন। যথার্থ মানবোদ্দেশ্য ইহাতে নষ্ট হইয়া যায়। এই বিশ্বাসে জীবনের গতি ক্বচিৎ ভালর দিকে গিয়া থাকে। অধিকাংশ সময়ে ভণ্ডের প্রলোভনে মোহিনী বিদ্যায় প্রবঞ্চিত হওয়া সম্ভব।

দ্বৈধবিশ্বাস—মুখে এক মনে আর। যেমন ব্রহ্ম উপাসনার জন্য ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখাইলাম, কিন্তু মনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ; আমার একটি জুয়েলারি দোকান আছে, ধনবান শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতে পারিলে গ্রাহক সংখ্যা বাড়িবে। ঐহিক সুখান্বেষী হইয়া ব্রহ্ম উপাসনার ভান করা। কিংবা কালী, কৃষ্ণ, আত্মা, পরমাত্মা কাহার উপাসনা করা ঠিক, এই দোটানায় পড়া।

তত্ত্ববিশ্বাস—তত্ত্ববিশ্বাসিগণ স্বাধ্যায়িন্ হইয়া প্রকৃত তত্ত্বানুশীলন পুরঃসর সৎ গুরোপদেশে সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া, অবিশ্বাসের লেশমাত্র না থাকিলে যে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে তদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন। সে কিরূপ,—যেরূপ বিচারক তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ প্রমাণ প্রয়োগের পর সত্য নির্ণয় হইলে, তাহাতে বিশ্বাস করিয়া যে রায় দেন, সেইরূপ নিঃসংশয় বিশ্বাস। তত্ত্ববিশ্বাস অর্থাৎ যে বিশ্বাসে নাস্তিকতার ভাব বিন্দুমাত্র নাই।

তত্ত্ববিশ্বাসই প্রকৃত বিশ্বাস। ভগবৎ ভক্তি দ্বারা ঐহিক সুখ লাভের যে চেষ্টা, তাহা প্রকৃতপক্ষে চিত্ত মধ্যে অবিশ্বাসরূপ জীবনের পতনমুখী অযথা বাসনা সংস্কার। ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার ছলনায়, তাহার সম্পূর্ণ আবেশে যথার্থ অধ্যাত্মতত্ত্বে শ্রদ্ধা বিবর্জ্জিত হইয়া, ঐহিক ফলকামনা অবিশ্বাসিগণই করিয়া থাকেন। তাহাদের দুর্ব্বল বোধশক্তি আদৌ বুঝিতে পারে না, এক নিত্য শাশ্বত সত্তা, এই স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে সূক্ষ্মভাবে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। ইহা না বুঝিয়া ঐহিক সুখে অনেকে মাতিয়া থাকেন। ঐহিক সুখ সম্পদে জীবনের শ্রেয় নাই, বিশ্বাসের হেতু নাই, ইহা সাতিশয় ক্ষয়িষ্ণু,

পরিবর্ত্তনশীল ও অল্পস্থায়ী। মৃত্যুর পর যাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না, তাহার উপর অবিশ্বাস করাই কি আমাদের কল্যাণকর নহে! পরন্তু ভোগস্পৃহা অন্যরূপ ঘটাইয়া থাকে। পারত্রিক কল্যাণের মূলে যে, পরমতত্ত্ব নিহিত, তাহাতে অবিশ্বাস আসিলে জীবনের পরিণাম অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয়। ইহাতেই মানবের পতন ও পরলোকের যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং অবিশ্বাস মানবের পতনের কারণ।

মায়া ও অবিদ্যার স্বরূপ

এই সৃষ্টিতে 'পরব্রহ্ম' সমষ্টিভাবে বিশ্বাত্মা এবং ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। পরন্তু পরব্রহ্ম ও জীবাত্মা একই বস্তু; অবস্থা ও উপাধি দেখিয়া মনে হয় দুইটি। সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা, ব্যষ্টিগত শরীরে থাকিয়াও তাঁহার আনন্দরসের আভাসমাত্র অনুভূত হয়। সেই পূর্ণানন্দের উপলব্ধিতে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় তাহার কারণ কি? প্রতিবন্ধকের হেতু অনাদি অনির্ব্বচনীয় মায়া ও অবিদ্যা। এই মায়া ও অবিদ্যার প্রকৃতিগত স্বরূপ কি? সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের উপর স্বতঃপ্রবৃত্ত পরিবৃত অণুবিম্ব অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছায়া বিশিষ্ট সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের সূক্ষ্ম অবস্থাকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে। এই প্রকৃতির দুইটি স্তর, প্রথম মায়া ও দ্বিতীয় অবিদ্যা। মায়া ও অবিদ্যার প্রভেদ এই, চিৎতত্ত্বের প্রথম পরিবেষ্টন-রূপ যে অনুবিম্ব তাহাই অতি সূক্ষ্ম শুদ্ধ সত্ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট 'মায়া'। মায়া উপহিত হইয়া 'পরব্রহ্ম' সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তদুপরি সূক্ষ্ম কোষের কয়েকটি স্তর পরিবৃত সগুণ প্রতিচ্ছায়া যুক্ত অবিদ্যা। ইহার মালিন্য প্রযুক্ত, 'চৈতন্য' অবিদ্যার আয়ত্তাধীন হইয়া 'জীব' শব্দে কথিত হন। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে, প্রথম প্রতিবিম্ব

মায়া উপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং তদুপরি অবিদ্যার উপাধি বিশিষ্ট জীব।

যেখানে মায়া ও অবিদ্যা, সেইখানে অহংভাব বা আমিত্ব থাকিবেই। ঈশ্বরের আমিত্ব ভূমায় অর্থাৎ সমষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আর জীবের যে অহংভাব তাহা অবিদ্যাজনিত ব্যষ্টিগত; এজন্য সর্ব্বজ্ঞতার অভাব থাকিবেই। সাধনার দ্বারা এই ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত অহংভাব বিনষ্ট হইবে অবিদ্যার নাশে। অবিদ্যার নাশ হইলে বিশ্বভূমায় আমিত্ব আসিবে। এবং পরব্রহ্মের উপর যে মায়া অণুবিম্ব আছে, তাহা তিরোহিত বা অতিক্রম করিলে, ভূমার আমিত্বও লোপ পাইবে। তখন থাকিবে মাত্র সোহহং অর্থাৎ মায়া ও অবিদ্যা সংস্পর্শ রহিত নির্গুণ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা অবস্থা। পরমাত্মাতে ধ্যান সম্বন্ধাদি সোহপাধিকত্ব বা লক্ষ্যত্ব যাহা কিছু বলা যায় বা করা যায়; সে সকল অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা অলীক কল্পনামাত্র। বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে কিছুই সম্ভব হয় না। তজ্জন্য মহর্ষি ব্যাসদেব ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন :—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরোর্দূরীকৃত যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্।

ইতি ব্যাস।

ভাবার্থ এই,—যিনি কেবল সচ্চিদানন্দ, রূপবিবর্জ্জিত তাঁহাকে কল্পিত ধ্যানের দ্বারা রূপের মধ্যে লইয়া আসা, স্তুতিতে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া গুণের মধ্যে নির্গুণ পুরুষকে লইয়া আসা, যিনি বিশ্বের অণু পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত তাঁহাকে খণ্ডিত করিয়া তীর্থে তীর্থে ঠাকুর প্রতিষ্ঠার 'মাহাত্ম্য বর্ণনা করা, এই তিন প্রকার বিকল্প দোষ করার জন্য হে পরমেশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।'

যদিও ইহা নিম্নস্তরের, ভ্রম ভ্রান্তি রূপান্তরবোধ বুঝিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তথাপি সংসারমুখী মায়ামুগ্ধ মনকে উন্নত স্তরে উন্নীত করিবার জন্য সাধনার প্রথম অবস্থায় সগুণ পূজাই সহজ পথ। এবং তৎসঙ্গে মায়া ও অবিদ্যার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা থাকিলে বহু অন্তরায় দূরীভূত হয়।

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈব মুপাধী পর জীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥

১।৪৮ পঞ্চদশী।

মর্ম্মার্থ এই, যেমন "সঃ অয়ং দেবদত্ত" সঃ শব্দের অর্থ পূর্ব্বদৃষ্ট দেবদত্ত, অয়ং দৃশ্যমান দেবদত্ত, এই বিরুদ্ধ পূর্ব্বকাল ও বর্ত্তমান কাল বিশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিলে বাক্যের অর্থ হয় কেবল দেবদত্ত। তদ্রূপ 'তৎ, ত্বং, অসি,' এই বাক্যে 'তৎ' শব্দের অর্থ মায়া উপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর, 'ত্বং' অর্থ অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীব; এই মায়া ও অবিদ্যার অংশ ত্যাগ করিলেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম লক্ষিত হয়।' তাঁর নামও নাই, উপাধিও নাই, মাত্র একটা বিশ্বব্যাপী অব্যক্ত সত্তা।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ময়িনন্তু মহেশ্বরম।

৬।১২৩ পঞ্চদশী।

'প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে ও পরমেশ্বরকে মায়া মুক্ত পুরুষরূপে নিশ্চয় করিবে।'

মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, মায়া অন্ধকার স্বরূপ, অর্থাৎ অজ্ঞানবিধায়ক, ইহা তাপনীয়। এই মায়া সর্ব্বপ্রাণীর অনুভব সিদ্ধ সুতরাং অনুভবই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। মায়া অনন্ত বিশ্বব্যাপী, ইহা মোহদায়ক ও বিঘাতক, অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধি যে বস্তুতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ, তাহাকে মোহ বলে। কিন্তু 'মায়া' জ্ঞানদৃষ্টিতে নিত্য-নিবৃত্তহেতু 'তুচ্ছ বস্তু'। মায়া তিন প্রকারে

বোধের মধ্যে আইসে; জ্ঞান দৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তি দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ মায়াতে অনন্যকৃত দুর্ঘট ঘটন স্বভাব স্বতঃসিদ্ধভাবে বর্ত্তমান।

মায়ার স্বরূপ ভাষা দ্বারা নিরূপণ করা বড়ই দুঃসাধ্য কর্ম্ম। মায়ার ঐন্দ্রজালিক মহিমা, অন্তরে ও প্রকাশ্য জগতে দেদীপ্যমান প্রকাশ হইয়া রহিয়াছে। ইহাকেই শাস্ত্রে পরাপ্রকৃতি বলিয়া থাকে। এই প্রকৃতি পরা ও অপরা অর্থাৎ মায়া ও অবিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি শুদ্ধ ভাব, অন্যটি মলিন ভাগ। এই প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষোভ হয়, তখন গুণসমূহ পৃথক পৃথক ও মিশ্রিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশুদ্ধ ভাগকে বিদ্যামায়া এবং মলিন ভাগকে অবিদ্যা মায়া বা অজ্ঞান কহে। এই মলিন স্বপ্নবৎ নশ্বর অথচ চাক্ষুষ বিকারী বস্তুই জীবের যত ভ্রম আপদের কারণ। ইহাতে তত্ত্ববোধ বা জ্ঞান দৃষ্টি লোপ পায়। এই মলিন অবিদ্যার ক্রিয়ায় 'ভ্রম', চিত্তে দেখা দিয়া থাকে, অর্থাৎ পদার্থের রূপান্তর বোধ হয়। যেমন অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখানুভব প্রভৃতি মনোমধ্যে যথার্থ সত্যের নিবিড় দুরবস্থা উপস্থিত হয়। বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি অবিদ্যার ইন্দ্রজালে ফাঁসিলে মুক্তি নাই। বুঝিতেই পারিবে না সংসারের অনিত্যতা, এবং সচ্চিদানন্দের নিত্যতা। তৎকালে আত্মীয় বিয়োগে দারুণ শোকে বিহ্বল হইয়াও প্রকৃষ্ট বিবেক জাগিবে না। পুনরায় অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি লইয়া ভোগ স্পৃহায় পাগল হইয়া ঘুরিবে; অন্ধজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া পুনশ্চ জগতের খেলায় মাতিয়া যাইবে। অবিদ্যাবিষ্ট ব্যক্তির সত্যের প্রকৃত জ্ঞান না থাকায় সর্ব্বাভিসন্ধি হয়, অর্থাৎ সকল বিষয়ে ঠাট্টা করে। যাহাকে বলে সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান, চলিত কথায় 'সবজান্তা'। অবিদ্যা মূঢ়তাকে আনিয়া দেয়। অবিদ্যার লীলা ও স্বরূপ এইরূপ।

অবিদ্যা সূক্ষ্ম চিন্তার বিরোধী। মানব চিত্ত 'তৎ' 'সৎ' অর্থাৎ প্রকৃতি ও ঈশ্বর তত্ত্বে পাছে বিশ্বাস করিয়া ফেলেন, তজ্জন্য অবিদ্যা

মানব মনকে বহুদূরে সরাইয়া রাখে ; জ্ঞানাবরোধ করা তাহার একটি বিশেষ স্বভাব। এমন কি মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম ভৌতিক দেহ যে থাকে তাহাতেও অবিশ্বাস ও সংশয় আনিয়া থাকে। অবিদ্যা মনকে বুঝাইয়া দেয় সে যেন চিরজীবী, এমনই তার অদ্ভুত লীলা। এই দৃশ্যমান পঞ্চীকৃত ভৌতিক খেলায় মানব মুগ্ধ হইয়া যায়। অবিদ্যার যাদুবিদ্যা বা ভেল্কী ধরিতে হইলে অপঞ্চীকৃত ভৌতিক তত্ত্বের গবেষণা বা অন্বেষণ করিতে হইবে ; নচেৎ তাহার ইন্দ্রজাল ধরা পড়িবে না।

চাই অন্তরে পরিপ্রশ্ন বিচারণা অর্থাৎ সংসারমুক্তির জন্য নিত্যানিত্য বস্তুবিচার। মানবকে মুমুক্ষু হইয়া চিন্তা করিতে হইবে, বিন্দু প্রমাণ শুক্রকীটে অবিদ্যার নশ্বর ভৌতিক যাদুমন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, বুদ্ধ, কপিল, ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নেপোলিয়ান, নিউটন, সেক্সপিয়ার রবীন্দ্রনাথের যে সৃষ্টি হইয়াছিল, অনন্ত কালসমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়া তাঁহারা গেলেন কোথায় ! তবে না অবিদ্যার খেলা ধরা পড়িবে। তবে না নশ্বরতা উপলব্ধি হইবে। আমিই বা কয়েক দিনের খেলা সারিয়া যাইব কোথায় ? অবিদ্যার তত্ত্বান্বেষণে এই ভাব লইয়া ভাবিতে হইবে ও চিন্তা করিতে হইবে।

মায়া ও অবিদ্যার স্বরূপ সামান্য ভাবে লিখিবার পর, যদি সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে কিছু লেখা না হয়, নিবন্ধ যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে মনে হয় ; তজ্জন্য সংক্ষেপে কিছু লেখা আবশ্যক।

'চিৎ' স্বরূপ পরমাত্মাকে নির্গুণ পুরুষ বলিয়া উল্লেখ আছে। প্রকৃতি অর্থাৎ 'মায়া' তাঁর শক্তি। ইনি সগুণ হইয়া অবিদ্যা নাম লইলেন কি করিয়া ? শক্তি ও শক্তিমান ত পৃথক হইতে পারে না। সুতরাং চিৎস্বরূপ পরমজ্যোতি পরমাত্মায় আদিতে কারণরূপে অবিভক্ত 'গুণ' ছিল ; কিন্তু তাহা স্তিমিত গম্ভীর নিষ্কম্প স্থির সাম্য ভাবে। সেই স্থির মহাজ্যোতি পুরুষ হইতে তাঁহার কিরণরূপ ভৌতিক সত্তার মূল বীজ মায়াতে উপনিহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্ব, রজ, তমো-গুণের পৃথক পৃথক বিলোল ক্রিয়ায় অনুচ্ছায়া আরম্ভ হয়, আসলে

তখন ঐ গুণের সাম্যাবস্থা। সেই বীজ মধ্যে সৃষ্টির অঙ্কুর শক্তি নিহিত থাকায়, তাহা বিস্ফুরিত হইলে বিলোল ক্রিয়ার তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়; এবং তৎসঙ্গে গুণ সকলের ব্যতিক্রম ঘটায়, 'চিৎ'-এর উপর এক প্রকার ছায়া উদ্গত হইয়া অচিন্তনীয় আবরণ যখন আসিল, তখন আর সত্ত্ব, রজ, তমের সাম্যাবস্থা নাই। তখন সত্ত্ব, রজ, তমের প্রতিযোগী ভাবের প্রবল সঙ্ঘাতে ও তুঙ্গ কম্পন ক্রিয়ায় সৃষ্টির বিকাশ আরম্ভ হইল। ইহাকেই বলিয়া থাকে 'চিৎজড়গ্রন্থি', প্রকৃতির অবিদ্যাবস্থা। এই অবিদ্যাবস্থাতে গুণের সংমিশ্রণ ও দ্বন্দ্ব ক্রিয়ায় সত্ত্ব, সত্ত্ব—রজ, রজ, রজ—তম, ও তম ভাবের নৈসর্গিক উত্তেজনায় ও যোগাযোগে সৃষ্টিক্রম আরম্ভ হইল। তখন 'চিৎ', মায়া ও অবিদ্যার আবরণে অর্থাৎ গুণাবরণের মধ্যে ফাঁসিলেন বটে, কিন্তু গুণগুলি মায়া ও অবিদ্যার আকর্ষণে তন্মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়ায় সর্ব্বগত পরমাত্মা এখন নির্গুণ হইয়া কূটস্থ বা উদাসীন সাক্ষিরূপে দিক্ষিত ভাবে অর্থাৎ দ্রষ্টা হইয়া, দৃশ্য দেখার মত রহিলেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

গীতা ৩।২৭

'প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন হয়।' অতএব পুরুষ নিষ্ক্রিয়।

সৃষ্টিক্রম বলিবার পর সামান্য ভাবে মায়া ও অবিদ্যা সম্বন্ধে আরও কিছু স্পষ্টীকরণ হওয়া আবশ্যক। 'চিৎ' স্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তা মায়া মধ্যগত হইয়া অসংখ্যরূপে অনন্ত বিশ্বে প্রকাশ। অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিৎ পরমাণু সংখ্যাতীত অংশে মায়া বৃতির মধ্যে। তজ্জন্য মায়াকে কারণরূপা প্রকৃতি এবং অবিদ্যাকে কার্য্যরূপা প্রকৃতি বলিয়া থাকে। এই কার্য্যরূপা অবিদ্যার শক্তি দুই প্রকার; একটি আবরণ অন্যটি বিক্ষেপ। আবরণ ক্রিয়া দ্বারা আমাদের মন-বুদ্ধি ও পরমেশ্বর, এই দুইয়ের মধ্যপথে আবরণরূপ এক তম গুণের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহাকে শঙ্করাচার্য্য 'বৃতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই অবিদ্যার আবরণ শক্তি। আর বিক্ষেপ শক্তিতে সৃষ্টি ক্রমের দিকে যে পরমাণুর খেলা চলে তাহা ক্রমশঃ কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলের দিকে যাইতে থাকে। অর্থাৎ প্রাতিভাষিক সৃষ্টির উপাদানভূত কার্য্যের নাম বিক্ষেপিকা। এই আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শাম্বরী শক্তিই আমাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিরোধক। সেইজন্য সহজে পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। সর্ব্বদাই লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়া রাখে। আবার বিক্ষেপের মোটামুটি চারিটি কার্য্য ;—'অভাবনা', অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যচিত্ত ; 'বিপরীত ভাবনা,' অর্থাৎ বস্তু একপ্রকার মনোবৃত্তি অন্য প্রকার ; 'সম্ভাবনা', অর্থাৎ উৎকট চিন্তা বা অভিসন্ধি ; 'বিপ্রতিপত্তি' অর্থাৎ অবস্তুকে বস্তুবোধ। প্রকৃতির আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি, গুণের সাম্যাবস্থার লক্ষণ নহে। সুতরাং ইহা যে, অবিদ্যার লীলাখেলা তাহা প্রতিপন্ন করে। পরিণামের সহিত অবিদ্যার নিত্য সম্বন্ধ। প্রকৃতি একটি ক্ষণ ও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া স্থির থাকিতে পারে না। যখনই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তখনই পরিণাম দেখা দিয়াছে। এবং সেই পরিণামের প্রথম অবস্থার নাম হইল 'মহত্তত্ত্ব'।

'মহত্তত্ত্ব' সূক্ষ্ম অব্যক্ত। এর সত্ত্ব ভাবে 'চিদাভাস', রজ ভাবে অস্মি' (অহং) ও প্রবৃত্তি, তম ভাবে অনাদি অখণ্ড পূর্ণ মহাকাল। পূর্ব্বে 'সৎ'-এর প্রথম আবরণ বিদ্যা, এবং অবিদ্যার কথা যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রথম আবরণকে 'হিরণ্ময়' কোষ বলে। তৎপরে 'সৎ'-এর উপর দ্বিতীয় আবরণ মহত্তত্ত্ব' ; ইহাকে আনন্দময় কোষ বলিয়া থাকে। সচ্চিদানন্দের যে চিদাভাস তাহা আনন্দ স্বরূপ। এই মহত্তত্ত্বই অবিদ্যার, যাহু বিদ্যার আদিপর্ব্ব।

মহত্তত্ত্বের বিকারে অহং-এর সূক্ষ্মাবস্থা 'অস্মি' হইতে অহঙ্কার এবং প্রবৃত্তি হইতে চিত্ত ও চিদাভাস হইতে বুদ্ধি, আর মহাকাল হইতে শব্দ তন্মাত্র। ইহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলিয়া থাকে। ইহা 'সৎ'-এর উপর তৃতীয় আবরণ। ইহার অন্য নাম অহঙ্কারতত্ত্ব।

এই অহঙ্কারতত্ব তিন প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হয়, যথা সাত্বিক, রাজস্ ও তামস্। সাত্ত্বিক অহঙ্কার সৃষ্টার্থ বিকার প্রাপ্ত হইলে, মনঃ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। রাজস্ অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে সূক্ষ্মাবস্থার অন্তর্লীন তদাত্মক দ্বিধ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। এবং তামস্ অহঙ্কারের বিকার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মহাকালের পরমাণু ও শব্দ তন্মাত্র সঙ্ঘাত হইয়া এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার সঙ্ঘোষিত করিল। তাহাতে এই মহাবিশ্বের নভান্তরে উঠিল অনাহত ধ্বনি। তখন সৃষ্ট হইল আকাশ। (এই অন্তর্জ্জগতের অনাহত নাদ, কর্ণ কুহরে অঙ্গুলি দিলে অন্তরেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রুতি-গোচর হয়) আকাশ অবলম্বে মনোময় কোষের স্থিতি। ইহা 'সৎ'-এর উপর চতুর্থ আবরণ। জ্ঞানেন্দ্রিয় মনোময় কোষের অন্তরে অবস্থিত এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় মনোময় কোযের বাহিরে প্রাণময় কোষে সংলগ্ন। প্রাণময় কোষ 'সৎ' এর উপর পঞ্চম আবরণ।

শব্দ তন্মাত্রের বিকারে স্পর্শ তন্মাত্র; স্পর্শ তন্মাত্রের বিকারে রূপ তন্মাত্র; রূপ তন্মাত্রের বিকারে রস তন্মাত্র; রস তন্মাত্রের বিকারে গন্ধ তন্মাত্রের উদ্ভব হইল। এই তন্মাত্রের একটা সমবায় পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক তন্মাত্রে তাহার নিজ অসাধারণ গুণ ও সমবায়গুণ বর্ত্তমান।

শব্দ তন্মাত্র রূপান্তরিত হইয়া ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে। এইবার স্পর্শ তন্মাত্র রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া শব্দ ও স্পর্শগুণ লইয়া মরুৎ বা বায়ুর সৃষ্টি হইল। এই বায়ু পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিদেহ বেত্তার সংস্রবে আসিয়া 'প্রাণ' উৎপন্ন করিল। বায়ুরূপী প্রাণ পাঁচ প্রকারের, যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। ইহা ব্যতীত পাঁচটি উপবায়ু, যথা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়; এই পাঁচটির স্থূল কার্য্য যথাক্রমে উদ্গিরণ, উন্মীলন, ক্ষুধা, জৃম্ভন ও পুষ্টি। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহা 'সৎ'-এর উপর পঞ্চম আবরণ। ইহাকে প্রাণময় কোষ বলে। ইহাই লিঙ্গ দেহের অর্থাৎ পরলোকে প্রথম অবস্থানের অপঞ্চীকৃত

শরীর। এই লিঙ্গ দেহে স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। এই ভেদাভেদ জন্মায় পঞ্চীভূত শরীর লাভের পর চিত্তে যে সংস্কার জন্মে সেই সংস্কার বশে পরলোকে স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞান হয় মাত্র।

'চিৎ'-এর উপর হিরণ্ময় কোষ হইতে প্রাণময় কোষ পর্য্যন্ত পাঁচটি আবরণ দিয়া প্রকৃতি যে, সূক্ষ্ম শরীর তৈয়ার করিয়াছেন, ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষৎকার উল্লেখ করিয়াছেন; অন্নময় মধ্যে প্রাণময় তন্মধ্যে মনোময়, তন্মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ তদভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ, ইহাই স্থূল শরীর; অন্নময়কোষ ধ্বংস হইলে, তখন থাকে আমাদের খণ্ড লিঙ্গদেহ। এবং যথাকালে ঐ লিঙ্গদেহই পঞ্চীকৃত শরীরে অন্নময় কোষ মধ্যে আশ্রয় লয়। এবং মৃত্যুর পর পুনরায় অপঞ্চীকৃত শরীর প্রাপ্ত হয়। জীব কর্ম্মসংস্কারে বাধ্য হইয়া স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, আবর্ত্তন ক্রিয়ায় নিস্পৃহ না হওয়ার জন্য দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শাস্ত্রে সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে লিখয়াছেন :—

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যেব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি চতুষ্টয়ম্ ॥
বায়বঃ পঞ্চমিলিতা যান্তি লিঙ্গশরীরতাম্ ॥

১০।১৫।১৬ শিবগীতা।

'পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চতুষ্টয় ও পঞ্চ বায়ু মিলিত হইয়া লিঙ্গ শরীর নামে অভিহিত হয়।'

এইবার পঞ্চীকরণ আরম্ভ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতির মধ্যে। তেজের পঞ্চীকরণে, তেজের অংশ অর্দ্ধেক, আকাশ একের অষ্টমাংশ, মরুৎ একের অষ্টমাংশ, অপ্ একের অষ্টমাংশ, ক্ষিতি একের অষ্টমাংশ, ইহাদের পঞ্চীকরণে 'তেজ'। অপ্, ইহার পঞ্চীকরণে অপ্ অর্দ্ধেক, ও অন্যান্য চারিটি মহাভূতের অংশ দুই আনা করিয়া

অপের উৎপত্তি। ক্ষিতির পঞ্চীকরণে, ক্ষিতি অৰ্দ্ধেক অন্যান্য ভূতের দুই দুই আনা সংমিশ্রণে হইয়া থাকে। ইহা আকাশাদির পঞ্চতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে এই তিনটি স্থূল ভূতের উৎপত্তি। পাঞ্চভৌতিক দেহের উৎক্রান্তি সময়ে, এই তিনটি স্থূল ভূত পৃথক হইয়া যায়। অন্য ভূত সূক্ষ্মে প্রাণবৃত্তি অন্তঃকরণ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পিণ্ডীত হইয়া পরলোক যাত্রা করে। বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে উৎক্রান্তির সার মৰ্ম্ম এই। তৎপরে বেদান্তে লিখা আছে :—

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৪।২।৯ ব্রহ্মসূত্র।

নোপমৰ্দ্দেনাতঃ ॥ ৪।২।১০ ব্রহ্মসূত্র।

'জীব মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোক প্রয়াণ করে, সূক্ষ্ম বলিয়াই অদৃশ্য ও স্থূল বস্তু গতিরোধ করিতে পারে না'।

'সূক্ষ্ম বলিয়াই স্থূল শরীরের উপমৰ্দ্দ বা ধ্বংস, সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না।'

এই বিশাল বিশ্বে, অংশ লিঙ্গ অর্থাৎ চিদাভাস, কাল লিঙ্গ অর্থাৎ পরিণাম বা বিকার, এবং মায়া লিঙ্গ অর্থাৎ বিক্ষেপ ; স্থূল পঞ্চভূতের সহিত বহুপ্রকার সংযোগে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি ও বহু সূর্য্য চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রে রূপকভাবে যে সকল লিখা আছে তাহাতে দেখিতে পাই ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি ও কলার মিথুন-মিলনের দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক আমাদের এই সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

মরীচি হইতে কশ্যপ সমুৎপন্ন। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর সূক্ষ্ম জগতের বীজভূত যে দৃঢ়শক্তি অর্থাৎ প্রকাশরূপ চৈতন্য, তাঁহাকেই কশ্যপ বলে। পুরাণে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্য্যার কথা উল্লেখ আছে। তাহাদের গর্ভে স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ প্রভৃতির সূক্ষ্ম বীজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে হয় ইহা ঠিকই লিখা আছে।

মরীচি অর্থাৎ সূর্য্য কলা অর্থে চন্দ্র, এই সূর্য্য ও চন্দ্রের দ্বারা আমাদের এই মধ্যম লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবের ভোগায়তন স্থূল নরদেহগুলি সৃষ্টির মধ্যে চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া প্রকাশ হইল ; আমরা যে মনে করি, বাহিরে প্রকাশ হইয়াছি বস্তুতঃ তাহা নয়, অবিদ্যার ইন্দ্রজালে আমরা ভিতরেই আছি। তজ্জন্য চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত আমাদের ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর বিশেষ যোগাযোগ বর্ত্তমান।

যেরূপ আমাদের শরীরের ভিতর অসংখ্য কোটি কোষের জীবাণুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ, সেইরূপ পরমাণুর মত আমাদের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ। বিশ্বের প্রচণ্ড গতিতে এই সৃষ্টি, অবিদ্যার কল্পনাতীত অনিত্য ভূয়ঃরাজী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, উপনিষদ, ছান্দোগ্যে ও তৈত্তিরীয়ে যথাক্রমে তেজ ও আকাশ প্রথম সৃষ্টির উল্লেখ থাকায় শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ হইতেছে। এখানে বহু মতের উপর ইহা লেখা হইল।

আমাদের শরীরস্থ জীবাণুর নিকট আমরা যেরূপ বৃহৎ, তদ্রূপ বিশাল বিশ্বের নিকট আমরা অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সূক্ষ্ম পরমাণু কণাবৎ বা কণিকাবৎ। এই জন্য ঋষিরা বলিয়াছেন :— "অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান"।

অবিদ্যা যদিও পরিণামী তথাপি কল্যাণময়ী। জগতের কল্যাণের জন্য,এবং ভুবনকে স্বতঃক্রিয় রাখিবার জন্য,সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কৌশলে অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত কালের নির্ণয় দিবার জন্য, ক্ষণ ও ক্ষয় অর্থাৎ নিয়তির ক্রিয়া দ্বারা প্রত্যক্ষ সৃষ্টির নশ্বরতা প্রতিপন্নের হেতু, সূর্য্য মহানগুলের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সূর্য্যদেব ও চন্দ্র খণ্ডকালের পরিমাপক গ্রহ। কাল দ্বিবিধ, মহাকাল ও খণ্ডকাল। খণ্ডকালের নির্দ্দেশ সূর্য্যদেবের অধীন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে :—

সূর্য্য মরীচিমাদত্তে সর্ব্বস্মাদ ভুবনাদধি।
তস্যাপাক বিশেষেণ স্মৃতং কাল বিশেষণম্ ॥

'সূর্য্যদেব তার মরীচি অর্থাৎ কিরণ দ্বারা ভুবনকে নিরন্তর সন্তপ্ত করিতেছেন, সেই উত্তাপে পক্ক হইয়া জাগতিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে পরিণাম দেখা দিতেছে, তাহাই কালের কারণ।'

সূর্য্যমণ্ডল ভৌতিক পদার্থ; ইহা মহামায়ার বিশাল পরমাণু বিভাজন কেন্দ্র। অবিদ্যা মায়া এই সূর্য্যমণ্ডলকে বিশেষ বিবেচনা দ্বারা, নয়কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে বিন্যাস করিয়াছেন। মনে হয় নিকটে থাকিলে পৃথিবীর কল্যাণের ব্যাঘাত হইত। এই ভোজবিদ্যার লীলা অবিদ্যাই জানেন। এই মরীচিমালী কালকল্প, অর্থাৎ যমের মত নিয়ত পরিবর্ত্তন দিয়া, জন্ম, জরা, মৃত্যুর মুখে লইয়া যাইতেছেন। আবার অন্যদিকে এই সবিতৃমণ্ডলই নবীন জীবন গঠনে সৃষ্টির সাহায্য করিতেছেন। সেইই এই সদাগতি করুণায় বঞ্চিত নয়। এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রত্যেক জীবনে বিবেকের উন্মেষ হওয়া উচিত। কিন্তু অবিদ্যার আবরিকা শক্তিতে এই নশ্বরতা উপলব্ধি করিতে আমরা বিশেষ অসমর্থ। ভব প্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্যার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল মায়ায়, আমরা প্রায় সকলেই মুগ্ধ।

সকলেই পঞ্চীকৃত স্থূল দেহ লইয়া, পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া তীব্র গতিতে ব্যোমমার্গে ভাসিয়া চলিয়াছি। কৈ, একটি বারও ত চিন্তা আসে না এর পরিণাম কি? আবার দেখিতে দেখিতে মৃত্যুর পর অপঞ্চীকৃত অবস্থা আসিয়া এই পৃথিবীর অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ অন্য প্রকারের বাহন অবলম্বনে চক্রবৎ পুনরাবর্ত্তে পঞ্চীকৃত হইবার মানসে, পৃথিবীতে পুনরায় আসিতেছি। নিয়তই উৎক্রম আর অনুক্রম।

কুহকী অবিদ্যার ভোজবাজিতে চক্ষে ও মনে ভেল্কি লাগিয়া গিয়াছে। এই অভিভূত অবস্থা আমাদের কাটিতেছে না। সংবেদ আসিলেই ত আমরা নিস্তার পাই, শান্তি আসে। এ যে কেবল ভ্রম অধ্যারোপ অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর কল্পনা এবং তাহাতে

প্রতীতি। এই প্রতীতিতে যথার্থ বস্তুজ্ঞানের অভাব বর্ত্তমান। যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি। ধন্য অবিদ্যার অনির্ব্বচনীয় লীলাখেলা! চিন্তাশীল বুদ্ধিমান বলিয়া যে মানব খ্যাতি পাইয়াছেন তাঁহাদেরও পারমার্থিক খেই হারাইয়া যায়। প্রবন্ধ পাঠে অবিদ্যা ও মায়ার স্বরূপজ্ঞান ঠিক ভাবে আসিবে, বদ্ধমূল হইবে আশা করা যায় না। যাহা মনন দ্বারা বোধগম্য হওয়া সম্ভব। পরম সিদ্ধান্ত এই, যাহা বাস্তবিক নাই, অথচ আমরা স্থিতিশীল দেখি এবং সেই ইন্দ্রজাল দেখিয়া তাহাকে সত্য বলিয়া মনে করি, আর জীবনের খেলা সেই সত্য ভ্রমে সাঙ্গ করিয়া দিই, তাহা কোন মতেই উচিত নয়। সেই ভুল ভাঙ্গিতে পারাই জীবনের কল্যাণ। তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহা জাগিলেই একদিন না একদিন, কিংবা জন্মান্তরেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। যখন যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়, তখনই মায়া ও অবিদ্যার স্বরূপ ধরা পড়িয়া থাকে। মায়া ও অবিদ্যার লীলা বুঝিলেই অনুরক্তি এবং অনুশোচনা নাশ ঘটে। মায়ার নিবৃত্তির জন্য গীতার ৭—১৪ শ্লোক পড়িবেন।

এইবার একটি মৃদুস্বরে গান

মন তুই আপন বুঝে চল্,—
ভেঙ্গে ফেলে মায়ার বেড়া
পালিয়ে চল হতচ্ছাড়া
অবিদ্যা কচ্ছে তাড়া
ধরে নানা ছল্।
মন তুই···

অসার ভোগানন্দ রসে,—
পাগল হয়ে হারাও হুঁসে
ওরে ও সর্ব্বনেশে
হয়োনা চঞ্চল।
মন তুই···

রিপুর চোট্‌ খাচ্ছ হেসে,—
হারাবি পথ লাগবে দিশে
কি হবে অবশেষে
(তোর) রত্তি নাহি বল।
মন তুই···

লোক দেখানো কর পূজা,—
গোপন ভাবে করছ মজা
যাবেনা জন্ম সাজা
(মন) হলেরে বিকল।
মন তুই·

(ভবে) করিস না আশার নেশা—
(ওরে) আশা হল সত্যনাশা
অন্তিমে দুঃখ দশা
দিয়ে থাকে খল।
মন তুই·

শত্রু মিত্র আপন করে—
প্রেমের ডুরি বাঁধনা জোরে
পৌঁছিলে ভব পারে
(পাবি) শান্তিরে কেবল।
মন তুই···

ফণি

জীবনে কত রকমের ভুল হয়

ভুল যে কত রকমের হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মন যত প্রকারের মিথ্যা চিন্তা করিবে তত প্রকারের ভুল হইবে। এই ভুল কেন হয়? অজ্ঞানতার কারণ। অজ্ঞানতা কেন আসে? পরম তত্ত্বে মননের অভাবে। মননের অভাব কেন হয়? নশ্বর জগতের আকর্ষণের মোহে। মোহ কেন আসে? বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা ও চিত্তের অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির সংশয় হেতু। এই বুদ্ধি ও চিত্তের সংশয় রূপ ম্লানতা কেন দেখা দেয়? মনের বহির্ম্মুখী প্রবল আকর্ষণে। এই আকর্ষণের কারণ কি? ভোগানন্দের পাগলামি। এই পাগলামির পরিণাম কি? বিশ্বাস ও সংবিদ্ হারাইয়া এই ভুলের জন্য ঐহিক জীবনে ব্যথা ও অশান্তি এবং পারত্রিক জীবনে দুর্ব্বহ ক্লেশ ভোগ করা। অনেকেই বলিবেন, পারত্রিক জীবনে কি হইবে না হইবে কে জানে? এই 'কি হইবে না হইবে' বলাটাও একটা ভুল।

অনেক সময়ে সরল শুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে জ্ঞাতব্য স্থির করিতে না পারিয়া এবং চিন্তাশক্তির জড়তাবশতঃ ভুল হইয়া থাকে। মানব জীবনে যে ভুল হয় তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি মুখ্য, অন্যটি গৌণ। মুখ্য ভুল হইতেছে অস্থায়ী অনিত্য সুখের নেশায়, অত্যন্ত বায়ু বিকার ঘটিলে তৎকালে অব্যবস্থিত চিত্তের কারণ, অধ্যাত্মতত্ত্বে ঔদাস্য বা বিরাগ দেখা দেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাসও উঁকি মারিতে থাকে; তখনই বুঝিতে হইবে জীবনে একটি প্রধান ও মস্তবড় ভুল হইয়া যাইতেছে। আর গৌণ ভুল হইতেছে, সংসারে প্রবল আসক্তির জন্য, সময় সময় যে বিধি ব্যতিক্রম, অকর্ত্তব্য ও অনাচার ঘটে, তাহাকে জীবনের গৌণভুল বলে। এই গৌণভুল সমাজ ও রাষ্ট্রের চাপে সংশোধিত হয়। এই সংশোধন মুখ্য ভুলের সহায়তা করিয়া থাকে।

যখন সত্যের অনুভূতির অভাব হয়, তখন মিথ্যাই সত্যরূপে প্রতীত হয়। ইহা একটি বিষম ভুল। সত্য মিথ্যার লক্ষণ বা স্বরূপ

জানা না থাকিলে ভ্রমে পড়িতেই হইবে ; তাহাতে যে ভুল হইবে তাহা বহির্ম্মুখী জ্ঞান লইয়া ধরা যাইবে না। সে ভুল ধরিতে হইলে বিশেষ জ্ঞানালোকের আবশ্যক হয়। যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সর্পের আতঙ্ক হয়, এ ভুল তখনই ভাঙ্গে, যখন দীপ হস্তে কেহ উপস্থিত হন। তখন ভয়চকিত অন্তর রজ্জুমাত্র দেখিয়া নিরুদ্বেগ হইয়া থাকে। এখানে এই রজ্জু হেতু মিথ্যা, আর সর্প হইলে সত্য হইত। সুতরাং যাহার বাধ আছে তাহা মিথ্যা, আর যাহার বাধ নাই তাহাই সত্য। স্বভাবের পরিবর্ত্তন চিন্তা করিয়াই জগতের সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হইবে। নচেৎ ভুলের জন্য পরিণামে আতঙ্ক আসিবে। ভুবনের তাবৎ বস্তুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখিয়া মনে হয়, ইহা নির্ব্বাধ নহে, বাধ ছিল, আছে ও হইবে, অতএব মিথ্যা। কেবল বাধ নাই পরমার্থ তত্ত্বে। সুতরাং যাহার পরিবর্ত্তন নাই তাহাই সত্য।

জীবনে সত্য মিথ্যার ভুল সংশোধনের জন্য বিধি নিষেধের ব্যবস্থা ও অনুশাসন লইয়া গীতা উপনিষদাদি বহু অধ্যাত্ম শাস্ত্র এই পুণ্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান। চাই জানিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা, অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মা হওয়া। যিনি যেরূপ যোগ্য তাঁহার জন্য তদনুরূপ গ্রন্থ ও উপদেশকের অভাব নাই। ভুল ভ্রান্তি অপনোদন ও জ্ঞানলাভের জন্য গুরুর আবশ্যক হয়। শিষ্যের কল্যাণের জন্য, শিষ্যের অন্তরের জড়তার পরিমাপ করিয়া গুরু যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। শিষ্যের উচিত যোগ্য গুরুর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছান। জীবনে বহু গুরুর আশ্রয় লইতে হয়, তাহাতে অধ্যাত্ম পথের সত্যকারের যাত্রী হওয়া যায়। নচেৎ অ, আ, ক, খ শিক্ষার জন্য কলেজের অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার গভীর তত্ত্বকথা হৃদয়ঙ্গম হইবে না এবং তিনিও শিশুজ্ঞান সম্পন্ন ভুল পথের পথিককে লইয়া বৃথা সময়ের অসৎ ব্যবহার করিতে রাজি বা সম্মত হইবেন না। যে সকল জীবনে জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে ভুল সংশোধনের স্পৃহা জাগে, তখন তাহাদিগকে অধ্যাত্ম তত্ত্বের প্রথম স্তরের উপদেশক গুরুর

আশ্রয় লইতে হয়। উচ্চস্তরের সাধকগণও বলিয়া থাকেন, যোগ্য কুলগুরুর নিকট শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত জীবনের ভুল পথের ভ্রম অপসারিত হইলে, তাহার পর আসিও। বরং জানা উচিত, পিতা মাতাকে যাঁহারা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন তাঁহাদেরই সৎগুরু লাভ সহজ হয়, ভগবানের এমনই মহিমা। মোট কথা গুরুজনের প্রিয় হইলেই শ্রেয় লাভ হয়।

সৎগুরুর কৃপালাভে সংসার জীবনের মোহজনিত ভুল হইতে বিমুক্ত হয়। গুরু করেন কি? গুরু ইষ্টমন্ত্ররূপ দীপ জ্বালিয়া অন্তরে বসাইয়া দেন। যথাকালে সেই দীপালোক জ্ঞানচক্ষে লাগিলেই জগতের নশ্বরতা দেখিয়া সকল ভুলের অবসান হয়। কিন্তু যতদিন না ভুল ভাঙ্গে ততদিন ঐ গুরুদত্ত দীপে তৈল ও তৈলমালী বা শলিতা দিতে হইবে; ভুলিয়া যাইলে চলিবে না। প্রহরে প্রহরে বা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, দীপ নিভিয়া না যায়। দীপ নিভিয়া যাইলে অথবা মিটমিটে প্রভাহীন হইলে, অন্তরের অন্ধকারে জ্ঞান-চক্ষের ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হইবে। আর সেই দীপ্তিহীন নিষ্প্রতিভ অন্তর লইয়া, যদি তৎকালে উৎক্রান্তি ঘটে, তাহা হইলে পরলোকে সেই আত্মিকের আলোক-রাজ্যে স্থান মিলিবে না। সেখানে অন্তর লইয়া ব্যবস্থা হয়। দীপ নিভিয়া যাইলে অন্ধকারেই থাকিতে হইবে।

আর যদি কাম-ক্রোধাদি বাত্যা সেই গুরুদত্ত দীপের উপর লাগিয়া হেলিতে দুলিতে নিবু নিবু হয়, তখন সাধককে ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। লক্ষ্যের অভাব হইলে এই দীপ নিভিয়া যায়; তখন গুরু কিছুই করিতে পারেন না; অপদার্থ শিষ্য বলিয়া ত্যাগ করেন। তজ্জন্য হাটক পেটিকাবৎ এই উপাংশু দীপ যাঁহারা অতি গোপনে ভালভাবে যত্নপূর্ব্বক জ্বালিয়া রাখেন, তাঁহাদের জীবনে অকস্মাৎ সকল ভুল চলিয়া যায়। ইহাকেই বলিয়া থাকে মুক্তি। ভুলের পরিসমাপ্তি। সার্থক জীবন লাভ।

খাপছাড়া গান (তরজার সুরে)

দুনিয়ায় চালাক মানুষ আছে কয় জনা,
ভুল ভেঙ্গে দিয়ে দেখনা।
এ ভবে মোহ মদে মত্ত হয়ে, লোকে চালাক বনেছে,
এখানে গরীব মানুষ, পয়সা করি চালাক সেজেছে
তারা ভোগের মানুষ, ভোগে মাত্র, ভোগেই চালাক বনেছে
বিশ্বগতি নাইক জানা, রুগ্নমনা, অমর সেজেছে
নিয়তির বশে মৃত্যু এসে দিবে যাতনা
এটি সে দেখেও শেখে না।
যার তার চেলা হস্‌নারে ভাই এই কলিযুগেতে
সাধক গুরুর সঙ্গ পেলে, সুখী হয় পর জগতে
ভণ্ড সাধুর কর্ম্ম মধুর, ভোগীর মনটা ভুলাতে
তারা মিথ্যা ভানে পয়সা টানে, অনাচার সে কর্ম্মেতে
(হায়রে) ভোগী যারা মরণ তারা ভাবতে পারে না
পরিণাম আদৌ বুঝে না।
মন গুণের বশে, সুখের আশে, নিত্যই করে ভর
পাগল করে সাজাইয়ে রাখে, মনের নাইক ডর
ভুলের খেলা ও বিষয়-ভোলা ছেড়ে দেরে আপন পর
গীতার উক্তি হবে মুক্তি এ ভুলের ফাঁকি বুঝে মর
হৃদয়-বাতি নিভে যাবে, গুরুমন্ত্র জপ না
(ভবে) ভুলের খেলায় মজ না।
খুঁজে খুঁজে দেখলি সারা, এ ভবে চালাক মানুষ কৈ ?
ভুলের নেশায় বন্দী দশায় পায়না আসল খেই
মায়ার খেলায় এ বিশ্ব লীলায়, আপন কেহ নাই
দেবের উক্তি যদি চাওরে মুক্তি, সার কর গোঁসাই
ধন্য হবে শান্তি পাবে, যদি ছাড় কামনা
ভুল ভাঙ্গলে তবে সাধনা।

—ফণি

চতুর্থ স্তবক

পরলোকে অবিশ্বাস কেন হয়

অনেকে বলিবেন বিশ্বাস অবিশ্বাসের পরিভাষা বা সংজ্ঞা কি? তাহার উত্তর এই, অন্যের জ্ঞানমত প্রত্যক্ষকে সরলভাবে গ্রহণ করাই বিশ্বাস, আর গ্রহণ না করাই অবিশ্বাস। পরলোক সম্বন্ধে বেদান্ত, ছান্দোগ্য, গীতা, তন্ত্র, চরক প্রভৃতি গ্রন্থে মহর্ষিগণের যে সকল তথ্য-পূর্ণ বিষয় আছে, তাহা গ্রহণ না করাই অবিশ্বাস। এই অবিশ্বাসি-গণ এক প্রকার অন্ধ। তাহারা জীবনে চলিবার পথে ক্লেশরূপ কাঁটা, খোঁচা, গর্ত্তে পড়িয়া কষ্ট পাইবেই। এই অন্ধ জীবনে স্বাধীনতার অভাব। তজ্জন্য তাহারা জ্ঞানরাজ্যের রাজপথে সাহস করিয়া চলিতে চায় না। অহেতুক আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়। অবিশ্বাসী তাহার মনের স্তরে স্তরে দুশ্চিন্তার বোঝা লইয়া ঘোরতর কষ্টের মধ্যে বিমর্ষ-ভাবে, সন্দেহ যষ্টির সাহায্যে ঠুক্ ঠুক করিয়া চলিতে থাকে মাত্র। অবিশ্বাসী জ্ঞানান্ধের কিবা রাত্র কিবা দিন। কে তাহাকে বুঝাইবে! তাহার ময়লা-পড়া বুদ্ধিতে স্বচ্ছতা আনয়ন করা কি সহজ কথা! যে সতত মোহমদে মত্ত হইয়া থাকে, পরলোক কেন, পরমাত্মাকেও সে শুদ্ধ চিত্তে প্রেমের সহিত মানিতে বা বিশ্বাস করিতে চায় না। বহির্ম্মুখী বিকারগ্রস্ত প্রেম লইয়াই সে খেলা করে।

মানব বহির্ম্মুখী স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগতের যে সকল বস্তুর উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহাতে বহির্ম্মুখী জ্ঞানের যৎসামান্য

অর্থাৎ পরিকৃশ তত্ত্ব অন্যের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানী সাজেন। সেখানে জড়-বিজ্ঞানীর কথায় বিশ্বাস হারায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের অধ্যাত্ম বিজ্ঞানীর কথায় অবিশ্বাস দেখা দিয়া থাকে। পরন্তু যাঁহারা মার্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাদের অন্তরে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রশ্ন জাগে। ইহারাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, মনের দ্বিবিধ গতি। মন ঠিক মধ্যস্থলে থাকিয়া কর্ম্ম করে। বহির্জগতের দিকে স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া, এবং তদাত্মক সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া অন্তর্জগতের দিকে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। সাধক গাহিতেছেন:—"গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে হলাম মাটি।" গর্ভবাস কালে মন অন্তর্ম্মুখী থাকে; গর্ভমুক্তির পরই শিশুর মন বহির্ম্মুখী হয়। ক্রমশঃ এই বহির্ম্মুখী মন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়ভাবে বহির্জগতের জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। তখন ভুলিয়া যায় সেই অন্তর্জগতের স্মৃতি বা চিন্তা। তৎকালে শনৈঃ শনৈঃ স্থূল জগতে, মায়ার কুহকে মোহ গ্রস্ত হইয়া মনকে জীবনের প্রতিকূল পথে চালাইয়া, সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞানচর্চ্চায় সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকে। বিস্মরণ হয় তার গর্ভাবস্থার কথা; সুতরাং অবিশ্বাস তাহাদের অন্তরে উদয় হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সংযমের সহিত মনকে গর্ভাবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত চিন্তন করিতে হইবে, অর্থাৎ নিসর্গ চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হইবে। যখন এই বিষয়ে যত্ন আসিবে তখনই অধ্যাত্ম তত্ত্বে ক্রমশঃ বিশ্বাস উদিত হইবে।

অনেকে জড়বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের প্রমাণীকৃত বর্ণনীয় বিষয় বিদ্যার্থী জীবনে অধ্যয়ন করিয়া, বিদ্যাস্নাতকগণ অসম্পূর্ণ জ্ঞানার্জনে নিপুণ বাকচাতুর্য্যে তোতাপাখীবৎ হইয়া যান। ইহার কারণ, হয় অধ্যাপনার দোষ, কিংবা আংশিক শিক্ষালাভ। যেমন ভূগোল পাঠে জানিলাম পৃথিবী স্বয়ং ঘুরিতেছে বলিয়া দিবারাত্র হইতেছে। বিশ্বাসী তাহা মানিয়া লইলেন; কিন্তু অবিশ্বাসীর প্রশ্ন নিছক মনগড়া যুক্তিহীন হইলেও বলিলেন, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি যে ঘুরিতেছে ইহাই

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ; যদি পৃথিবী ঘুরিত তাহা হইলে হিমালয়ের অভ্রচুম্বী এভারেস্ট শৃঙ্গ কোন্‌কালে পড়িয়া যাইত। কাত হইলেই তো পড়িয়া যাইবে। আমরা কি বর্ব্বর যে, অলীক কথায় বিশ্বাস করিব !

কিন্তু পৃথিবীর আবর্ত্তনের ক্রিয়া ধরা পড়ে যন্ত্রের সাহায্যে। সেই যন্ত্রের নাম, 'জাইরোস্কোপ', এবং 'ফোকল্ট পরিদোলক্'। এই যন্ত্র ব্যতীত কিছুতেই নিরূপণ করা যায় না বা প্রমাণ করা যায় না যে, পৃথিবী স্বয়ং ঘুরিতেছে। কয়জন ব্যক্তি এই যন্ত্র দেখিয়াছেন ? তজ্জন্য পৃথিবী ঘুরিতেছে কি না, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ধৃষ্টতায় অবিশ্বাস পোষণ করিলে প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না।

পুরাকালে বিদ্যার্থী জীবনে সংযমের সহিত অধ্যাত্ম চর্চ্চাও করিতে হইত। বর্ত্তমানে শিক্ষা বিভাগে তাহার কোন বালাই নাই। এই সকল বিদ্যার্থী প্রতীচ্য ভাবধারায় সুশিক্ষিত হইয়া, তদনন্তর উত্তর জীবনে সূক্ষ্মজগতের উপর সংশয় বা অবিশ্বাস পোষণ করেন। ভাষার সাহায্যে জ্ঞানবৃদ্ধ সাজিয়া জেঠামির সুরে বলেন, পরলোক-টরলোক কিছু নাই, ও সকল অনিশ্চিত উক্তি। ইহারাই অধ্যাত্ম চর্চ্চার অভাবে সূক্ষ্মের দিকে অবিশ্বাসী ও সংশয়ারূঢ় অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানে অবসাদগ্রস্ত আছেন। সেই জড়বাদী খুঁজিয়াই পান না পরলোকের সত্তা। এই বহির্জগতের ভেল্কিতে তাঁহাদের মন সতত নিবদ্ধ। বৈচিত্র্য চমৎকার এই, বহির্জগতের সাধক, অন্তর্জগতের কথা বলিতে বোধহয় লজ্জা পান। স্থূল-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ আছে কি না, মনের ঈক্ষণশক্তি বক্র ও কুটিল থাকায় উপলব্ধি করিতে অক্ষম হন। সুতরাং সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে কিছুই অসঙ্গত নহে। পাশ্চাত্ত্য গুরুগণ শিষ্যমণ্ডলীকে অবিশ্বাসী করিয়া এখন নিজেরাই বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। পরকাল সম্বন্ধীয় চর্চ্চার ভূরিভূরি প্রমাণ তাঁহাদের পারলৌকিক গ্রন্থে প্রকাশ হইতেছে।

ইহলোক সর্ব্বস্ব ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, অধ্যাত্ম-তত্ত্বের চির প্রসিদ্ধ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেও, বর্ত্তমানে প্রায় সিকি লোকের মনে পরলোক সম্বন্ধে সন্দিগ্ধতা আসিয়াছে। তাহাদের উক্তির সার মর্ম্ম এই যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। এখানে জিজ্ঞাস্য এই—চক্ষু কি পদার্থের জ্ঞান দেয়? বস্তুজ্ঞান মনে অনুভব হয়। যেমন গাঢ় অন্ধকারে একটি দিয়াশলাই হস্তে ঠেকিলে, মন গাঢ় অন্ধকারেও বুঝিতে পারে এটা দিয়াশলাই। আমরা সূক্ষ্মের দিক হইতে আসিয়াছি, সুতরাং সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্য, এই চর্ম্ম-চক্ষের আবশ্যক করে না। জ্ঞান চক্ষুর দ্বারাই তাহার অনুভব হয়। যেহেতু তাহা আমাদের অজানা নহে। কেবল স্মৃতিভ্রম ঘটিয়াছে মাত্র। অবিশ্বাসের ইহাই মূলতত্ত্ব।

সতত মিথ্যা অনুধ্যানে যাঁহারা সূক্ষ্ম জ্ঞানের পথ ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা বাঁকা পথে চলেন, অনবধানতা যাঁহাদের অন্তরের বৃত্তি, তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মের কোনটাই বুঝেন না। যখন আমরা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে মাতৃগর্ভে ক্রমশঃ স্থূলের দিকে আসিতে থাকি, তৎকালে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলিত কি? নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিত কি? মুখ দিয়া খাইতাম কি? নাভি দিয়া খাওয়া কি সম্ভব? মলমূত্র ত্যাগ না করিয়াও বৃদ্ধির আশা কি করা যায়? রক্তের গতি ছিল কি? তবে কি ভ্রূণ অবস্থায় আমরা মৃত ছিলাম? এই সকল অপ্রত্যক্ষ অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষের মধ্যে আসে না কেন? যখন প্রত্যক্ষের মধ্যে উপস্থিত হয়, তখন মুহূর্ত মধ্যে মহামায়ার অত্যাশ্চর্য্য ভেল্কিতে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। প্রত্যক্ষে ভিন্নরূপ দেখি। তজ্জন্য আমরা কি অপ্রত্যক্ষ অবস্থাকে বিশ্বাস করিব না! এখানে বিশ্ব-প্রকৃতির লীলা বলিয়া এক ফুঁয়ে উড়াইয়া দিলে, মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে। সেই বিশ্বপ্রকৃতির সূক্ষ্ম খেলাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। পরলোকের অবিশ্বাস লইয়া আবিল মনোবৃত্তির কল্পনায়, কেবল

চর্চ্চাহীন অতিবাদী হইলে, তাহাতে অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাইবে। ইহার কারণ উচ্চমনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের অভাব। এবং ব্যসনী ব্যক্তির গোপন শয়তানি মনোবৃত্তির চঞ্চল খেয়ালের পরিণতি। যে সকল ব্যক্তি যুক্তিহীন অবিশ্বাস লইয়া, অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন পরলোক নাই, তাহাদের যুক্তির উপযুক্ততা এইরূপঃ যেমন বৃত্তের ৯৯টি ব্যাসার্দ্ধ সমান বটে, কিন্তু একটি ব্যাসার্দ্ধ দৈর্ঘ্যে কিছু বেশী। এই উক্তিতে জ্যামিতি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন হাসিয়া থাকেন, তদ্রূপ পরলোক অনুশীলনকারী ব্যক্তিও পরলোক নাই বলিলে হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন না।

যাঁহারা পরলোক অবিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সূক্ষ্মজ্ঞানের পরিধি অতি অল্প, নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের উক্তির সহিত যুক্তি এই; প্রত্যক্ষের অভাব। মনে করুন উনবিংশ শতাব্দীতে যখন 'রেডিও' আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন যদি কেহ বলিতেন শব্দ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ পৃথিবী বেষ্টন করিয়া থাকে। তৎকালে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানহীন ব্যক্তির নিকট উত্তর পাইতেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; ইহা বিশ্বাস করা যায় না। 'শব্দ' ত কিছুদূর গিয়াই ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া যায়। কি করিয়া বিশ্বাস করা যায় পৃথিবী বেষ্টন করিয়া থাকে? যদি কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, আর্য্য শাস্ত্রে আছে শব্দ ব্রহ্ম, অনুনাসিক শব্দ বিশ্বব্যাপী হয়। বহির্ম্মুখী—স্থূল দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অবিশ্বাসী উত্তর দিবেন, ও সকল কল্পনা; আমি অন্ধ বিশ্বাসী নহি। সুতরাং জ্ঞানের অভাবে আবাল্য দশায়, মানব অবিশ্বাসী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে রেডিও যন্ত্রের আবিষ্কারে সেই অবিশ্বাস বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

যাঁহারা পরলোক চর্চ্চা করেন তাঁহারা জানেন, পরলোকগত আত্মিককে আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারেন; এবং চক্রে আসিতে যতটুকু সময় লাগে তদনন্তর আসিয়া উপস্থিত হন। শব্দ যেরূপ প্রত্যক্ষ হয় না, আত্মিকও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না—যদি

তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া দেখা না দেন। এই বিংশ শতাব্দীতে 'শব্দ' যেরূপ রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে শুনা যায়, সেইরূপ পরলোকবাসী আত্মিকগণও মিডিয়মের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে কথা বলিয়া থাকেন। অতএব অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিপূর্ণ হেতু নাই। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা পরলোক অবিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হন। কারণ অজ্ঞতা বা মূঢ়তা জ্ঞানের পরিচায়ক হইতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা গীতা, উপনিষদাদি বেদান্ত গ্রন্থ কোন দিন যত্নপূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম মনগত করেন না, অথবা সন্দিগ্ধতা লইয়া পুরুষানুক্রমে পরলোক চর্চ্চায় বিরত, তাঁহাদেরই মধ্যে অবিশ্বাস আসা নিতান্ত স্বাভাবিক। শেষ কথা, এই অবিশ্বাসের অক্টোপাস ছিন্ন করিতে পারিলে, মানব বিশ্বাসের সহিত সত্যের সম্মুখীন হইয়া থাকেন। জগতের ব্যাপার দেখিয়া কবি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

কুজ্‌ঝটী ভরা পৃথিবীতে আজো অনেক অবিশ্বাস
মূঢ়তায় মাখা ক্লান্ত ক্লিন্ন অসংখ্য পরিহাস।

—সুনীল ভট্টাচার্য্য।

মানব জীবনে বাসনা ক্ষয়ের ফল

প্রথমতঃ বাসনা কি, তাহা জানা আবশ্যক। বাসনার সংজ্ঞা বা পরিভাষা এই ঃ অপ্রাপ্ত বস্তুর সামান্য প্রাপ্তিতে পরিণাম চিন্তা না করিয়া, ভোগের যে অসমাপ্ত ব্যাকুলতা তাহাকে বাসনা কহে। এই বাসনা সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠেও লিখিত আছে ঃ—

দৃঢ় ভাবনয়া ত্যক্ত পূর্ব্বাপর বিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা।

'পূর্ব্বাপর বিচার রহিত দৃঢ় ভাবনার সহিত পদার্থের প্রাপ্তিবিষয়ে যে ইচ্ছা, তাহাই বাসনা নামে কথিত হয়।'

এরূপ যে বাসনা, তাহার নাশে শুভাশুভ ফল কিরূপ হয় তাহা বিচার করিতে হইলে, বাসনা কত প্রকার এবং অন্তরে কেন জাগে তাহাই প্রথম আলোচ্য বিষয় হইবে। কিরূপে পরিত্যাগ করা যায় ও তাহার পরিণাম কি, পশ্চাৎ তাহার আলোচনা করিব। শাস্ত্রে কথিত আছে, বাসনা দ্বিবিধ,—মলিনা ও শুদ্ধা। 'বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা বুধৈঃ।'

মলিনা বাসনা মুমুক্ষুর নিত্যবৈরী। যাঁহারা পরিণাম চিন্তায় অক্ষম, পূর্ব্বাপর বিচারহীন, তাঁহাদের নিকট বলবতী ভোগেচ্ছা দেখিয়া 'বাসনা' পরম মিত্ররূপে উপস্থিত হয়; এবং পরিণামে দুঃখ দিয়া শত্রুর কার্য্য করে। মলিনা বাসনা কুপ্রবৃত্তির জনক, অদ্ভুত তাহার গতি, মৃত্যুর পরও সঙ্গের সাথী হয়। বাসনা-জাত প্রারব্ধ, জন্মান্তরের হেতু হইয়া থাকে। প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থে যে কর্ম্মদ্বারা শরীর ধারণ করিতে হয় অর্থাৎ জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। প্রারব্ধ অর্থে শরীরাত্মক অদৃষ্ট। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, প্রযত্ন, জ্ঞান,

আয়ু ও ইন্দ্রিয় ইহারা প্রারব্ধ কর্ম্মজ ভাব। শ্রী বাসুদেব অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ—

প্রারব্ধ বাসনাচেচ্ছা প্রবৃত্তির্জায়তে নৃণাম্।
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা প্রভুত্বং তস্য সর্ব্বতঃ ॥

৬।৩১ শান্তি গীতা।

'প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতে মানবগণের বাসনা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মে। সর্ব্বতোভাবে তার প্রভুত্ব, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপর, এই প্রারব্ধ।'

যোগবাশিষ্ঠে আছে ঃ—

অজ্ঞান সুঘনাকারাঽহঙ্কার ঘনশালিনী।
পুনর্জ্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ ॥

'রজস্তমোগণশালিনী অহংকার যুক্ত যে ঘোর অজ্ঞানরূপ বাসনা, তাহাকেই পণ্ডিতগণ পুনর্জ্জন্মকারী মলিনা বাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।'

এই পার্থিব দেহে মনের উপর বাসনার যে চাপ পড়ে, তাহাতে মন অত্যন্ত ভারি হইয়া যায়। মৃত্যুর পর এই ভারি মন লইয়া যখন সে সূক্ষ্ম জগতে বাসের সূত্রপাত করে, তখন সে ভূবর্লোকের উপরে উঠিতে পারে না। তাহার জীবনে যত প্রকার বাসনা ছিল, তাহা আরও ঘনীভূত ভাবে মূর্ত্ত হইয়া পরকালে অত্যন্ত যাতনা ও কষ্ট দিয়া থাকে। তাহাকে নরক ভোগই বল, আর যাহাই বল; তখন সেই মৃত আত্মিককে হতাশ ও ক্লান্ত করিয়া দেয়। তখনই সে ঠিক ভাবে ভাবিতে পারে, বাসনার কি জ্বালা; এই ভূবর্লোকে আসিয়াও নিস্তার নাই; সঙ্গ ছাড়ে না, কি দারুণ অশান্তি! ভূলোকের চিন্তা ও বাসনা সূক্ষ্ম জগতের অর্থাৎ পরলোকের প্রথম অবস্থানকালে, আত্মিক যেন অবরোধ অবস্থায় থাকেন, তাহার সমাধান হওয়া বড়ই শক্ত। ভূবর্লোকের অন্ধকারে অশেষ প্রকার বাসনার দাহে সেই আত্মিক বুঝিতে পারেন, মলিনা বাসনার মোহেই এই ব্যাকুলতা, সুতীব্র যন্ত্রণাদায়ক বিবশ অবস্থা, ও দুঃসহ উদ্বেগের হেতু।

পার্থিব জীবনে নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর মধ্যে, অহংভাবে ভরপুর হইয়া, চিরজীবী সাজিয়া, সুখ ও আনন্দ লাভ মানসে, মানব ক্ষণিক স্বার্থ ও বাসনা লইয়া কত অশুভ ঘটনাই ঘটাইতেছেন! ভূবর্লোকে গিয়া আত্মিক যখন বুঝিতে পারেন যে, ভূলোকের অলীক আত্মাভ্রান্তিই এই নিদারুণ ক্লেশের প্রধান কারণ, তখন অনুতাপের উদয় হয়। অনুতপ্ত হওয়াই আত্মিকের প্রায়শ্চিত্ত। তখন সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে থাকে এবং ভূবর্লোকে আগত মহাপুরুষের (আত্মিকগণের) কৃপায় সৎসন্ধিৎসু হইয়া, তাঁহাদের সাহায্যে ন্যার্থ অর্থাৎ নিকৃষ্টা গতিতে রক্ষা পান, এবং সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে থাকে ও উন্নতির সুযোগ পাইতে থাকেন। তাহাও অতি ধীরে।

মিডিয়মের সাহায্যে বুঝা গিয়াছে যে, ভুবর্লোকের আত্মিকগণ একটা দুঃসহ যাতনায় ক্লান্তিপূর্ণ অস্থির কাতরোক্তি প্রকাশ করেন। তাঁহারা আলোক আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। অন্ধকারে থাকিলে তাহাতে স্বস্তি পান। তাঁহাদের আত্মিক জীবন যেন অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছে। পার্থিব জীবনে মলিনা বাসনার সেবায় বিহ্বল ও মুগ্ধ যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা কেবল দুঃখ ভোগের জন্যই যেন প্রেতলোকে বাস করিতে যান। সে দুঃখ যা-তা দুঃখ নহে, সর্ব্বদা শাসনের মধ্যে সশঙ্ক ভাবে থাকিয়া, ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। চক্র করিয়া ইহার পরীক্ষা করিবেন।

মলিনা বাসনা কেবল দুঃখের কারণ। ইহা পুনঃ পুনঃ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন করিয়া ক্লেশ দিয়া থাকে। ইহজীবনের আকাঙ্ক্ষা-লব্ধ যে প্রারব্ধ, তাহাই পরজীবনে বীজরূপে অঙ্কুরিত হয়; এইরূপে ক্রমান্বয়ে জন্মের পর জন্ম চলিতে থাকে, তাহাতে গর্ভ যন্ত্রণার ক্লেশ ও মৃত্যু যন্ত্রণার কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই জন্ম-মৃত্যুর আপদজনক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পান কেবল নিস্পৃহ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি। মলিনা বাসনার ক্রিয়া এই, গত জীবনের অপূর্ণ বাসনা,

ইহজীবনে পুনরায় নবীন ভাবে সূত্রপাত করা। ইহাতে মানব জীবনে স্বস্তি কোথায়! শাস্ত্রে আছে ঃ—

বাসনা বৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বদা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে ॥

'বাসনা বৃদ্ধিতে কার্য্য এবং কার্য্য বৃদ্ধিতে বাসনা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বারে বারে পুরুষের সংসারে আসা-যাওয়ার নিবৃত্তি হয় না।'

সংসারে আসা-যাওয়ার অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর কি কষ্ট, যদি কোন বুদ্ধিমান গভীর ভাবে তাহা অনুধ্যান করেন, তাঁহার অন্তরে বিবেক জাগিবেই। গর্ভবাস ও মৃত্যু যে কি ভয়ঙ্কর তাহা শুনিলে হৃৎকম্প হয়; সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ ইহাই। অবিদ্যার ইন্দ্রজালে ভুলিয়া যাই বটে, কিন্তু ইহজগতে যত প্রকার দুঃখ আছে তাহাকে হার মানিতে হয় জন্ম-মৃত্যুর বেদনার নিকট। যোগ শাস্ত্রে আছে ঃ—

উদ্বিগ্নো গর্ভ সংবাসাদস্তি গর্ভ ভয়ান্বিতা।

'মানব গর্ভবাস কালে অত্যন্ত ভীত এবং ভাবী গর্ভবাস চিন্তায় উদ্বিগ্ন চিত্তে অবস্থিতি করে।'

অবির্ভূত প্রবোধোঽসৌ গর্ভদুঃখাদি সংযুতঃ।
হা কষ্টমিতি নির্ব্বিন্নঃ স্বাত্মানং শোশুচীত্যথ ॥

শিবগীতা ৮ অঃ।

'গর্ভস্থ জীব অনেক জন্মের গর্ভবাস ক্লেশ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং অনুতাপের সহিত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ শোক প্রকাশ করে।'

গর্ভে দুর্গন্ধ ভূয়িষ্ঠে জঠরাগ্নি প্রদীপিতে।
দুঃখং ময়াপ্তং যত্তস্মাৎ কণীয়ঃ কুম্ভী পাকজম্ ॥

শিবগীতা ৮ অঃ।

'গর্ভে দুর্গন্ধ পূরিত, জঠরাগ্নি দ্বারা প্রদীপিত হইয়া গর্ভবাসে যে দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম, ইহা অপেক্ষা কুম্ভীপাক নরকে অবস্থান-জনিত ক্লেশও অতি তুচ্ছ মনে করি।'

ইহা হইল জন্মকালীন দুঃখের অতি সামান্য পরিচয়। এইবার মৃত্যু সময়ের ক্লেশ ভোগ সম্বন্ধে যৎসামান্য নির্দ্দেশ দিতেছি। আমরা কেন মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করি না? অথবা মৃত্যু নিকটে আসিলে অন্তরে ভীত হই কেন? ইহার কারণ ভূবর্লোকের যন্ত্রণা ও পুনঃ গর্ভবাস দুঃখের অনুস্মৃতি। এই স্মৃতি অন্তরে থাকে বলিয়াই মরিতে ভয় পাই। সে কিরূপ?

হিক্কয়া বাধ্যমানস্য শ্বাসেন পরিশুষ্যতঃ।
মৃত্যুনা কৃষ্যমানস্য ন খল্বস্তি পরায়ণম্॥

'মৃত্যু যখন নিকটে আসে, নাভিশ্বাসরূপ হিক্কার অকথ্য যন্ত্রণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, ক্রমে ক্রমে মৃত্যু আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।'

হা কান্তা! হা ধনং! পুত্রাঃ! ক্রন্দমান সুদারুণম।
মণ্ডূক ইব সর্পেণ মৃত্যুনা নীয়তে নরঃ॥

'উৎক্রান্তি সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম আত্মিকগণকে দেখিয়া হা কান্তা! হা ধন! হা পুত্র! বলিয়া অন্তর কঁদিয়া উঠে। কিন্তু নির্দ্দয় মৃত্যু মানবকে লইয়া চলিয়া যায়, যেমন সর্প মণ্ডূককে অর্থাৎ ব্যাঙকে গ্রহণ করে।'

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
ইতি কর্ত্তব্যতা মূঢ়ঃ কৃচ্ছ্রাদ্দেহাত্ত্যজত্যসূন্॥

'মৃত্যুকালে মানব অধীর হইয়া মনে মনে চিন্তা করে, কি করিব, কোথায় যাইব, কি লইব, কি করিয়া আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিব,

সেই কর্ত্তব্যাবধারণে অনভিজ্ঞ মানব অতি কষ্টে দেহ হইতে প্রাণ পরিত্যাগ করে।'

মাতা পিতা গুরুজনঃ স্বজনো মমেতি,
মায়োপমে জগতি কস্য ভবেৎ প্রতিজ্ঞা।
একো যতো ব্রজতি কর্ম্ম পুরঃসরোঽয়ং
বিশ্রামবৃক্ষসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ॥

'আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গুরুজন, আমার বন্ধুগণ, জগতে এই আমার, আমার মাত্র মায়ার ইন্দ্রজালের সম্বন্ধ, এই প্রতিজ্ঞা স্থায়ী নয়। কারণ মৃত্যুর পর স্বীয় কর্ম্ম সহায় করিয়াই জীব গমন করে, যেহেতু এই জীবলোক জীবন-পথের বিশ্রামবৃক্ষস্বরূপ এই সংসার।'

মলিনা বাসনা মানবকে জন্মের দুঃখ ও মৃত্যুর ক্লেশ দিয়া যেন সাবধান করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত বাসনার নেশায় মত্ত হইয়া বোধের অভাবে বুঝিতে বা চিন্তা করিতেই পারেন না যে, এই দুঃখ ও ক্লেশের হেতু 'বাসনা'; তাঁহারা জন্ম জন্ম কষ্টের হাত হইতে মুক্তি পান না। প্রারব্ধ কর্ম্মের বাসনা বীজ জ্বালাইতে না পারিলে, ইহজীবনের সঞ্চিত কর্ম্মের জন্য পুনঃ জন্ম লইয়া পরজীবনেও আমার আমার, হা বিষয়, হা অর্থ করিয়া দৈবী ও মানুষী পীড়ায় কাতর হইতে হয়। মানব ভোগের তাড়নায়, মত্ত অবস্থায় যখন জীবনের পরপারে চলিয়া যান, তখন ভূবর্লোকে যাইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মৃত্যুর পর অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম শরীরে মলিনা বাসনা ত্যাগ করা দুরূহ। এই পঞ্চীকৃত স্থূল শরীরে সাধনা দ্বারা নশ্বরতা বুঝিয়া, বাসনা ত্যাগ করা সহজ পন্থা। ভোগোপকরণ সম্মুখে রাখিয়া যাঁহারা তাহাতে বিতৃষ্ণা লইয়া সংসারে কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী হন। মৃত্যুকালে ব্যাকুল হন না, তৎকালে মনে ভগবৎ চিন্তার ভাব উদয়

হয়। অন্তরে আনন্দ পান। যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি বহুকাল পরে, নিজ জন্মভূমিতে ফিরিবার সময় অন্তরে আনন্দ পায়, তদ্রূপ।

এইবার শুদ্ধ বাসনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ বা আলোচনা করা আবশ্যক। যোগবাশিষ্ঠে আছে ঃ—

পুনর্জ্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা স্থিতা সংভৃষ্ট বীজবৎ।
দেহার্থে ধ্রিয়তে জ্ঞাত জ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে॥

'পুনর্জ্জন্মের অঙ্কুররূপ যে মলিনা বাসনা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় স্থিতি, কেবল মাত্র দেহ ধারণ উপযোগী কার্য্যাদি দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞানলাভ করাই শুদ্ধ বাসনার লক্ষণ।'

বিতথ্য অর্থাৎ মিথ্যা বাসনার চিন্তায়, এবং প্রবর্দ্ধমানা বাসনায়, মানবের সম্ভাবনা সকল ক্রমশঃ চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইতে থাকে। তখন যদি কেহ ভাগ্যবান ভবিতব্যের পরিবর্ত্তনের জন্য প্রমত্তত্ব পরিহার করিয়া গুরোপদিষ্ট হইয়া, আত্মনিষ্ঠা দ্বারা সম্ভাবনা দৃঢ়তর করিয়া, অনাত্ম বাসনার দ্বারা বস্তুসমূহের উপর যে আসক্তি, তাহা প্রযত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং অন্তঃকরণ হইতে মায়া-জনিত অজ্ঞানতা উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার পক্ষেই মলিনা বাসনার কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সহজ হইবে। আর জীবন-মুক্তির জন্য কি মলিনা, কি শুদ্ধা, উভয় বাসনাই ত্যাগ করিতে হয়। বাসনা ত্যাগ না করিলে মন স্থির হয় না। তজ্জন্য ইষ্টমন্ত্র জপের সময় মন চঞ্চল হইয়া বেড়ায়।

ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনা ক্ষয়ঃ।
বাসনা প্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে॥

'ক্রিয়া নাশ হইলে চিন্তা নাশ হয়, তদ্দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইয়া থাকে, বাসনা ক্ষয় অর্থাৎ কি মলিনা, কি শুদ্ধা উভয়ই ক্ষয় হইলে মোক্ষ, তাহাকেই জীবন-মুক্তি বলে।'

আমরা দর্শন শাস্ত্র পড়িয়া, তাহার সারাংশ এই প্রাপ্ত হই যে, সংসার-মণ্ডল কেবল দুঃখের নিলয়। এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই যত কিছু। সংসারে সুখের বাসনা করার অর্থ দুঃখের দিকে অগ্রসর হওয়া। সুখ ও দুঃখের পরিসমাপ্তিই আনন্দ। এই আনন্দ সাধকগণ লাভ করেন। চিত্ত স্থির করিবার সরল পন্থা পাতঞ্জল দর্শনে পাওয়া যায়। প্রযত্নসহকারে মৈত্রাদি বাসনা অভ্যাস করিবার প্রণালী ঃ—

মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষানাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাধনম্।

চিত্ত প্রসন্ন হয় মাৎসর্য্যাদি বৃত্তিসমূহের নিবৃত্তিতে। ইহাতে যে সাম্যাবস্থা লাভ হয় তাহা মৈত্রাদি বাসনার অভ্যাস-জনিত হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি মৈত্রাদি বাসনা। সুখী প্রাণীদিগকে দেখিয়া যে সুখ হয় তাহা হইল মৈত্রী, দুঃখী জীবের উপর সমবেদনার যে ভাব তাহা হইল করুণা, পুণ্যবান পুরুষদিগকে দেখিয়া হৃষ্ট হওয়ার নাম মুদিতা এবং পাপাচারীদের দেখিয়া অন্তঃকরণে যে অনাদর উপস্থিত হয় তাহাকে বলে উপেক্ষা।

সদ্বাসনা অবলম্বন করিয়া, শুচি ও শান্ত ভাবে ত্যাগের ভাবনা লইয়া, যাহাতে মনোবিকার বিন্দুমাত্র উপস্থিত হইতে না পারে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া, অনুদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া, আত্মচিন্তা যত গাঢ় হইতে থকিবে বাহ্য বাসনা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মন নিশ্চিন্ত ও স্থির হইয়া আসিবে। তখন শুদ্ধ বাসনাও নিয়মিত এবং ক্ষান্ত হইয়া যাইবে।

এ জগতে মৃত্যু সকলকেই গ্রাস করিবে। সেই নির্দ্দয় কালের কোন সময় অসময় নাই, যখন ইহা সুনিশ্চিত, তখন পরকালের জন্য প্রস্তুত থাকাই বিধেয়। ধন-জন-সম্পদ কিছুই সঙ্গে যাইবে না। বৃথা প্রতিকূল প্রারব্ধ সৃষ্টি করা কোন মতেই আমাদের শ্রেয় নহে। তজ্জন্য শাস্ত্রে বাসনা ত্যাগ করিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করিবার

জন্য বার বার উপদেশ দিয়াছেন। বাসনা ক্ষয়ের ফল এই, তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি হইলেই বিবেক উদয় হইয়া থাকে, তখনই পরম জ্ঞান লাভের উত্তম সুযোগ মিলে। সাধনার দ্বারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলে অর্থাৎ অভ্যাসে প্রযত্ন লইলে, প্রারব্ধ ক্ষীণ হয় ও জন্মান্তরের কষ্ট হইতে মুক্তি পায়। উচ্চ সাধকগণের বাসনা না থাকায়, বিষয়ভোগ-বিরত ও আশাশূন্য হন। তখনই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মানব কৃতকৃতার্থ হয়; এবং জীবনে পরম শান্তিলাভ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ—

বাসনাসু বিলীনাসু চিত্তে নির্ব্বিষয়ংমনঃ।
যস্য নির্ব্বিষয়ং চেতো জীবন্মুক্তঃ স উচতে ॥

গীতাসার ৭০ শ্লোঃ।

'বাসনা লয় প্রাপ্ত হইলে মন নির্ব্বিষয় হয়। যিনি নির্ব্বিষয় চিত্ত হইয়াছেন তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হন।'

প্রভাত উদগীত

স্বপনেরি ঘোর কাটাইয়ে মন
চেতনা লইয়া জাগরে।

বাসনার ঘরে লাগায়ে আগুন
হরি বোল্ বলে উঠরে।

আসিলে জগতে অতি শিশুবেশে
আজও না ভাব যেতে হবে শেষে
কালের ছলনা বুঝিতে পারনা
(মন) অমর সেজেছ সংসারে।

হল গলিত দন্ত পলিত কেশ
ভালেতে উঠেছে বলি রেখা রেশ
আশার কুহকে ডুবিয়া মরনা
করম ফলোর সাগরে।

হুঁসিয়ার যদি নাহি হতে চাও
আশয় লইয়া সময় বিতাও
ওরে,—বাসনার জালে প্রবেশ করিলে
পালাতে নারিবি আখেরে।

শ্মশানে যাইয়া দেখ মূঢ় মন
একে একে যায় শমন সদন
কেহ নাহি রবে পরপারে যাবে
সঞ্চয় রাখিয়া এপারে।

মধ্যে চিদ্‌ঘন নিরনল জ্যোতি
কর, সাধনে প্রকাশ হয়ে এক মতি
ভব পারে যাবি আলোক পাইবি
মায়া-মোহময় আঁধারে।

ছাড় কাম নেশা ভয়েরি কারণ
জাগ যুব তেজে না ডর শমন
ত্যাগ দণ্ড নিয়ে থাকরে নির্ভয়ে
প্রণবের সুরে ওঁঙ্কারে।
স্বপনেরি ঘোর···

—ফণি

সত্য চিন্তা কি

সত্য অর্থাৎ সৎ, সৎ অর্থে নিত্য, চিরস্থায়ী, সনাতন, সর্ব্বব্যাপী, শাশ্বত ও অজ। এই সত্যই পরমাত্মা বা পরম পুরুষ। ইনিই মানবের ভিতর জীবাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। এখন কিরূপ চিন্তা বা কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন হয়, তাহার উপায় নিরূপণ করাই এই সত্য চিন্তার প্রতিপাদ্য বিষয়।

তুলনা দেওয়া যাইতে পারে, ঘটাকাশ ও মহাকাশের সম্বন্ধ লইয়া। কিন্তু আকাশ ভৌতিক পদার্থ—মিলন সহজে সম্ভব। পরন্তু সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম ভৌতিক পদার্থ নহে এবং জীবাত্মাও ভৌতিক পদার্থ নহে। জীবাত্মা স্থূল অন্নময় কোষ ব্যতীত আরও সূক্ষ্ম পঞ্চকোষ মধ্যস্থ ঘটাকাশের মত সহজ মিলনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। মৃত্যুর পর অন্নময় কোষ ধ্বংস হয় বটে, তথাপি অন্যান্য কোষগুলি সাধারণ সংসারী মানবের ঠিকই থাকে। বৈরাগ্যবান ত্যাগী সাধকের মনস্থির জনিত অন্যান্য কোষগুলি ক্রমান্বয়ে অবসাদগ্রস্ত বা লীন হইয়া যায়। সুতরাং সত্যপথে তাহাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয় না।

প্রত্যেক কোষগুলি পরলোকের প্রত্যেক স্তরের সহিত সম্বন্ধ রাখে। এই বিশ্বে মহামায়ার চমৎকার বিন্যাস ব্যবস্থা। তাহার স্বরূপ এই ভূলোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে আমরা অন্নময় কোষের স্থূল জড়াংশে নির্ম্মিত যাহা দেখিতে পাই, মৃত্যুর পর ভূবর্লোকে গিয়া আমাদের এই স্থূল শরীর দেখা যায় না বটে, কিন্তু ইহার ভিতর ঠিক অনুরূপ আমাদের যে সূক্ষ্ম শরীর রহিয়াছে, তাহাকে ভূবর্লোকবাসী দেখিতে পান। কারণ এই স্থূল জড়াংশের মধ্যে, ভূবর্লোক-সুলভ জড়াংশ বিদ্যমান। পুনঃ, স্বর্লোকবাসী, ভূঃ বা ভূবর্লোকের জড়াংশের মধ্যে, স্বর্লোকসুলভ জড়াংশ যাহা বিদ্যমান, স্বর্লোকবাসী সেই শরীরকেই দেখিতে পান। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ভূর্লোক হইতে তপোলোক পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে স্থূল সূক্ষ্মের প্রভেদ অনুভূত হয়।

ভৌতিক পরমাণুপুঞ্জ, স্তরে স্তরে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অতি সূক্ষ্মতম হইতে থাকে এবং তাহা পরপর লঘু ও উজ্জ্বল হইতে অন্নময় কোষ হইতে হিরণ্ময় কোষ পর্য্যন্ত অন্তর্জগতের সহিত এই ভৌতিক জগৎ যেন নিত্য সম্বন্ধ লইয়া গাঁথা।

ভূলোকের স্থূল জড়াংশের নিবিড় বিন্যস্ত পরমাণুপুঞ্জ আমাদের এই স্থূল দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়। সূক্ষ্ম জড়াংশে আমাদের দৃষ্টি চলে না। ভূবর্লোকবাসীরাও স্বর্গলোকবাসীকে দেখিতে পায় না; স্বর্গলোক-বাসী মহর্লোকবাসীকে দেখিতে পান না। কিন্তু মহর্লোকবাসী, স্বর্গলোকবাসীকে দেখিতে পান। ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের নিকট প্রকট হইতেও পারেন। সংযতব্রত মানব সাধনার দ্বারা জীবনের ক্রমোন্নতি বিকাশ করিতে পারিলে, উর্দ্ধরাজ্যে গমনহেতু অবস্থান্তর প্রাপ্তি লাভ করিয়া, সত্যলোকে গিয়া সত্যের সহিত মিলিত হইতে পারেন। এই সত্যের মিলনে জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য দুই এক হইয়া যায়, দ্বৈতভাব থাকে না।

এখানে প্রশ্ন উঠে, এই মিলনের উত্তম পন্থা কি? মানব স্থূল-দেহী, সুতরাং একটা অনির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর মধ্যে তাহাকে থাকিতে হয়। সন্তাপ, পীড়া, ক্লেশ, অস্মিতা, অসন্তোষ প্রভৃতি অশুভের মধ্য দিয়া তাহাকে পাইতে হইবে সেই সত্যস্বরূপ পরম বিজ্ঞানময় পরম পুরুষকে। এখানে বই পড়া জ্ঞান লইয়া, তার্কিক সাজিয়া, মায়ার কুহেলিকা কণ্ঠস্থ করিয়া বা শূন্যবাদ লইয়া, অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা, ঈশ্বর মায়াশক্তির উপাধিবিশিষ্ট সুতরাং মিথ্যা, এই জ্ঞানগর্ব্বিত উপদেশ দান করিয়া, বড় বড় কথার বিদ্যাসাগর হইয়া, সংসারে পরম জ্ঞানী হইয়া সাধকের ভান করিলে, এবং অন্তরে বিষয় মোহ সজাগ রাখিয়া, শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া, রাম নামও করিব আর কাপড়ও গুটাইব, ইহাতে জীবনে যথার্থ অধ্যাত্ম জ্ঞানের সম্যক উৎকর্ষ বা উপলব্ধি অথবা জ্ঞান হওয়া দুঃসাধ্য।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি শ্রুত্বা।' শ্রুতিতে সত্য, জ্ঞান,

অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। এই সত্যের উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে। বহু জন্ম অতীত হইয়া যায় এই সত্যের উপলব্ধিতে। জগতের নশ্বরতা দেখিয়া অন্তরে বিবেক বৈরাগ্যের উদ্ভব হইলে, যদি সুকৃতির ফলে, ত্যাগ দেখা দেয়, দ্বৈধজ্ঞান তিরোহিত হইয়া সাম্যভাবের উদয় হয়, পরমেশ্বরের উপর শ্রদ্ধা ও প্রেমের তীব্র অনুরাগ দেখা দেয়, অর্থাৎ মন ও চিত্ত নির্বিষয় হইলে, সত্যের সান্নিধ্য বাড়িবে, মৃত্যুর পর তখন ঊর্দ্ধরাজ্যে গতি হইবে। তাহা এক জন্মেই হউক আর বহু জন্মেই হউক, ক্রমশঃ জীবনে কল্যাণ নিশ্চয়ই দেখা দিবে।

সত্য চিন্তার প্রথমেই এই স্থূল জগতের এমন একটি নির্ব্যূঢ় সত্যের চিন্তায় চিত্তকে ভরিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে বিবেকের আবির্ভাব অর্থাৎ অন্তরের সমচিত্ত অবস্থা এবং ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ পাইবে। সেইটি হইল 'মৃত্যু'।

এই অসংশয় সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া গাঢ় ভাবে তৎবিষয়ে শরীরের পরিবর্ত্তন ও জীবনের পরিণাম চিন্তা করিলেই পরমার্থ সত্য চিন্তার সূত্রপাত হইবে। সাধকের সাধনার প্রথম অবলম্বন এই মৃত্যু-চিন্তা। যিনি মৃত্যু-চিন্তা করিতে সমর্থ, তিনি সংসারে থাকিয়াও অন্তরে উদাসীন। পরবর্ত্তীকালে তিনিই প্রকৃত সাধক হইয়া উঠেন। মৃত্যু-চিন্তা সজাগ রাখিয়া জীবনের নশ্বরতা অনুধাবন করিতে করিতে যতই চিন্তার উৎকর্য হইবে, ততই জগতের অনিত্যতা চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইবে। তখন মায়ার প্রহেলিকার সমাধান আপনা হইতেই সম্ভব হইবে। আত্মচিন্তাই তখন তাঁহার প্রেয় ও শ্রেয় হইবে। অহঙ্কার-রহিত অবস্থা লাভ করিয়া সর্ব্বদা আত্মচিন্তাই তাঁহার ভাল লাগিবে। সুখ-দুঃখ, হর্ষ বিষাদের ভাব তিরোহিত হইয়া সহনশীলতা দেখা দিবে। কোন বিষয়তৃষ্ণাই তাঁহার থাকিবে না। তিতিক্ষার উদয় হইবে। ক্রমশঃ ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিবে। 'মৃত্যু'-সদৃশ সত্যের চিন্তায়, পরিশেষে যথার্থ সত্য লাভ হইবে।

সংসারে মূর্খ ও বিদ্বান, ধনী ও দরিদ্রের পরিণাম একই প্রকার; যথা—মৃত্যু। জন্মের পর হইতেই সকলে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, লোকে জিজ্ঞাসা করেন, 'শরীরে কুশলং তব?' অর্থাৎ তোমার শারীরিক মঙ্গল ত? যিনি মৃত্যু-চিন্তা করেন তিনি উত্তর দেন, 'কুতঃ কুশলমস্মাকং আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।' আমাদের মঙ্গল কোথায়, দিন দিন ত আমাদের আয়ুক্ষয় হইয়া যাইতেছে। কয়জন এই কথা জ্ঞানমত বুঝেন? অনেক বিষয়ভোগী মুগ্ধমন ইহাতে ধ্যানই দেন না। সকলের পক্ষে মৃত্যু যে অতি সত্য, তাহা চিন্তা করিবার মত অবসর কাহারও নাই। যে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, বা করা যায় না, তাহার দিকে দৃষ্টি না দেওয়া, একটা বিশেষ অপরাধ। সেই অপরাধের দণ্ড পরলোকে পাইতেই হয়।

এই সত্য স্বরূপ মৃত্যু-চিন্তা হইতে, উচ্চস্তরের শিক্ষিত সংসারী ব্যক্তিরাও দূরে থাকিতে চান; তাঁহারা মনে করেন মৃত্যু যেন একটা অভিশাপ। ইহা চিন্তা না করাই ভাল, ইহার মর্ম্মকথা এই, বিষয়-মত্ততা ও ভোগস্পৃহা। সম্পদ ভোগের কাল, মানব জীবনে যে অতি অল্প সময় মাত্র, তাহা বোধের মধ্যে আসা উচিত। বাল্য ও বার্দ্ধক্য বাদ দিলে সময় কতটুকু থাকে! তাহাতে অমর সাজিয়া ভবের রঙ্গমঞ্চে বিষয়াত্মক অভিনয় করা কোন মতেই শ্রেয়ঃ নয়। ভয়ঙ্কর মৃত্যু সকলের শিয়রে ঘুরিতেছে, আর আমরা অমর সাজিয়া, মৃত্যু-চিন্তাকে উপেক্ষা করিয়া, চিরায়ুঃ ভাবে সংসারে মত্ত। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি আছে!

বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন সংসারে আশ্চর্য্য কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন ঃ—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম ॥

'প্রত্যহ জীবগণ যমালয়ে গমন করিতেছে, কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট

আছে তাহারা নিজেকে অমর মনে করিতেছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি হইতে পারে।'

সত্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। একটি ব্যবহারিক সত্য, একটি সংবৃত সত্য, আর একটি পরমার্থ সত্য। 'ব্যবহারিক' সত্যে মানবীয় ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য কথায় আছে, 'ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে'। সুনীতি পূর্ব্বক সংসার নির্ব্বাহের জন্য সত্যানুষ্ঠান করা হয়। যেমন সত্যকথা বলা, স্বার্থানুরোধে প্রকৃত সত্য গোপন না করা, জ্ঞানমত অসত্যের পক্ষাবলম্বন না করা, ইত্যাদি হইতেছে ব্যবহারিক সত্য।

'সংবৃত' সত্য অর্থাৎ স্থূলের মধ্যে যে গোপন দৃঢ় সত্য। পরিবর্ত্তনশীল স্বপ্নবৎ বিষয়বস্তুই পরিবর্ত্তনরূপ সত্য। ম্লান বুদ্ধি দ্বারা ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিয়ত যে রূপান্তর দেখিতে পাই, সেই সত্যের উপলব্ধি করা। অথবা পরিবর্ত্তনেও যে সত্য থাকে; বালক বৃদ্ধ হইলে যে অভাবনীয় রূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহাতে নামের পরিবর্ত্তন বা ব্যক্তির পরিবর্ত্তন হয় না, ইহাই সংবৃত সত্য। স্থূলের মধ্যে মৃত্যুর ন্যায় ধ্রুব সত্য আর নাই।

আর শুদ্ধ বুদ্ধির অগোচরে সৎ চিৎ-আনন্দ স্বরূপ যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিরাজ করিতেছেন তাহাই 'পরমার্থ' সত্য।

সত্য চিন্তা দ্বারা পরমার্থ সত্যের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে ব্যবহারিক সত্য, তৎসঙ্গে সংবৃত সত্য দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। ব্যবহারিক সত্যের সহিত মৃত্যু-চিন্তা অন্তরে জাগিলে, উদাসীন ভাব আইসে, এবং ভোগস্পৃহা শিথিল হইয়া যায়। তৎকালে ব্যবহারিক সত্যকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার সাহস দেখা দেয়; অন্তরে বিবেকের জাগরণে মানব সত্যচিন্তায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। যথার্থ বিবেকীর অন্তরে সত্য স্বরূপ ভগবৎচিন্তনে কালে এক প্রকার আবেশের ভাব উদয় হইয়া থাকে। তখন ধীরে ধীরে মন নিরাবলম্ব ও তটস্থ হইয়া পরমার্থ সত্যের অপূর্ব্ব জ্যোতি দর্শনে জড়তাহীন স্ফূর্ত্তি

উপলব্ধি করিয়া থাকে। এবং যথাকালে নিরবয়ব ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভূতি লাভ ঘটে। এই জ্ঞানলাভের ফলে প্রেতভাব অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর গ্রহণের নিদারুণ ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। সত্যলোকে স্থিতিলাভ জনিত, জন্ম মৃত্যু জরার অতীত হইয়া বিমল সচ্চিদানন্দে পরমার্থ সত্যের জ্ঞানে বিভোর হইয়া তৎস্বরূপ হইয়া যায়। সুতরাং সত্য চিন্তায় জীবনের পরম কল্যাণ হয়।

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যংহি পরমং তপঃ।
সত্য মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪র্থ ৭৭।

'সত্যই পরম ব্রহ্ম ও সত্যই প্রধান তপস্যা, জগতের মূলে সত্য ক্রিয়া সকলের ভিতর বর্ত্তমান, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই।'

জনৈক সাধকের রচিত গীত

"মন চল নিজ নিকেতনে,
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।

বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ
সব তোর পর কেহ নয় আপন
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন
ভুলিছ আপন জনে।

সত্য পথে মন করো আরোহণ
প্রেমের আলো জ্বালি রাখ অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন
গোপনে অতি যতনে।

সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম
শ্রান্ত হলে তথায় লভিও বিশ্রাম
পথভ্রান্ত হলে সুধাইও পথ
সে পান্থ নিবাসী জনে।

লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ
পথিকের করে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন
পরম যতনে রাখিও প্রহরী
শম দম দুই জনে।

পথে যদি দেখ ভয়েরি আকার
প্রাণপণে দিও দোহাই সে রাজার
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ
শমন ডরে (যাঁর) শাসনে।"
মন চল নিজ...

যৌবন কাল জীবনের উত্থান-পতন কেন্দ্র

কামনার বিনিবৃত্তির নামই সংযম। শুধু ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেই সংযম হয় না। নিয়মিত-চিত্ত বা স্থিরমনা ব্যক্তিই যথার্থ সংযমী।

সংযমের অভাবে দুঃখময় জীবন দেখা দেয়

কামনা বহুরূপী হইয়া সম্মুখে দেখা দেয়। তাহার যে কোন রূপে মুগ্ধ হইলেই সংযমের ব্যাঘাত ঘটিবে। সংযমের অভাবেই আসক্তি দেখা দিয়া থাকে। আর আসক্তি হইতেই সংরম্ভের উৎপত্তি। সংরম্ভ অর্থাৎ ক্রোধ, আক্রোশ, সম্ভ্রম, গর্ব্ব ইত্যাদি। ইহাতে মানব যথার্থ জ্ঞান চৈতন্য হারাইয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বে হতবুদ্ধি হইয়া অভিভূত অবস্থায় বিচারহীন জড়িমা লইয়া জীবনের শেষে সন্তাপ অর্জ্জন করিয়া থাকে। তাঁহারা বোধের অভাবে বুঝিতে পারেন না, জীবন-তরী কোন্ প্রতিকূল পথে চলিয়াছে।

মৃত্যুর পর মানবের বোধশক্তি অন্যরূপ হয়। তৎকালে স্থূল ইহজগতের সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায় বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। চিত্তে অদৃশ্য কালিতে লিখিত ইহজীবনের ঘটনা তখন তাহার নিকট স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। পরলোকে গিয়া তখনই তিনি জানিতে পারেন, ইহজীবনের কর্ত্তব্যের ভুল। আশা, আকাঙ্ক্ষা লইয়া পর জীবনে 'ভূবর্লোকে' গিয়া অসংযমীদের স্তরে আবদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ক্লেশকর মানসিক যাতনা পান। যথাকালে যখন 'ভূর্লোকে' পুনরাবৃত্তি হয়, তখন প্রাক্তনের বোঝা অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম দুর্গতি যেন বিধি নির্ব্বন্ধ অদৃষ্টরূপে নবীন জীবনের অনুগামী হয়। পূর্ব্বজন্মে ভাগ্যবানের গৃহে বহু সুযোগের মধ্যে থাকিয়াও যাঁহারা অসংযমী ছিলেন, দুষ্ট বাসনার দাস থাকায় তাঁহারাই পরজন্মে সম্পদহীন সুযোগহীন হইয়া কেবল দুঃসহ দুঃখের সম্মুখীন হইয়া থাকেন। বহু বিঘ্ন সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের সুখ শান্তি ব্যাহত করে। এই মরুময় অপূর্ণ জীবন পূর্ব্বজন্মকৃত সংযমের অভাবেই ঘটিয়া থাকে। সংসারে সুখ-দুঃখের কারণ ইহাই।

অশুভ পথ অবলম্বন করিলে, ধীরে ধীরে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিবার রাস্তা নিজে নিজেই সৃষ্টি করেন। তাহার পর পরিবেদনা দেখা দেয় প্রৌঢ়ত্বে বা বৃদ্ধাবস্থায় অথবা পরকালে। এই এষণা-প্রিয় ব্যক্তি, দুঃখ-কষ্টে নিষ্পেষিত হইয়া শেষে ভগবানকে দোষ দিয়া থাকেন। অথবা সেই অস্থিরচেতা ব্যক্তি ভগবৎ চিন্তন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ শান্তি পান।

'নাস্তি'—ন-অস্তি; যিনি কোন বিষয়ের অস্তিত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানতা স্বীকার করেন না, তিনি নাস্তিক। নাস্তিকগণ পরলোকও মানেন না, পরমেশ্বরও মানেন না। পরন্তু তিনি নিজের অস্তিত্ব মানেন। তাঁহার ভিতর আমি-রূপী যে জীবাত্মা আছেন তাহা বাক্যে প্রকাশ করেন ও সমর্থন করেন। যদিও তিনি অহংতত্ত্বের অনুশীলনে অনিচ্ছুক তথাপি আমার হাত, আমার পা, আমার মন, আমার বুদ্ধি, বলিতে অস্বীকার করেন না। এই অধঃপতিত আস্তিক যখন দুরিত অবস্থায় নাস্তিক সাজেন তখন পরমেশ্বর ও পরলোকের কথায় পঞ্চমুখ হইয়া, চার্ব্বাক বা নাস্তিকের মত অবিশ্বাসের বুলি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। এ কেবল আধ্যাত্মিক জড়তা ও সংস্কারের দুর্ব্বলতা। ইহাতে মানব যুক্তিহীন তর্কবাগীশ হইয়া যায় এবং মানবতা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া ক্রমশঃ জীবনের প্রতিকূল পথে মনের গতি হয়।

ম্লান বুদ্ধি ও সঙ্গ-দোষ নাস্তিকতার কারণ

স্খলিত মানব, মোহান্ধ, মূর্খ, নীচ ও অসভ্যের সহিত প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সঙ্গ করিয়া, সেই বন্ধুদের জঘন্য তড়িতের সংস্পর্শে আসিলে, ম্লান বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন। লৌহ যেরূপ তড়িৎ সংসর্গে চুম্বক-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, ইহাও প্রায় তদ্রূপ। যতদিন না পরম তত্ত্বে পরিপূর্ণ জ্ঞান হয়, ততদিন সঙ্গদোষ মানবের পতনের কারণ হয়; অবিদ্যাসেবী অনভিজ্ঞ প্রত্যয়হীন ব্যক্তি, তমোগুণাত্মক অতি নিম্নস্তরের আনন্দে সাধারণতঃ মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই পৃথিবীতে ব্যসনানন্দের পরিণাম বড়ই কষ্টদায়ক। যৌবনেই ইহার মোড়

ফিরাইতে হয়, তাহাতে জীবনে আশঙ্কা থাকে না। নচেৎ মৃত্যুর পর যখন তাঁহার আত্মিক প্রেতলোকে যায়, তখন অতীব নিরানন্দে ও ভীতিজনক ভাবে সময় কাটে।

এ জগতে যাঁহারা পরমানন্দ লাভের চেষ্টায়, পরম তত্ত্বে যত্নশীল, তাঁহারা অন্তরে ত্যাগ লইয়া, ভোগ্য বস্তুর ভোগে বিহ্বল না হইয়া, বিশ্বাসের সহিত সত্যপথ অবলম্বন করেন। পরবর্ত্তীকালে সেই মতিমান্ ব্যক্তি সূক্ষ্মদর্শী হইয়া পরমানন্দ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহলোকের ন্যায় পরলোক যে সত্য, তিনি তাঁহার জ্ঞান-চক্ষে অনুভব করেন।

সঙ্গদোষ-জনিত যিনি মতিভ্রংশ, নাস্তিক অবস্থায় স্থিত, এইকথা তিনি সহজে বুঝিতে পারিবেন না, ঈশ্বর ও পরলোক আছে, কারণ তাহার বোধশক্তি অতি কম। যদি কোন বালককে মিশ্র গণিতের জটিল সমস্যা বুঝান যায়, স্থূলবুদ্ধি বালক যেমন তাহা বুঝিতে অক্ষম হয়, নাস্তিকেরও সেই দশা। বালক বুঝিতে না পরিয়া গণিতের সত্য বিষয়টিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে, যেরূপ জমাট বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়; ইহকাল সর্ব্বস্ব-মোহান্ধ নাস্তিক ব্যক্তিও পরকাল নাই বলিয়া তদ্রূপ উপহাস করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ কারণ যৌবনে গোপনভাবে অসৎপথে থাকিয়া, ভগবৎ চিন্তার অবহেলা করায় অবিশ্বাসের অন্ধকারে তাহার মস্তিষ্ক ভরিয়া যায়, অনুসন্ধানাত্মিকা চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়, এবং নীচ অবদ্য সঙ্গীদের অপবিত্র তড়িৎ সংস্পর্শ-জনিত ম্লান বুদ্ধির অপটুতায়, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অবনতি বা বিক্লব অবস্থা উপস্থিত হয়। সুতরাং যৌবন কাল সতর্ক চালিত না হইলে প্রায়ই মানবীয় প্রকৃতি ধ্বংস হয় ও নাস্তিকতা দেখা দিয়া থাকে। নাস্তিক ব্যক্তির মন উন্মার্গগামী হয়, এবং আত্মম্ভরিতা দেখা দেয়। জীবন বিকাশের সন্ধিক্ষণে যাহারা অপবিত্র ভাব পরিহার করিয়া পূত জীবন বাঞ্ছা করেন, তাহারাই পরিণামে ভবাব্ধিকূলে উঠিয়া শান্তি ও স্বস্তি পান। পবিত্র ও অপবিত্র জীবনের তারতম্য পরপারে

গিয়া মানব ভালভাবেই অনুভব করেন। তখন জীবনে ভুলের জন্য অনুশোচনা দেখা দেয়। অতএব অন্তরে নাস্তিকতার প্রতিষ্ঠা সঙ্গত নহে, আতঙ্কজনক।

উত্তম মানবীয় প্রকৃতি সদ্‌গ্রন্থ পাঠে ও সৎসঙ্গে হয়

সদ্‌গ্রন্থ অর্থে যে গ্রন্থ পাঠে মানব চিত্ত নির্ম্মল বিশুদ্ধভাব লইয়া, ভগবৎ চিন্তনের অনুরাগী হয়। পরিশুদ্ধ মন সতত শত কর্ম্মের মধ্যেও আকাঙ্ক্ষা করে সেই পরম পিতার চিন্তা। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে এই লাভ হয় যে, শুদ্ধ প্রেমের উদয় হইয়া, জীবে সেবা করিতে প্রাণ চায়। যদি যথার্থ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করা যায়, তাহা হইলে কামনা বাসনার শুভাশুভ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়। মায়ার প্রহেলী কি—উহাতে অভিভূত হইলে তাহার পরিণাম কি—ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞান হয়।

মর্ত্ত্যবাসিগণের মধ্যে অনেকে ইন্দ্রিয়সুখ লালসায় পারলৌকিক জীবনের ভালমন্দ চিন্তা কমই করেন। পরন্তু অনিত্য চিন্তার দাস হইয়া থাকা, স্বার্থপরতার পথে চলা, ঠিক মানব জীবন নহে; এবং মানবীয় ধর্ম্মও নহে। ইহাকে বলে জীবনের উপর এক প্রকার ব্যভিচার, ইহা মতিচ্ছন্ন ব্যলীক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের জীবনের প্রতিকূল পথে অসঙ্কল্পিত যাত্রা।

পবিত্র জীবন গঠনের জন্য গ্রন্থ পাঠের বিশেষ আবশ্যক আছে। ভাষা শিক্ষার পর যৌবনে অবিদিত বিষয়ের জ্ঞান লইবার জন্য বহু প্রকারের গ্রন্থই লোকে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি যাঁহাদের থাকে, তাঁহাদের রুচি হয় সদগ্রন্থের উপরেই বেশী। এবং যাঁহারা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহাদেরই অন্তরে সাধুসঙ্গ করিবার আকুল ইচ্ছা বা অভিলাষ জাগে। তখন তাঁহারা যোগপরায়ণ সিদ্ধ গুরু বা আচার্য্যের অনুসন্ধানে ও দর্শন লাভে চেষ্টা করেন। আচার্য্য অর্থে বেদের অধ্যাপক, উচ্চবিদ্যার শিক্ষক। শাস্ত্রে আচার্য্যের লক্ষণ আছে:—

আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং, আচারে স্থাপয়েৎ পুনঃ।
স্বয়ং আচরতে যস্মাদাস্তেনাচার্য্য চোচ্যতে।

'যিনি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে শাস্ত্রের প্রকৃত সাধু উদ্দেশ্যমূলক শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করেন, এবং স্বয়ং তাহা আচরণ করেন তিনিই আচার্য্য।'

আচার্য্য যুক্তিপূর্ণ পরাৎপর তত্ত্বকথা বাক্যের দ্বারা ও তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মানব মনের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। আচার্য্যের অনুকম্পা লাভে মানব কৃতাত্মা হইয়া, যখন মৃত্যুর পরপারে যান, তখন অপার্থিব জীবনের চঞ্চলতা আদৌ থাকে না। উদ্বেগশূন্য বিশ্রাম অনুভব করেন।

সমাধি অবস্থায় দেহত্যাগকারী এক যোগীর আত্মিক আমার চক্রে আসিয়া উপরোক্ত কথাই বলিয়াছিলেন। পুরুলিয়ায় হরিপদ দাঁর রোডে এক বিশিষ্ট অধ্যাপকের বাটীতে, একটি চক্রে মদনমোহন তেওয়ারি মিডিয়ম হন, তাঁহার উপর উক্ত যোগীর আত্মিক প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মানব জীবনের লক্ষ্য কি, তাহা সৎসঙ্গে ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠে স্থির করিয়া, তাহাতে সঙ্কল্প দৃঢ় হইলে উন্নত জীবন লাভে সমর্থ হওয়া যায়। ইহলোকে স্থিতধী হইতে যত্ন না লইলে, পরলোকের অবস্থা বড় দুঃখার্ত্ত হইয়া থাকে। অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা ব্যবহারিক জীবনে সম্মান লাভের নেশায়, বিষয়ের মোহে অহরহঃ মাতিয়া থাকায়, ইহ-জীবনে যে সুখলাভ ঘটে, তাহা ক্ষণিক। এই সুখের পশ্চাতে পার-লৌকিক জীবনে অস্বস্তিকর দারুণ দুঃখ দেখা দেয়। ত্যাগ ব্যতিরেকে শান্তিলাভ করা যায় না। সুতরাং মানবীয় ধর্ম্ম পালনে অবহেলা করিয়া ত্যাগ, তপস্যা, জনসেবা হইতে মনকে পৃথক রাখিলে, মৃত্যুর পর বিষয়ী মানব, ভুবর্লোকে গিয়া কষ্টদায়ক অসহায় অবস্থায় চিন্তা করেন, আমি রিক্ত কপর্দ্দক শূন্য। ইহলোকে যদি অকস্মাৎ কেহ রিক্ত কপর্দ্দক শূন্য হইয়া যান, তিনি যেমন পরিতাপানলে সংসার জীবনে

দগ্ধ হন ও নিদারুণ চিন্তাগ্রস্ত হন, মৃত্যুর পর বিষয়-বিহ্বল ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক মানসিক শান্তি ভোগ করেন, যেহেতু পরলোকে প্রতিকারের কোন উপায় নাই।

বিষয়সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এই স্থূল ইন্দ্রিয় যখন ক্ষণস্থায়ী, তখন সেই ইন্দ্রিয়সুখও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাহাতে মাতিয়া থাকা একটা মস্ত বড় ভুল এবং সেই ভুল পথে চলিলেই দণ্ড ভোগ করিতে হয়। যাহাদের বিষয় বিমুগ্ধ মন, তাহারা শুভ সঙ্কল্প হইতে দূরে থাকিয়া, অহং বুদ্ধি লইয়া খেলা করেন। ভোগাসক্তির পরিণাম প্রায় সকলটাই দুঃখজনক, সুখ অতি অল্প। সুখ দুঃখ চক্রবৎ একের পিছনে আর একটি দেখা দিতেছে। এই সুখ দুঃখ হইতে চিত্তে যে সংস্কার জন্মে, তাহাই পরকালে দুঃখের কারণ হয়। মৃত্যুকালে চিত্তনদী হইতে স্মৃতি প্রবাহ বাহির হইয়া বহু ঘটনা মনের নিকট আসিতে থাকে, তাহাতে মন ভীষণ চঞ্চল হইয়া উঠে। আত্মীয়গণ 'গুরুনারায়ণ ব্রহ্ম' বলিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন মৃত্যুমুখী ভোগীব্যক্তি বলেন 'অতকথা বল্‌তে পারিনিরে বাবা'। অতএব যৌবন হইতে অভ্যাস না রাখিলে, তন্ময় ভাবে ব্রহ্ম-নাম মুখে বলা যায় না। কারণ ঘোর বিষয়ী মানব সত্য হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তাহাদের বিষয়ে আশয় থাকায় বিচার বুদ্ধি সগুণ ভাবে স্থিতিলাভ করে। তাহার পরিণাম হয় বিবেক বৈরাগ্য জড়তা প্রাপ্ত হইয়া ইতি কর্ত্তব্যতা জ্ঞানশূন্য অর্থাৎ ব্যাকুলভাবে সংশয় লইয়া প্রমায়ুক ব্যক্তি প্রমাদ গণিয়া থাকেন।

সত্যানুসন্ধানের পথে যাত্রা করিতে হয় যৌবন কাল হইতে। তখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্ম্মল মনের গতি যদি কুপথ ত্যাগ করিয়া পরমানন্দ লাভের আশায় অনুরক্ত হয়, তৎকালে তত্ত্বানুসন্ধানীর নিকট সঙ্কল্প বিকল্পের কুহেলিকা, মনকে ব্যাকুল করিয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না। কিছুকাল পবিত্র অন্তঃকরণ যাপন করিবার পর, ভ্রান্তি দেখা দিলেও সময়ে অনুতাপানলে সেই তরল ভ্রান্তি নষ্ট হইয়া যায়; এবং

যথাকালে শুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য নিত্য বস্তুতে তন্ময়তা আনিয়া দিবেই। তৎকালে চিত্তবৃত্তি আয়ত্তে রাখা বিশেষ অসম্ভব হইবে না। যৌবন হইতে প্রৌঢ়ত্বের শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা সত্য পথের পূজারী হন এবং মানবীয় প্রকৃতিতে থাকেন, তাঁহাদের পতন অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ সময় সময় মনের সামান্য চঞ্চলতার জন্য সংযমের ব্যাঘাত ঘটে। সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত জীবনের সন্ধিক্ষণ এই যৌবন কাল। তৎকালে সতর্ক থাকিতে না পারিলে, বিপাকের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া, পরকালে দুর্গতি ভোগ সুনিশ্চিত। অতএব সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া জীবনের অনুকূল পথে যৌবন হইতে যাত্রা করাই বিধেয়। ইহাতে জীবনের শেষে পরম শান্তি আসে ও পরকালে পরিপূর্ণ স্বস্তি প্রাপ্তি হয়। যদি বিদেহ কৈবল্যের অভাব বশতঃ কর্ম্মফেরে পড়িয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-জনিত তিনি উত্তম অভীষ্ট স্থান লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ভাইরে,—

"নলিনীদলগত জলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

'পদ্মপত্রস্থিত জল যেমন অতি চঞ্চল, জীবের জীবনও সেইরূপ চঞ্চল। সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গই ভবাব্ধি পারের নৌকা স্বরূপ।'

ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে চরক সংহিতায় উল্লেখ আছে—

(সূত্রস্থানম্ একাদশোঽধ্যায়ঃ)

ইহ খলু পুরুষেণানুপহত সত্ত্বুদ্ধি পৌরুষ পরাক্রমেণ হিতমিহ চামুষ্মিংশ্চ লোকে সমনুপশ্যতা তিস্রঃ এষণাঃ পর্য্যেষ্টব্যা ভবন্তি। তদ্‌যথাঃ—প্রাণৈষণা ধনৈষণা পরলোকৈষণেতি ॥

'ইহ সংসারে যে পুরুষের মন, বুদ্ধি পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত, যিনি সমভাবে ইহলোক পরলোক উভয় লোকের হিতকামনা করিয়া থাকেন, তাঁহার এই তিনটি বিষয় সর্ব্বতোভাবে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। যথা—প্রাণ, ধন ও পরলোক।'

॥ ৫ম স্তবক ॥

আত্মায় বিয়োগে শোকাভিভূত হয় কেন

শোক অর্থে, প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুতে বিহ্বল হওয়া; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ় ও বড় শোক; ক্ষয়, ক্ষতি, নিষ্ফল পরিশ্রম-জনিত অথবা প্রবল দুঃখাদির জন্য চিত্তের বিকলতা বা মনোহত হওয়াও একপ্রকার তরল শোক।

যদি আমরা ধীর স্থিরভাবে সত্ত্ব বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া চিন্তা করি তাহা হইলে এই সংসারকে একটি পান্থ-নিবাস ছাড়া আর কিছুই মনে হইবে না। তীর্থযাত্রার পথে সাধারণ পান্থ-নিবাসে যখন আমরা পৌঁছাই, তখন দেখি কেহ প্রথমে, কেহ বা পশ্চাৎ আশ্রয় লইয়াছি। যখন পথিকের সঙ্গে পথিকের দেখা হয়, তখন পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়; আবার সময়ে সময়ে বহু বিষয়ের আলোচনাও হইয়া থাকে। সেই পান্থ-নিবাসে যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা থাকেন, সময় হইলেই চলিয়া যান। তজ্জন্য কেহ অনুশোচনা করে না। কিন্তু এই সংসাররূপ পান্থ-নিবাস হইতে যদি কেহ পরলোকের পথে যাত্রা করেন, তাহাতে শোকাভিভূত হইবার বিশেষ কারণ কি? এই সংসাররূপ পান্থ-নিবাসে কেহ ত চিরকাল থাকিবার জন্য আসি নাই। তীর্থযাত্রীর মত কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা না করিয়া সময় আসিলে চলিয়া যাই। ইহাতে চিত্তের বিকলতা বা এত মনস্তাপ কিসের?

আমরা পথিক হইলেও বিঘ্নসঙ্কুল পার্থিব জীবনের দুর্গম যাত্রা-পথের বিষয় লইয়া এই সংসারে কোন দিনই পথিকের সঙ্গে পথিকের ন্যায় গভীরভাবে আলোচনা করি না। যদি আমরা এই সংসার পান্থ-নিবাসে সকলে পরস্পরের মধ্যে, গর্ভবাস হইতে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়কাল ও বৃদ্ধাবস্থার বিষয় লইয়া প্রগাঢ় চর্চ্চাকরিতাম, তাহা হইলে জ্ঞানমত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম প্রতি মুহূর্ত্তে মরণ বা পরিবর্ত্তন ক্রিয়া আমাদের উপর চলিতেছে। জীবনের যাত্রাপথে কে কতদূর চলিয়াছি, কতবার এই শরীর ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছে, যেমন বাল্যের শরীর ধ্বংস হইয়াছে যৌবনাগমে, তাহার পর বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত কতবার মরিয়াছি, এবং কে কি কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা চিন্তা করিয়া হর্ষ বিষাদে মগ্ন হইতাম। আরও বোধ হইত সঞ্চয়ের ঝুলিতে কে কত সঞ্চয় করিয়া অথবা দুঃখের বোঝা বহিয়া চলিয়াছি। পথিকের সঞ্চয় করা যেরূপ বহু বিঘ্নের কারণ, বিপদ তাহার পদে পদে দেখা দিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের জীবন যাত্রার পথে সঞ্চয়ের নেশা ও বাসনা বহু আপদের হেতু।

অনেকের ধারণা মৃত্যু কেবল দুঃখের কারণ। কিন্তু তাহা নয়, সুখ দুঃখ দুইয়েরই হেতু। যেখানে অনাসক্তি সেখানে মৃত্যু সুখ ও আনন্দ দিয়া থাকে ; এবং দুঃখ পাই কেবল অনুরাগ, মিত্রতা ও স্নেহে মুগ্ধ থাকার জন্য। এই যে মমত্ব তাহা মায়ার খেলা মাত্র ; সুতরাং বাস্তবতারহিত এই সুখদুঃখের অনুভূতির কারণ ইহা দোলায়মান অন্তরের অনুকূল অথবা প্রতিকূল ভাবের কার্য্য। যেমন মৃত ব্যক্তির শত্রুমিত্র যদি দুই থাকে, তাহা হইলে শত্রু হাসিবে, মিত্র কাঁদিবে। সুতরাং মৃত্যু যে কেবল শোকের কারণ তাহা প্রমাণ হয় না।

এই সংসারে দেখা যায় যে, পার্থিব জীবনের শেষে যখন বিদায়ের দিন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কতকগুলি কাঁদিবার লোক থাকে। যাঁহারা কাঁদেন বা শোক প্রকাশ করেন, তাঁহারা জ্ঞান মত কাঁদেন, না অজ্ঞানতঃ কাঁদেন? এই পার্থিব জীবনে স্বার্থ লইয়া যতকিছু

ভৌতিক পদার্থে আমরা যত্ন লই, আমার আমার করি, বিয়োগে শোক-কাতর হই, দেখা যায় ইহার পরিণাম নিষ্ফল ও দুঃখময়ই থাকে ; অতএব ইহা জ্ঞানমত কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। তবে কি, আমাদের অশান্ত দুঃখময় জীবনের উৎক্রমণ দেখিয়া, আত্মীয়গণ পরলোকবাসী আত্মিকের পরিণাম ভাবিয়া শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিয়া উঠেন ? না স্বার্থ লইয়া ? মনের নিকট এই বিয়োগজনিত শোকের জটিল প্রশ্ন তুলিলে, উত্তর আসে—কি যেন অজানা দুঃখের অকস্মাৎ আঘাত। তৎকালে অন্তরে বিবেকের তরল আবেশে এই নশ্বর জীবনের পরিণামের ইঙ্গিত দেয় বটে, কিন্তু তাহাতে মুগ্ধকরী মায়া সম্যক্ স্থায়ী উপলব্ধির অভাব আনিয়া দেয়। আবার অন্যদিকে অন্তরে জন্মান্তরীণ সংস্কারের আবছায়া প্রতিবিম্ব দিয়া জানায়, আমাদের জীবনের পরিণাম বহুবার এইরূপ হইয়াছে। শোকাভিভূত মানব সেই সময় নিজ অবচেতন মনে আপন ভবিষ্যৎ পরিণাম, এবং বহির্ম্মুখী মনে লোকান্তরগত আত্মীয়ের পরিণাম, এই দুই প্রকার পরিণাম চিন্তার, মিশ্রিত সংঘাতে নিজ পারলৌকিক জীবনের যন্ত্রণাদায়ক পূর্ব্ব সংস্কার বোধ করে, তাহাতে অজ্ঞাতসারে অন্তর ব্যাকুল হয়, তখনই মানব কাঁদিয়া উঠে। বস্তুতঃ যাঁহারা পরলোক চর্চ্চাহীন, মনস্তত্ত্বে অমননশীল ব্যক্তি, তাঁহারাই অবিদ্যাজনিত তত্ত্ব-জ্ঞানের নিরুদ্ধতাবশতঃ অপরত্র শোকাভিভূত হন।

পরম তথ্যানুসন্ধানিগণ সাধনা দ্বারা জগৎ ও জীব সম্বন্ধে বহু অন্তরিত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁহাদের চেতন মনের নিকট অবিদ্যার খেলা ধরা পড়ে। জগৎ শব্দের তাৎপর্য্য তাঁহারা বুঝেন, জগৎ—গম্ + ক্বিপ্, অর্থাৎ অস্থায়ী। সুতরাং অস্থায়ী বস্তুর জন্য বোধশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি কখন শোকাভিভূত হন না। পরন্তু যাহারা অবিদ্যাবিষ্ট তাহারাই অজ্ঞানাধ্যাসবশতঃ জগৎকে স্থায়ী মনে করেন। অধ্যাস অর্থে বস্তু একপ্রকার, জ্ঞান অন্য প্রকার। পদার্থে রূপান্তর বোধ ঘটিলে, সত্য জ্ঞানের অবসাদ হেতু, সংসারে বিয়োগ বা

পরিবর্ত্তন দেখিয়া শোকাভিভূত হন। অথবা দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ অবচেতন মনের সঙ্কেতে বিমোহিত হইয়া, সংসারে অজ্ঞানের খেলা খেলিতে খেলিতে অবিদ্যার ইন্দ্রজালকে সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়, এবং তাহাতে সুখ দুঃখ অনুভব করেন। তজ্জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

মায়া কার্য্যমিদং সর্ব্বং ব্যবহারিকমেবতু।
ইন্দ্রজাল সমং মিথ্যা মায়া মাত্র বিজৃম্ভিতম্ ॥

শান্তিগীতা, ৪।৯

'এই জগৎ জীব ও সমস্ত ব্যবহারিক পদার্থ মায়িক অর্থাৎ মায়ার কার্য্য; ইহা ইন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। কেবল মায়ার লীলা মাত্র।'

যেমন সিনেমার ছায়াপটের দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া, সত্য বলিয়া অনুভব করা। বস্তুতঃ সেটি একটি সাদা পর্দ্দা মাত্র। অভিজ্ঞানের সংস্থিতি বহু পশ্চাতে।

আত্মীয় বিয়োগে আমরা শোকাভিভূত হই; ইহার কারণ আত্মীয় শব্দটির ব্যবহৃত জ্ঞান আমাদের আছে, কিন্তু ব্যবহিত অর্থাৎ অন্তর্নিহিত অর্থ কি, তাহা আমরা অনেকে ভালরূপ জানি না। এই আত্মীয় শব্দটি 'আত্মন্' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মন্ অর্থে পরমাত্মা বা জীবাত্মা। জীবাত্মা বা পরমাত্মার বিনাশ হয় না বা কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যে পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা শোক প্রকাশ করি, বিহ্বল হই, তাহা জীবাত্মার উপর বিলুপ্তিশীল পাঞ্চভৌতিক তামস শরীর, ইহা অতি পরিণামী ও ক্ষণভঙ্গুর। এই তামস শরীর মধ্যে আর একটি অপঞ্চীকৃত রাজস শরীর বর্ত্তমান; ইহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলিয়া থাকি। রাজস শরীরের মধ্যে আবার একটি সাত্ত্বিক শরীর আছে; ইহাকে কারণ শরীর বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহার পর আর কোন ব্যষ্টিগত শরীর নাই। আছে এই সাত্ত্বিক শরীর মধ্যে, মহামায়া

সাত্ত্বিকা শক্তি। এবং এই মহাশক্তি সাত্ত্বিকার মধ্যে চিদানন্দ স্বরূপ জীবাত্মা বিরাজমান। সুতরাং তামস শরীর বা অন্নময় কোষের অবসান হেতু শোকাভিভূত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ আসে না। মৃত্যুর পর আমরা ইহলোক হইতে পরলোকে সূক্ষ্ম শরীরে গমন করিয়া থাকি; যেখানে সূক্ষ্ম শরীরের থাকিবার স্থান, পরলোকতত্ত্ব অনুশীলনে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই শোক না করার জন্য গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতির মধ্যে বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দিতেছি:—

দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

ভগবদ্‌গীতা, ২ অঃ ১৩ শ্লোঃ

'যেমন জীবাত্মার এই দেহে কৌমার, যৌবন, জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, তাহাতে দেহীর (জীবাত্মার) কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তদ্রূপ মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্তিতে দেহী অবিকৃতই থাকেন। মৃত্যু দৈহিক বিকার মাত্র। এইজন্য দেহান্তর প্রাপ্তিতে জ্ঞানিগণ অপ্রকৃতিস্থ হন না।'

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

ভগবদ্‌গীতা, ২ অঃ ২৭ শ্লোঃ

'কারণ, জাত ব্যক্তির মৃত্যু সুনিশ্চিত এবং কর্ম্মানুসারে মৃত সূক্ষ্মদেহীর পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। সেই হেতু অপরিহার্য্য অর্থাৎ যাহা এড়ান যায় না সে বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়।'

সুতস্য জনকস্তেন ন শোচতি ন রোদিতি।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্মত্বা শোকং সখে জহি॥

শান্তিগীতা, ২ অঃ ১৩ শ্লোঃ

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ—

'যৌবনাগমে পুত্রের বাল্য শরীর না দেখিয়া পিতা শোক অথবা রোদন করেন না, হে সখে, সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি, অবস্থান্তর প্রাপ্তি মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ কর।'

ত্যক্তা গৃহং যাতি নরঃ পুরাণ মালম্বতে দিব্য গৃহং যথান্যৎ।
জীবস্তথা জীর্ণবপুর্বিহায়, গৃহ্নাতি দেহান্তরমাশু দিব্যম্॥

শান্তিগীতা ২ অঃ ৯ শ্লোঃ

'মানব পুরাতন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ নূতন দিব্য গৃহ অবলম্বন করে, তদ্রূপ জীবও (জীবাত্মা) জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে দিব্য শরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে।'

কিং শোচসি সখে পার্থ বিস্মৃতোঽসি পুরোদিতম্।
মূঢ়প্রায়ো বিমুগ্ধোঽসি মগ্নোঽসি শোক সাগরে॥ ২
মায়িকে সত্যবজ্ জ্ঞানং শোক মোহস্য কারণম্।
ত্বং বুদ্ধোঽসি চ ধীরোঽসি শোকং ত্যক্তা সুখী ভব॥ ৩

শান্তিগীতা ২ অঃ ২।৩ শ্লোঃ

'সখে পার্থ, পূর্ব্বোপদিষ্ট হিত বাক্যসমূহ বিস্মৃত হইয়া কিজন্য শোক করিতেছ, অযথা মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় বিমুগ্ধ হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছ!' মায়াবী পদার্থ-সমূহে সত্যবৎ জ্ঞানই একমাত্র শোক ও মোহের কারণ। তুমি বুদ্ধিমান ও ধীর অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও।'

স্বরূপাঽনববোধেন তাদাত্ম্যাধ্যাস যোগতঃ।
অবিবেকান্মনোধর্ম্মং মত্বা চাত্মনি শোচসি॥ ৪৫
শোকং তরতি চাত্মজ্ঞঃ শ্রুতিবাক্যং বিনিশ্চিনু।
অতঃ প্রযত্নতো বিদ্বান্নাত্মানং বিদ্ধি ফাল্গুনি॥ ৪৬

শান্তিগীতা ২ অঃ

'আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইলে মনের সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদ অধ্যাস নিবারিত হয়। সুতরাং অবিবেকী মনোধর্ম্ম শোক মোহাদি, আত্মস্বরূপে দৃষ্টি হয় না।'

'শ্রুতিতে অর্থাৎ বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি আত্মজ্ঞ তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। অতএব হে ফাল্গুনি! তুমি প্রযত্ন পূর্ব্বক আত্ম-স্বরূপ প্রণিধান কর তাহা হইলে শোক হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে।'

এই সামান্য কয়েকটি শ্লোক পড়িয়া বেশ বুঝা যায় যে, আত্ম-জ্ঞানের অভাব বশতঃ আত্মীয় বিয়োগে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মনোধর্ম্মে অনভিজ্ঞ, দুর্ব্বলচিত্ত নিম্নস্তরের মায়াবিষ্ট মানবই শোকাভিভূত হইয়া থাকেন। শোক করিলে উৎক্রান্তির পর আত্মিকের যে-কষ্ট হয়, তাহা নবম স্তবকে চক্রের বিবরণের মধ্যে দেখিতে পাইবেন।

পথিকের গীত

মোরা পথিকের বেশে এসেছি এদেশে
এই পান্থ নিবাসে
থাকিব কদিন।
চলি মরণেরি পথে প্রকৃতির সাথে
বিরাম হীন রথে
একা সঙ্গী হীন।
সংসারে আপন যারা মিছে ভাবে তারা
জীবন মৃত্যু-জরা
কালেরি অধীন।
ভবে মায়ারি ধোঁকাতে ভুলে থেকে ঋতে
এ জীবন খেলাতে
দুখ পাই তিন।
যদি মায়া পারাবার হতে হয় পার
সাধন কর তার
আসিছে দুদ্দিন।

—কবি।

পিতা-মাতার আসন্নকালে সন্তান ও আত্মীয়গণের কর্ত্তব্য

প্রত্যেক জীবনে সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কোন না কোন আধিক্য লইয়া, মানব পার্থিব জীবন খেলার শেষপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। সন্তানগণ মাতা-পিতার মানসিক বৃত্তির অতি সামান্য অংশই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যেখানে লক্ষ্যের অভাব বর্ত্তমান, সেখানে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই সন্তানগণকে কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। আত্মীয়গণের কর্ত্তব্যও তাহাই।

পরমগুরু মাতা-পিতার মহাপ্রস্থানের দিন সমাগত হইলে চিত্ত-চাঞ্চল্য না লইয়া সুশিক্ষিত সন্তান বা বুদ্ধিমান সন্তানগণ ধৈর্য্য লইয়া, উদ্বেগের হেতু সম্মুখে থাকিলেও তাহাতে অভিভূত না হইয়া উৎক্রমণের পূর্ব্বে তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে, 'এই সংসারের যাবতীয় ভার আমরা গ্রহণ করিলাম, আপনি এখন নিশ্চিন্ত। আপনার শরীরের অবস্থা যেরূপ তাহাতে মনে হয়, অতি সামান্যক্ষণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময় সন্নিকট। এই দেহান্তর প্রাপ্তি সকলকারই একদিন ঘটিবে, তাহাতে দুঃখ বা শোকের কোনরূপ কারণ লইয়া, বিহবল না হওয়াই শ্রেয়। আপনি নিশ্চিন্ত হৃদয়ে কালক্ষেপ না করিয়া, পরলোক যাত্রার জন্য একমাত্র সম্বল ভগবৎ চিন্তন আরম্ভ করুন। আপনি অপঞ্চীকৃত নবীন সূক্ষ্মদেহ লাভ করিবার পর, যাহাতে স্নিগ্ধ প্রকাশ মধ্যে আনন্দ ও শান্তিতে বিশ্রাম করিতে পারেন তজ্জন্যই এই ভগবৎ চিন্তনের অনুরোধ। মঙ্গলময়ের এমনই করুণা-পূর্ণ বিধান যে, এই জরাগ্রস্ত, ক্ষীণ, অস্থির যাতনাপূর্ণ স্থূল শরীর পরিত্যাগের পরই এক অপূর্ব্ব দিব্যদেহ প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে আপনার মন, অন্তঃকরণ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি আপনার সঙ্গে থাকিবে। সুতরাং নিশ্চিন্ত ভাবে আনন্দ পাইতে হইলে এই পার্থিব জীবনের যত কিছু মলিনা বাসনার পরিসমাপ্তি বিশেষ কল্যাণপ্রদ।'

'উপনিষদাদি গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, মৃত্যুর পরও এখানকার 'বাসনা' সেই নবীন জীবনে বহু কষ্টের কারণ হইয়া থাকে, এই সংসারের মোহ ত্যাগ করুন, যেহেতু মায়াবিষ্ট বিত্তবৃত্তি, অজ্ঞান বুদ্ধি, অনুরাগ, উদ্বেগ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি এই পার্থিব জীবনের সম্বন্ধঘটিত বিষয়, যাহা ইহলোকে অনিত্য জীবনের সহিত সম্পর্ক রাখে, যাহা পরলোকে শান্তির অন্তরায়, সেই পাপের বোঝা যাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, দহনীয় চিত্তবৃত্তি লইয়া পরলোক যাত্রা করেন, তাঁহারা নিজের অমঙ্গল নিজেই ডাকিয়া লয়েন। এখানকার যতকিছু অনুরাগ এইখানেই শেষ করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ইহাতে পরলোক অর্থাৎ ভূবর্লোকে এই পার্থিব জীবনের ভুলের জন্য বিপর্য্যস্ত হইতে হয় না। মহর্ষিগণ বলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে নিশ্চিন্ত মন লইয়া প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে উৎক্রমণ হইলে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। অথবা চিত্তস্থির হেতু তদূর্ধ্ব-লোকে যাইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করেন।' গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ—

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুদ্ধ চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥

৮ অঃ, ১২ শ্লোঃ

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

৮ অঃ, ১৩ শ্লোঃ

'সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া মনকে হৃদয়ে বিনাবলম্বনে স্থির করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে নিজের প্রাণকে রাখিয়া স্থৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।'

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ—

ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম হৃদপদ্মান্তরসংস্থিতম্।
—'ওঁ এই অক্ষর ব্রহ্মময়, ইহা হৃদপদ্মে অবস্থিত'।

এই প্রণব মন্ত্র ত্রিমাত্রা বা দশমাত্রায়, প্লুত স্বরে উচ্চারিত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। অর্জ্জুনকে ভগবান বলিতেছেন ঃ—

যোনিবীজং মহাবীজঃ বীজত্বং বীজমন্ত্রিতম্।
ত্রিমাত্রো দশমাত্রেণ প্রণবঞ্চ বিশেষতঃ ॥

গীতাসার, ১০ শ্লোঃ

'বীজরূপী বীজমন্ত্রে মন্ত্রিত, মহাবীজ স্বরূপ এই প্রণব ত্রিমাত্রা বা দশ মাত্রায় উচ্চারিত হইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।'

এই বিশ্বে যে অনাহত নাদ হইতেছে তাহাই প্রণব ধ্বনি। আমাদিগের মধ্যেও সেই ধ্বনি শুনা যায়। যোগিগণ বলেন, কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে যে ধ্বনি শুনা যায় তাহাই অনাহত নাদ। ওঙ্কার আরাধনায় অনাহত ধ্বনির সহিত সুর মিলাইয়া সাধনা করিতে হয়।

বহু বোধনীয় বিষয় আসন্নকালে আলোচনার পর, আরও বলিতে হয়, এই সংসার জীবনে অনেকে অতৃপ্ত বিষয় বাসনার মধ্যে খেলা করিয়া ভুল পথে যাইলেও ইহজীবনের অন্তিম কালে সকল বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া, যদি পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মনাম করিতে করিতে নিশ্চিন্ত অবস্থায় এই অকর্ম্মণ্য পাঞ্চভৌতিক জড়-দেহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে পরলোকে গিয়া দিব্য সূক্ষ্ম দেহলাভের পর, অতি উচ্চস্তরে স্থানলাভ ঘটিবে। যথায় চির আনন্দে থাকিয়া পরলোকবাসী আত্মিকগণ পুনঃ পুনঃ জন্মান্তরের ক্লেশ ভোগ করিতে আসেন না। শাস্ত্রে বলে এ সংসারে মায়াবিষ্ট অবস্থায়, দুঃখের মধ্যে যে ক্ষণিক আনন্দ দেখা দিয়া থাকে তাহা বিমল আনন্দ নয়, পরন্তু সুখ-দুঃখ রহিত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে মৃত্যুর

পর দিব্যলোকে গমন করিলে, তাহার বহুশতগুণ সংশুদ্ধ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জন্মান্তরীণ ক্লেশ সহসা তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারে না। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ—

ভূত বস্তুন্যশোচিত্বে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।

উত্তর গীতার শেষ শ্লো:

'কি গত বিষয়, কি প্রাপ্ত বিষয় কিছুতেই যাহার বিন্দুমাত্র শোক নাই তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম লইতে হয় না।'

'সুতরাং ব্রহ্মকল্প ওঙ্কারে তন্ময় হইয়া এই ভগ্ন নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে যাত্রা করুন। ইহাই শেষ অনুরোধ।'

মনে করিবেন না শরীর অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, অতএব শুনিবেন কে! জানিয়া রাখুন, বধির না হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ণেন্দ্রিয়টিমাত্র সম্পূর্ণ কর্ম্মক্ষম থাকে।

সন্তান ও আত্মীয়গণকে দৃঢ়চিত্ত থাকিয়া এইভাবে কর্ত্তব্য পালনে বিশেষ যত্ন লইতে হয়। ইহাতে মৃতকল্প ব্যক্তির অশেষ কল্যাণসাধন করা হয়। অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম সম্পন্নের পর, রোদন করিলে আত্মিকের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

গীত

বিদায়ের দিন এলোরে নিকটে
যেতে হবে সব ছাড়িয়ে,
বছরের পর বছর গিয়াছে
(আর) থেকোনা বিভুরে ভুলিয়ে।
ব্যাকুলিত চিত সুপ্ত মনের
আঁধেরা আসিছে ঘেরিয়ে,
জীবনের খেলা হয়ে এল শেষ
আয়ু রবি যায় ডুবিয়ে।

কত শীত গেল বরষা গরম,
সুখের নেশায় মাতিয়ে,
পঞ্চাবস্থা হতে সময় আসিল
দেখহ শরীর চাহিয়ে।
পার্থিব খেলা গিয়াছে ভুলেতে
(এবে) এসেছে অন্তিম ঘনায়ে,
যে বাসনা আজ খেলিছে ভিতরে
মরিলে উঠিবে ফুটিয়ে।
বাসনার হবে শরীর তখন
তমস মাঝারে যাইয়ে,
(প্রভু) জাগাইয়া দাও পরম চেতনা
প্রণব সুরেতে রাখিয়ে।

—ফণি

উৎক্রান্তি বা মৃত্যুর সময় পার্থিব শরীরের নিকট ক্রন্দন করা উচিত কি না।

জীবনে উচিত-অনুচিত বিচার করিয়াই স্থির করিতে হয়। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সকল জীবনেই দেখা দিয়া থাকে। মনের অস্থিরতা নিবন্ধন অল্পজ্ঞ মানব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে ও অস্মিতাপূর্ণ ভাবের মধ্যে থাকিয়া তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে অনেক সময় অপারগ হইয়া থাকেন। আমরা পুনঃ পুনঃ পাঞ্চভৌতিক শরীর লাভ করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মফলের বোঝা স্কন্ধে লইয়া এই ভূলোকে যে আসি তাহার কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নাই? দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে, এবং অধ্যাত্ম বিজ্ঞান চর্চ্চাকারী মহাপুরুষগণ বলেন, বিশেষভাবে সম্যক্ দুঃখ নিবৃত্তির জন্যই, ক্রম বিবর্ত্তনে আমাদিগকে বার বার মানব শরীর লাভ করিতে হয়। কিন্তু মায়ার খেলায় জন্মের পরই সব ভুলিয়া যাই। কয়জনই বা দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া প্রগাঢ় দুঃখের কবল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যগ্র হন? কেবল মাত্র এই সংসার দুঃখ, আর্থিক দুঃখ মোচনেই ত সকলে পাগল! দুঃখই যে মানব জীবনের অকল্যাণ স্বরূপ তাহা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন ও বুঝেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, দুঃখ দেওয়া ও দুঃখ পাওয়া ঠিক ভাবে বুঝিতে অক্ষম। সেই কারণ সময়ে সময়ে অনেকের মুখে শুনা যায়, বিশেষ দুঃখ আমার নাই, ইহার তাৎপর্য্য এই অভিভূত অবস্থায় অনুভূতি পর্য্যন্ত তাহার নষ্ট হইয়াছে। শরীরে মানসিক দুঃখের যখন ক্রিয়া হয়, তখন মানব বিমর্ষ হয়, ব্যাকুল হয়, এমন কি নিরালায় ক্রন্দন করিয়া থাকে।

আমরা প্রাজ্ঞের মত কথা বলি, যেন আমাদের দুঃখ নাই; কিন্তু ধরা পড়ি যখন কোন আত্মীয় বিয়োগে অধীর হইয়া চক্ষের জল ফেলি, মনের দুঃখ প্রকাশ করি। তখন বিচার করিয়া দেখি না এই দুঃখ আসিল কোথা হইতে! শোকাতুর হইয়া কাঁদিতেছি কেন? প্রকৃত

দুঃখের নাশ না ঘটায়, জীবনের পরিণাম দেখিয়া, আতঙ্ক মিশ্রিত দুঃখ তখনই ফুটিয়া উঠে।

মৃত্যুর পরে পরলোকে গিয়া আমরা ইহলোকের ন্যায়ই একটি সূক্ষ্ম দেহ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তথায় জ্ঞানের অভাব-জনিত শোক-দুঃখ, মায়া-মমতা সকলই বর্ত্তমান থাকে। পরলোকবাসী আত্মিকেরও ইহলোকবাসীর ন্যায় মায়া-মমতা ভোগ করিতে হয়। তাহার কারণ পরমতত্ত্বে মননের অভাবহেতু ভৌতিক আকৃষ্টতা। তজ্জন্য পরলোক যাত্রী মাতা-পিতার নিকট অন্তিম সময়ে সন্তানগণের ক্রন্দন তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ব্যথিত করে এবং তাঁহাদের যাত্রাপথে অস্বস্তিকর বহু বিঘ্ন আনয়ন করে।

শোকে ক্রন্দন করিলে আত্মিকের মঙ্গল না হইয়া, ইষ্ট সাধন না হইয়া অত্যন্ত অহিত সাধনই হয়। সন্তানগণের এই ব্যবহারে আত্মিকগণ ভুবর্লোকের উর্দ্ধে যাইবার শক্তি হারাইয়া বসেন। ইহার পরিণাম হয়, তিনি অর্থাৎ 'আত্মিক' প্রেতলোকের অন্ধকারময় স্থানের মধ্যে থাকিয়া বিষম যাতনা অনুভব করেন। সন্তানের কি কর্ত্তব্য মাতা পিতার এই দুর্দ্দশা সৃষ্টি করা, প্রতিকূল ব্যবস্থা দ্বারা ক্লেশের মধ্যে টানিয়া রাখা? মায়ার টানে শোকে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দনের পরিণাম যে কত কল্যাণঘাতক, বিপত্তিজনক, তাহা প্রত্যেক পরলোক চর্চ্চাকারী ব্যক্তি ভালভাবেই বিদিত আছেন। তজ্জন্য বলিতে হয়, সন্তান হইয়া সূক্ষ্মদেহী মাতা-পিতার আত্মিককে দুঃখের মধ্যে টানিয়া আনিয়া কষ্ট দেওয়া কি কৃতী সন্তানের বিচারমত কার্য্য হইবে? এখানে কর্ত্তব্যে ত্রুটি কত অধিক!

যিনি পরলোক চর্চ্চা করিয়া জানিয়াছেন, মৃত্যুর পর আত্মিক-গণের অবস্থিতি ও গতির ক্রম কি প্রকার হইয়া থাকে, তিনি উৎক্রমণ-কালে ক্রন্দনের বিরোধী থাকিবেনই; অতএব তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু যিনি পরলোক সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ এবং অবিশ্বাস পোষণ করেন, তাঁহার জানা আবশ্যক মৃত্যুর পর কি হয়।

ইহারাই মায়ার চাপে আত্মীয়ের অন্তিমকালে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে মৃতের নিকট বেদনাকাতর হইয়া হাহাকার করেন, ক্রন্দন করেন। বেদনাকাতর হওয়া স্বাভাবিক হইলেও মৃতের আতিবাহিক সূক্ষ্ম শরীরকে বৃথা ক্রন্দনের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উর্দ্ধ রাজ্যের গমনপথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা বুদ্ধিমান আত্মীয়ের কার্য্য নয়। তৎকালে ঐ মায়ামুগ্ধ আত্মিক সন্তানগণকে, স্ত্রীকে ও অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন, যদিও তাঁহার কার্য্য আমরা বুঝিতে অক্ষম। তিনি ইহাদের দুঃখে দুঃখিত হন।

মৃত্যুর পর আত্মিকগণ সহজেই ভুবর্লোকের তৃতীয় স্তর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন; যদি পরম পিতার পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে ইহলোক হইতে বিদায় লয়েন এবং তৎকালে আত্মীয়গণ শোকে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন না করেন। অন্তিমকালে মাতা-পিতা অথবা আত্মীয়ের দেহত্যাগের পর সন্তানগণ যদি সেই শবদেহের নিকট গতাসু আত্মিককে লক্ষ্য করিয়া তদুদ্দেশ্যে ধীর গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে প্রার্থনা করেন যে,—

দিব্যলোকে যেন স্থান পায় প্রভু
হে বিভু, রেখ সদা প্রকাশ ভিতরে।
শান্তির বিরাম এঁর হয় নাক কভু
দিও হে চির বিশ্রাম আনন্দ মাঝারে।

এই সহানুভূতিসূচক প্রেম ও কল্যাণের বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মিক আনন্দ পান। তখন তাঁহার উর্দ্ধ রাজ্যের উচ্চস্তরে যাইবার বলবতী ইচ্ছা দেখা দিয়া থাকে। তজ্জন্য সহজেই ভুবর্লোকের অন্ধকারময় স্থান অতিক্রম করিয়া, পিতৃলোকের সপ্তম স্তরের মধ্যে যে কোন স্তরে আশ্রয় লাভ করেন। অনায়াসেই তথায় পৌঁছাইতে সক্ষম হন। সেখানে আলোকমধ্যে থাকিয়া বিশেষ আনন্দ পান। তথায় থাকিয়া আরও যত্ন লন উর্দ্ধগামী হইবার। ভগবৎ চিন্তনে আত্মিকের যখন স্বর্লোকে গতি হয়, তখন তিনি বিশেষ আনন্দ পান,

এবং উজ্জ্বল স্নিগ্ধ প্রকাশ মধ্যে থাকিয়া, ভয় ভীতি হইতে নির্মুক্ত হন। এই ইহলোকে বহুদিন পরে জন্ম লন ও উচ্চস্তর লাভ করেন।

সুতরাং সন্তান ও আত্মীয়গণের যোগ্য কর্ত্তব্য হইবে, ক্রন্দন না করিয়া, মায়া-মোহময় হীন জড়তার পরিচয় না দিয়া, পরলোকযাত্রীর নিকট পরম ব্রহ্ম নাম অর্থাৎ 'ওঁ নারায়ণ' স্মরণ করাইবেন। এবং কায়া ছাড়িয়া যাইলে, করজোড়ে বিভুর নিকট তাঁর মুক্তির জন্য যদি আন্তরিক অভিলাষ ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে বিচার বুদ্ধিমত তৎকালে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইবে। বুদ্ধিমান সন্তান ও আত্মীয়ের কার্য্য হইবে ধৈর্য্য লইয়া থাকা। অতএব মৃত্যুর সময়, মৃত ব্যক্তির নিকট ক্রন্দন না করাই শ্রেয়।

আত্মহত্যা ও অপঘাত মৃত্যুর পরিণাম

অতৃপ্ত উৎকট বাসনায় যখন মনে অত্যন্ত দুঃখ উদয় হয়, তখন দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া মানব অনেক সময় আত্মহত্যা করিয়া থাকে। ইহজগতে নিম্নস্তরের সাধারণ জীবের মধ্যে আত্মহত্যার কোন বালাই নাই। তাহারা জীবনের ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদাসীন।

অনেকে সাংসারিক উৎপীড়নে, ক্ষুধার জ্বালায়, বিরহের দারুণ মনোবেদনায়, অকৃতকার্য্যতার মোহে জ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মহত্যা করিয়া শান্তি পাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না আত্মহত্যায় দুঃখের নিবৃত্তি না হইয়া, পরলোকে তদপেক্ষা অধিক দুঃখের মধ্যে দিন কাটাইতে হয়। পারলৌকিক জীবন সুখের করিতে হইলে, এই পৃথিবীতে চরিত্রবান হইয়া, সহনশীল হইয়া, স্বচ্ছ মনোবৃত্তি লইয়া ত্যাগ ও ধৈর্য্যের দ্বারা অশুভ পথ পরিহার করিয়া, প্রকৃতির নিয়মে যথাকালে দেহত্যাগ করিতে হইবে। জীবনের ক্রমোন্নতির জন্য আমাদের এই পার্থিব জীবনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। আত্মঘাতী হইলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

মানবের পরমায়ু অনন্তকালের নিকট বুদ্বুদ সদৃশ অতি অল্প। এই স্থূল জগতে আত্মোন্নতি ও জ্ঞান প্রাপ্তির হেতু, অতি অল্পকালের জন্য, আমরা পার্থিব দেহ পাইয়া থাকি। তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া পার্থিব জীবনের পরম কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। আমাদের জানা উচিত দুর্ব্বল নিদ্রিত বৃত্তিনিচয়কে ক্রমে ক্রমে উদ্‌বুদ্ধ করিতে, বহু বর্ষ ও বহু জন্ম অতীত হয়। তজ্জন্য আমাদিগকে জীবিত থাকিয়া পার্থিব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে যতদূর সম্ভব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, জ্ঞান বা আত্মোন্নতির বিকাশ সাধন করিতে হইবে। নচেৎ এই কল্যাণময়ী আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি যাহা সকল জীবের ভিতর বর্ত্তমান, যাহা মহামায়ার মঙ্গল দান, তাহাকে মানব অবহেলা করিয়া আত্মহত্যাকে প্রশ্রয় দিলে, মানবতার মহীয়সী অবস্থায় উপনীত হওয়া কখনই সম্ভব

নয়। সন্নিপাতগ্রস্ত ব্যক্তির বুঝা উচিত, প্রত্যহই উদয়াস্তের চক্রে পড়িয়া পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে; আবার আত্মঘাতী হওয়ার নিকৃষ্ট ইচ্ছা কেন!

এই স্থূল জগতে মানব ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ জীবজন্তুর আত্মহত্যা না করার কারণ, তাহারা ক্রম বিবর্ত্তনে উন্নতির পথে চলিতে থাকে। আর মানুষ আত্মঘাতী হইয়া ক্রমশঃ নিম্নগামী হয়। এই জঘন্যবৃত্তিসম্পন্ন মানব আত্মোন্নতি লাভে জন্ম-জন্মান্তর বঞ্চিত থাকে। এই জড়জগৎ হইতে আত্মহত্যা করিয়া জড়ভাবাপন্ন ব্যসনাসক্ত মন লইয়া মৃত্যুর দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলে, মৃত্যু মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর, সেই ব্যক্তি দেখিতে পায় একটা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ আবরণের মধ্যে ঢুকিয়াছে, তৎকালে ভয়ত্রস্ত ভাবে সে কাঁপিতে থাকে। তখন তার পরিতাপ হয়, আশার কুহকে কি কার্য্যই না করিলাম!

মৃত্যুর পর সে যায় সর্ব্বনিম্নস্তরে ভুবর্লোকে। এই ভুবর্লোক পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত থাকিয়া দক্ষিণ মেরুর পরে অবস্থিত। যেদিকে আমরা নরক বা যমপুরীর কল্পনা করিয়া থাকি, সেই নিরাশ্রয় ভুবর্লোক কেবল নিবিড় অন্ধকার-পরিপ্লুত নিঃসহ স্থান।

পৃথিবীতে আমরা আলোক ও অন্ধকার উভয়ই দেখিতে পাই। আলোকের আনন্দ ও অন্ধকারের নিরানন্দ আমরা দুইটিই অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি সেই প্রায়শ্চিত্ত স্থান ভুবর্লোকের অতি গাঢ় তমিস্রার মধ্যে যায়। তথায় তাহাকে অসহায় হইয়া গভীর আতঙ্কের মধ্যে থাকিতে হয়। কখন কখন বা অন্ধকার রাত্রে ভূর্লোকে আসে; অন্তরের জ্বালা বেদনা শান্ত করিবার মানসে অযথা হিংসা দ্বেষ লইয়া পূর্ব্ব পার্থিব প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে যত্ন লয়। কিন্তু কোন তৃপ্তি না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে যেন বাধ্য হয়, অনুশাসনের ভয়ে চলিয়া যায় সেই ভুবর্লোকের অন্ধকার মধ্যে। আত্মঘাতীরা যে কিরূপ ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা ভাষায় লেখা সম্ভব নয়। তাহাদের কাতর উক্তি যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই কিছু

উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কখন কখন চক্রে আসিয়া অধীর হয় ও ভীষণ উৎপাত করে। মিডিয়ম তাহাতে অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হন।

অপঘাত মৃত্যু ইহা অপেক্ষা বহুগুণে ভাল। দুঃখের বিষয় অপঘাত মৃত্যুতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে বহু স্মৃতি তাহাদের লোপ পায়। যেমন জলে ডুবিয়া এবং উচ্চস্থান হইতে পতনের পর যদি সংজ্ঞা ফিরিয়া না আসে এবং এই অবস্থায় উৎক্রান্তি ঘটিলে তাহার স্মৃতি ভালরূপ কাজ করে না। দেখিয়াছি তাহারা নিজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, অতি কষ্টে বহুক্ষণ চিন্তার পর বলিতে সক্ষম হয়। তবে ইহাদের আত্মঘাতীর মত ভুবর্লোকের প্রথম স্তরে অতীব যন্ত্রণায় মধ্যে থাকিতে হয় না। আর অপঘাত মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহাদের সংজ্ঞা আসে, এবং মৃত্যুকালে আত্মীয়গণ ভগবানের নাম স্মরণ করান, তাঁহারা পরলোকে যাইয়া তত কষ্ট পান না।

বিচার করিয়া দেখিলে আত্মহত্যাকারীর কর্ম্ম তাহার নিজ শরীরের উপর জিঘাংসা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। হত্যাকারী, হতমূর্খ, হিংসুক কোন জীবনেই শান্তি পায় না। শরীর ধ্বংস করিয়া অন্তরের ব্যথা কি লাঘব করা যায়! জড়াতিরিক্ত মন এই পার্থিব শরীর ছাড়িয়া, পরলোকগত শরীরে ঠিক তদনুরূপ ভাবনা লইয়াই কার্য্য করে। সুতরাং ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা ও দুঃখে, শান্তি পাইবার বাসনায়, অকাল-মৃত্যুকে বরণ করিয়া, এই স্থূল পার্থিব শরীরের অবসানে, সূক্ষ্ম শরীরে পরলোকে যাইয়া, দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই। মনের সহিত শরীরের নিকট সম্বন্ধ, তাহা স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নৈরাশ্যের অনুভূতি 'মনের'।

বাহ্য-বস্তুর ঘাতপ্রতিঘাতে স্থূল দেহে স্নায়ুকেন্দ্রের সাহায্যে, এবং সূক্ষ্ম দেহে প্রাণময় কোষের সাহায্যে, 'মন' বাহিরের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। মনের যে অনুভূতি তাহা চিত্তসঞ্চারী ভাবধারার মধ্যে ন্যস্ত।

সহজ মৃত্যুর পর 'চিত্তে' অবরুদ্ধ ঘটনাগুলি যাহা আবরিকা ও

বিক্ষেপিকা কোষে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, পরলোকে তাহা সঙ্গে যায়। এবং সূক্ষ্ম-দেহীর মনে, চিত্তের ঘটনাগুলি. হইতে অনুশোচনা, দুঃখ, সুখ ও আনন্দ পাইয়া থাকে।

যেখানে আত্মঘাতীর মলিন জঘন্য চিত্তবৃত্তি, তথায় সুখ শান্তির অভাববশতঃ দারুণ দুঃখ ভোগই করিয়া থাকে। যাঁহারা সৎপ্রবৃত্তিতে থাকিয়া যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরলোকে আলোকের মধ্যে যাইয়া অল্প-বিস্তর সুখ বা আনন্দ পাইবেনই। কিন্তু সেখানে আত্মঘাতীর দুষ্কৃত কর্ম্মের পুরক্রিয়া মাত্র সন্তপ্ত দশা, অতি বেদনাদায়ক দুঃখ।

আর অপঘাত মৃত্যুতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেহত্যাগ ঘটে বলিয়া, হিংসাভাব-বর্জ্জিত চিত্তে, পূর্ব্ব কর্ম্মের কোন জটিল অভিজ্ঞান থাকিলেও মৃত্যুকালে স্মৃতিপথে বিভীষিকা লইয়া তাহা উদয় হয় না; সেই সময় কেবল দৈহিক যন্ত্রণা, জ্ঞানাপোহ ও হতাশ ভাব থাকে। এবং তৎকালে চিত্তে যে ম্লান অভিজ্ঞান থাকে, তাহা হইতে ঈশ্বরাভিমুখী প্রবৃত্তি না জাগিলেও পরলোকে তত অধীর হইতে হয় না, বা দুশ্চিন্তার অধীন করে না।

এই ভূর্লোকে আপন অস্তিত্বের অনুপযোগী জীবনের প্রতিকূল ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলে, তাহা অব্যবস্থা হইবে। কোন নৈসর্গিক বিধানে আমরা ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। আত্মহত্যা যাঁহারা করেন, তাঁহারা বুদ্ধি বৈকল্যাবস্থায় ইহাকে বোধের মধ্যে আনিতে অক্ষম। এই অক্ষমতার জন্য যে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, তাহাতে বায়ু বিকার উপস্থিত হয়, এই বিকার অবস্থায় আত্মহত্যা করিয়া বসেন। ইহার পরিণাম পরলোকে যাইয়া নিদারুণ কষ্ট ভোগ।

ষষ্ঠ স্তবক

অন্তিম অবস্থার জন্য কিরূপ প্রস্তুত হইতে হয়

মানসিক অবস্থার উন্নতির জন্য সারাজীবনের ঘটনাকে, উত্তম প্রবৃত্তির অভ্যাস দ্বারা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে দরিদ্রতা, বিষয় তৃষ্ণা, ও ভোগ স্পৃহা। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নিজ প্রবৃত্তির স্বাধীনতা অর্জ্জনে যদি আমরা সমর্থ না হই তাহা হইলে অন্তরে নানা ভাবের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। এবং সঙ্কল্পহীন বিশৃঙ্খল প্রবৃত্তির অনুগামী হইলে ভবিষ্যতে ভোগদেহে অনুতাপ করিতেই হইবে।

এখন প্রথম প্রশ্ন হইতেছে, অন্তিম অবস্থার জন্য আমরা কতটুকু প্রস্তুত হইয়াছি? এবং এই সংসারে, বিষয়ের ঝঞ্ঝাট হইতে বাসনা প্রবৃত্তিকে পারলৌকিক জীবনের কল্যাণে সরাইতে পারিয়াছি কি না? মনে হয় প্রস্তুত কিছুই হইতে পারি নাই। কারণ জড়বাদী হইয়া, একাধিক প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবার পর, মনকে একমুখী করা অর্থাৎ ঈশ্বরমুখী করা তত সহজসাধ্য নয়। সংসারে কাল্পনিক সুখ-দুঃখের যে ভোগস্পৃহা বা উপভোগের অনুরক্তি, তাহা বৃদ্ধাবস্থায় শরীর শিথিল হইলেও মনকে অযথা জ্বালাতন করিবে। তবে কি কোন সমীচীন উপায় নাই? নিশ্চয়ই আছে; থাকা চাই উন্নত জীবনলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প, ব্রহ্মচর্য্যব্রত, ভগবানে বিশ্বাস, অনুরাগহীন

থাকিবার নিয়মিত অভ্যাস, এবং শরীরের পরিবর্ত্তন চিন্তা করিয়া নির্ম্মোহ হইবার ইচ্ছা।

প্রত্যেক অন্তরে জ্ঞানের কার্য্য থাকে। তাহা তামস, রাজস, বা সাত্ত্বিক হইতে পারে। তামস ও রাজস জ্ঞানের প্রাবল্যে সাত্ত্বিক জ্ঞান অভিভূত অবস্থায় থাকে। এই জড় জগতে তামস ও রাজস জ্ঞানের ক্রিয়া আপাতমধুর মনে হয়। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ অনুতাপের কারণ। অন্তিম সময়ে তম-রজজাত জীবনের বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি স্রোতের মত আসিয়া মনকে হতাশ করিয়া দেয়; তখন মনে হইতে থাকে জীবনে একি করিলাম, আর ত সময় নাই, কৈ কিছুই যে ভোগে আসিবে না, এ সকল ফেলিয়া কোথায় যাইব, এই সাজান সংসারের অবস্থা কি হইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিষয় ভোগের আনন্দে এতকাল যে ভরপুর ছিল, অন্তিম দশায় এইবার তাহা অনুতাপের রাস্তায় চলিয়াছে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে তামস ও রাজস বৃত্তি অতীব মলিন। অন্তিমে ইহা কল্যাণদায়ক নহে, অনুতাপের হেতু।

এইবার জানিতে হইবে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি সম্বন্ধে। এখানে সর্ব্বতঃ তম-রজ গুণাশ্রয়ীর চিন্তাধারা এরূপ হয়, যেন জীবনে আর উদ্ধারের উপায় নাই; এই ভাবনা ত্যাগ করিয়া, মলিন প্রবৃত্তি সংস্কার কলুষিত, মোহের কারণ হইলেও দুর্ব্বলতা লইয়া ইহাকে লাঞ্ছিত বা কলঙ্কিত করিলে চলিবে না, প্রথম জীবনে ইহারও আবশ্যকতা আছে, তবেই অন্তরে শক্তি আসিবে। সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি সাধারণতঃ ঈশ্বরমুখী প্রবৃত্তি। এই উচ্চ প্রবৃত্তির অনুসরণকারী সাধকের নিকট অন্তরের মলিন প্রবৃত্তিগুলি বলবতী হইয়া, পরিণামে অনুতাপ আনয়ন করিবে অথবা অমঙ্গল ঘটাইবে, কল্যাণের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির ক্রিয়ায় অন্তরের ভয় ভাবনা দূরে যায়, আতঙ্ক হইতে মুক্তি পায়। সাত্ত্বিকী বুদ্ধিজাত জ্ঞানের কার্য্য হইতেছে যে, বিস্তৃততর জগতে অবিদ্যার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া, বুঝাইয়া দেয় এ জগৎ নশ্বর, তৎকালে মানব ত্যাগে, অভ্রান্ত

পথ প্রাপ্ত হয়। আর মূর্খের কেবল মলিন প্রবৃত্তিতে জীবনব্যাপী অনুরাগ থাকায়, তাহার অন্তরে বিস্তৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। তাহার চিন্তাধারা স্থূল শরীর প্রণোদিত, ক্ষণস্থায়ী বিষয় সংস্পৃষ্ট, জড় ভাবাপন্ন জঘন্য উঞ্ছবৃত্তি। এই নিম্নতম প্রবৃত্তির ব্যবহার অতি সন্তর্পণে করিতে হয়। নচেৎ জীবনে কল্যাণ সম্ভব নয়।

জনকল্যাণ বৃত্তি পরিশুদ্ধ রাখিবার, এবং সাত্ত্বিকভাবে থাকিবার জন্য, আর্য্য ঋষিগণের ব্যবস্থা, তাঁহাদের দেওয়া প্রবুদ্ধ প্রেরণা, ভারতের চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান ইহকাল-সর্ব্বস্ব জড়ভাবাপন্ন অবস্থা আসিয়া মানবের পারলৌকিক জীবন যারপরনাই দুঃখের করিয়াছে।

মৃত্যু শিয়রে আসিয়া অজানা প্রদেশে অর্থাৎ পরলোকে এই স্থূলদেহ হইতে ভোগদেহে লইয়া যাইবার জন্য, যখন ইঙ্গিত করিয়া দুঃখের ছবি সম্মুখে দেখায়, তৎকালে আকুল অবস্থার মধ্যে কিছুই হইবার নয়। তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই সাত্ত্বিক ভাবে থাকিয়া ভগবৎ-চিন্তন অভ্যাস করিতে হইবে। নচেৎ অন্ধকারময় জীবনে পবিত্র আলোকরশ্মি প্রতিভাত হইবে না। যদি স্থিরভাবে আসনে বসিয়া কোনরূপ চিন্তা না করার অভ্যাস সাধন করা যায়, তাহা হইলেই পরম পিতার কৃপায় অন্তিমকালে বিভুর নাম লইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং অন্তিম অবস্থার পূর্ব্ব কর্ম্ম হইবে, যখন সুস্থ দেহ থাকিবে, তখন হইতেই সাত্ত্বিক ভাবে পরমাদ্বৈতে আত্মসমর্পণ; এবং নশ্বর জগতের পরিবৃতি লক্ষ্য করিয়া, তাহা মনে মনে অনুধাবন করিয়া, অন্তরে ত্যাগী হইতে হইবে। আর পরম গতিলাভের উদ্দেশ্যে মনকে প্রত্যহ অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য নিষ্ক্রিয় রাখিবার অভ্যাস করিতে হইবে।

জীবন সংগ্রামের মধ্যস্থল হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, পূর্ণ জড়বাদী হওয়া, নিতান্ত মূর্খের কার্য্য হইবে।

ইহাকে বলিতে হয় অজানিতরূপে আত্ম প্রতারণা। যথার্থ প্রজ্ঞাকে ছলনা করিয়া যাঁহারা জ্ঞানী হন, তাঁহারাই এই জগৎকে চিরস্থায়ী মনে করেন। সাধুবৃত্তি যে তাঁহাদের অন্তরে নাই এ কথা অস্বীকার করা যায় না। পরন্তু জড়বাদী হইয়া মায়া মোহের ঘোরে, তাঁহারা জগতের নাশধর্ম্মশীল প্রকৃতিকে ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তজ্জন্য জীবনকে প্রতিকূল পথে চালাইয়া এবং অভ্যাসের দোষে অন্তিমে ভীষণ চঞ্চল হইয়া উঠেন। মৃত্যু সন্নিকট হইলে তাঁহাদের মনের অবস্থা হয় নিরাশাকুলিত বিভ্রান্ত ভাবে উদাসীন। তৎকালে দৈহিক যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যথিত ও জড়ীভূত অবস্থা হয়। সেইহেতু ঈশ্বর চিন্তা মনে স্থান পায় না।

বহুদিন অভ্যাসের ফলে অন্তিমকালে ভগবৎ চিন্তার প্রবৃত্তি জাগে। সুতরাং অন্তিমকালের পূর্ব্ব কর্ম্ম হইবে, বহু পূর্ব্ব হইতে সুস্থ শরীরে প্রত্যহ প্রাণভরা স্থির ঈশ্বর চিন্তন করা। ইহার সহিত পরকালের সুখ-শান্তি-তৃপ্তির যথার্থ সম্বন্ধ জড়িত। মৃত্যু অনিবার্য্য সত্য, অতএব অন্তিমের জন্য শ্রেয় হইবে, জীবনে পরলোকে বিশ্বাস ও ভগবৎ চিন্তন।

মর জগতের বিদায় গীত

প্রভু, করুণা কর হে
তুমি, চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন
নিষ্প্রপঞ্চ সনাতন
প্রজ্ঞানঘন কারণ, সর্ব্বলোকাশ্রয় হে।
ওহে, দয়াময় দুখহারি
আর, ক্লেশ যে সহিতে নারি
কর, উপায়ন নারায়ণ অন্তিম সময়ে হে।

নাশ, অনিত্যতে নিত্যবুদ্ধি

কর ভূমা চিত্তশুদ্ধি

হৃদে, সম্প্রসাদ পাই যেন অক্ষয় অমৃত হে।

করিয়া বিবর্ত্ত শেষ

ধ্বংস করি মায়া বেশ

মম,—দেহাত্মিকা বুদ্ধিনাশ প্রতিবুদ্ধ অজ হে।

সম্পীণ্ডিত হয়ে যবে

দেহী, পরপারে প্রবেশিবে

হে বিভু,—জ্যোতি পথে লয়ে যেও অমৃত তীর্থে হে!

—ফণি

মৃত্যুকালে ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণের আবশ্যকতা কি ?

আধ্যাত্মিক জগতের নিকট যাঁহারা অচেতাঃ, মৃত, তাঁহাদের জন্যই মৃত্যুকালে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এখানে মৃত অর্থে জড়ভাবাপন্ন, অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক চেতনা যাহার অন্তরে প্রবেশ করে না।

এই মরজগতে বাসনা ও কামনা মুগ্ধ জীবের জন্য, তার পারলৌকিক জীবনের কল্যাণের হেতু, অন্তিমকালে ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্ম তাহাকে শুনাইতে হয়। জীবনে বাসনা তৃপ্তির জন্য, ব্যসন মুগ্ধ জীব অন্তরে আবিলতা সংবৃদ্ধি করিয়া, মৃত্যুকালে মানসিক যাতনায় শঙ্কিত হইলে, তাহা লাঘব করিবার এবং পারলৌকিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনিবার একমাত্র উপায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া। আত্মীয়ের মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্তরে এক প্রকার উদাসীনতা ও বিবেকের উদয় হইয়া থাকে। তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের অচেতন মনের ভিতর এক বিশুদ্ধ পারমার্থিক চেতনা জাগ্রত হয়; তজ্জন্য উৎক্রমণশীল ব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গল বিধান করার চেষ্টা তাঁহারা করেন। তখন তাঁহারা লক্ষ্য করেন সেই মৃতপ্রায় ব্যক্তির সজ্ঞান অবস্থায় শুনিবার শক্তি আছে কি না। হয়ত তিনি মুখে বলিবার শক্তি হারাইয়াছেন, কিন্তু অনেকে জানেন না কর্ণেন্দ্রিয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে। সুতরাং আত্মীয়গণের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তাঁহার কল্যাণ হওয়া সম্ভব। সকলের জানিয়া রাখা উচিত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে মৃত্যুকালে কর্ণেন্দ্রিয় ছাড়া, অন্যান্য ইন্দ্রিয় ক্রমশঃ বিলুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বেই অন্তর্মুখী হইয়া সপীণ্ডিত হইতে থাকে।

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা এই জন্য যে, জীবনব্যাপী মায়ার টানে তাহার ভোগস্পৃহারত আসক্ত চিত্ত অন্তঃকরণকে, মৃত্যুকালের উৎকট মানসিক যাতনা হইতে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা

করিয়া, অনিত্য সংসারের মোহ হইতে ভুলাইয়া রাখা। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তাহা তৎকালে ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে হয়। আমাদের মধ্যে 'গীতা' সাধারণতঃ শুনান হইয়া থাকে। গীতার সংস্কৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া শুনাইলে ইহাতে উদ্দেশ্য সাধন ঠিকমত হয় না। অনেকে সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারে না। বোধের অভাবে যে ফাঁক মিলে তাহাতে সে অন্যমনস্ক হয়। তজ্জন্য কর্ত্তব্য হইবে, শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া পশ্চাৎ নিজ মাতৃভাষায় মর্ম্মার্থ স্পষ্ট করিয়া শুনান।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তৃপ্তির অভাব থাকিলেও জ্ঞানার্জ্জনী প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল। তজ্জন্য তাঁহাদের মনের গতি ফিরাইতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। কিন্তু নিম্নস্তরের মানব 'মন' অত্যন্ত জড়ভাবাপন্ন ও অস্থির ; কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিবার কল্পনা ও কৌতূহলের অভাববশতঃ এবং অতি সামান্য বোধের দৈন্য হেতু জীবনের উচ্চ প্রবৃত্তিগুলির ব্যবহার না করার কারণ, মন দুর্ব্বল থাকে। মনন, অনুধ্যান ইহাদের ধারণার বাহিরে, ইহারা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেইহেতু তাহাদের মন সামান্য গণ্ডীর মধ্যেই, স্বল্প ভোগেই সন্তুষ্ট থাকে। সাধারণ জীবের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর মানব জন্মান্তরীণ ক্লেশ ভোগ করিতে বিশেষ পটু। তাহাদিগকে বহু জন্ম এই অজ্ঞতার মধ্যে অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং ধর্ম্মগ্রন্থের কোনরূপ প্রয়োজনীয়তা আদৌ বুঝে না।

কিন্তু উচ্চস্তরের মানব বুঝিয়াও ভুল করিয়া থাকেন। কুসঙ্গ ও অত্যাসক্তিতে মনের জড়তা আনিয়া দেয়, তথাপি শিক্ষিত ব্যক্তি অন্তিমকালে ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্ম শুনিয়া, মন যদি ঈশ্বরমুখী হয়, তাহাতে উত্তম দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ ভগবৎ চিন্তন অন্তরে জাগ্রত হইলে পরম পিতার কৃপায় উৎক্রমণকালে অপূর্ব্ব স্বচ্ছন্দতা আসিয়া থাকে। এবং তৎ-কালে দেহত্যাগ ঘটিলে, পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয় ও শান্তিলাভ

করেন। পরে লৌকিক জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও সন্তোষ পাইবার জন্য মৃত্যুকালে ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণ বিশেষ কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে।

খিন্ন সঙ্গীত

ওহে মরণ পথেরি বন্ধু;
তব কৃপা লাভ করেছে যে জন
তরে গেছে ভবসিন্ধু।
প্রপঞ্চের ঘোরে ঘিরেছে অন্তর,
পড়ে আছি মোহে বন্ধু;
হৃদে নাহি বল শরীর বিকল
কোথা তুমি কৃপাসিন্ধু।
মৃত্যু আসি ওগো ডাকিছে আমারে,
বাঁচাও অনাথ-বন্ধু;
কি জানি কি গতি ভয় পায় অতি
ত্রাহি ত্রাহি জগবন্ধু।
চরমের ব্যথা কারে বলি বিভু,
অন্তিমের তুমি বন্ধু;
চেতনা দুয়ার খুলহে আমার
দেখা দাও দীনবন্ধু।

—ফণি

পার্থিব শরীর ত্যাগের সময় মনের অবস্থা কিরূপ হয়

মনের যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা প্রথমে সামান্য অনুশীলন বা অনুসন্ধান করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। মনের ক্রিয়া আমাদের এই স্থূল জগতে সকল প্রাণীর ভিতরই বর্ত্তমান। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রত্যেকের ভিতরই অল্প বিস্তর মনের খেলা বিদ্যমান। মানব 'মন' তদীয় নৈসর্গিক প্রেরণায় এবং জীবনের অর্জ্জিত চিত্তস্থিত বিষয় লইয়া, তদ্দ্বারা জ্ঞানের ও কর্ম্মের পরিচয় দিয়া থাকে।

আমাদের অন্তঃকরণের ভাব, বাক্‌যন্ত্রের আনুকূল্যে অথবা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 'মন' গ্রহণ করিয়া যখন ভিতরের চিন্তা, বাহিরে প্রত্যুক্তি দ্বারা প্রকাশ করে, তখন মনের পরিত্যক্ত বিষয়, বায়ুতত্ত্ব ও তেজস্তত্ত্বকে আধার করিয়া আকাশ-তত্ত্বে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়। তৎপরে আকাশ-তত্ত্বে যে কম্পন উঠে সেই কম্পন কর্ণেন্দ্রিয়ে প্রতিঘাত হইলেই শ্রুতিগোচর হয়। এবং তাহা বিশাল মনস্তত্ত্বে আশ্রয় পায়। যাহার শব্দ-জ্ঞান আছে, অথবা সম ভাষাভাষী তিনিই তাহা বুঝেন ও বিষয়টিকে চিত্তে স্থান দেন। তাঁহারাই উক্ত বিষয়, পুনরায় নিজ বাক্‌যন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন।

'মন' যে যে গুণাশ্রয়ী শব্দ বাক্‌যন্ত্র দ্বারা প্রকাশ করিবে বা চিন্তা করিবে, তাহা বিশ্বের বিশাল মনস্তত্ত্বে তরঙ্গায়িত হইবে; এই তরঙ্গ বহু যুগ যুগান্ত থাকে। সেই হেতু অপবিত্র মনস্তত্ত্বে মুহ্যমান বাসনা-মুগ্ধ কম্পন, পবিত্র সৎমনস্তত্ত্বের স্থিতপ্রজ্ঞ শব্দ তরঙ্গের সহিত একত্রে সংযুক্ত বা সমাবিষ্ট নাই; যেরূপ জলে ও তৈলে। সুতরাং যে সকল মানব উন্নতচেতা, যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ পবিত্র, তাঁহাদের নিকট মলিন মনস্তত্ত্বের ক্রিয়াসম্পন্ন তরঙ্গ পৌঁছায় না। তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে সহজে উন্মনা ভাব দেখা দেয় না, অথবা অন্তরে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

মহাকাশ ও ভাবাকাশ হইতে মলিন মনস্তত্ত্বের কম্পন অপবিত্র অন্তরেই সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহাতেই পাপীর মূঢ়তা বৃদ্ধি পায়। বিপদ তাহাদেরই যাহারা অপবিত্র ভাবনায় ভরপুর, হিতাহিত-বিবেকশূন্য।

তজ্জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বা ঋষিগণ সমাজের ও রাষ্ট্রের উত্তম প্রবৃত্তির অনুকূলে ব্যবস্থা করিয়া, সৎভাবনায় আনিবার জন্য বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করিয়া মানব-মন পরিশুদ্ধ করেন। এই বিধি-নিষেধ যদি পবিত্র মনস্তত্ত্বের অনুকূলে সর্ব্বোচ্চ আদর্শের লক্ষ্যস্থল না হয়, যদি তাহাতে মানবীয় সৎপ্রবৃত্তির বিকাশ না ঘটে, এবং ভগবৎমুখী উচ্চ ভাবের প্রেরণা যদি অন্তরে না জাগে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, রাষ্ট্রের বিধি-নিষেধ প্রণয়নকারী ব্যক্তিগণ অদূরদর্শী, দুর্নীতিজ্ঞ, নিম্ন স্তরের মানব। তাঁহারা সমাজ ও রাষ্ট্রের অধোগতিকারক, নাশক ও পরোক্ষে ভ্রষ্টাচার-সমর্থক। রাষ্ট্রের উত্তম ব্যবস্থায় সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইলে, প্রত্যেক সংসার উন্নত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, মানবমন পরিশুদ্ধ হয়, স্বধর্ম্মে অর্থাৎ মানবীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধা উদয় হয়। উন্নত সংসারের প্রত্যেকের মনোবৃত্তি সমধিক শক্তিশালী, সদাচারী ও পবিত্র ভাবাপন্ন হইলে, বহু ত্যাগী, তত্ত্বদর্শী ও পবিত্র-চরিত্র শ্রেষ্ঠ মানব প্রত্যেক সংসারে আবির্ভূত হন। তখন সংসার ও সমাজ শান্তিপূর্ণ এবং রাষ্ট্র শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে। পবিত্র মন লইয়া যে ব্যক্তি পরলোক গমন করেন, তিনি ধীর, শান্ত, উদাসীন ভাবে ভগবৎ প্রেমে তথায় মগ্ন থাকিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পান। ইহারা পরলোকে যাইয়া পবিত্র ভগবৎমুখী মনের জন্য সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান কালে, বহুকাল শান্তি লাভ করেন। এই সকল মনস্তত্ত্বের আলোচনা হয়ত অনেকে ভাল চক্ষে দেখিবেন না। তজ্জন্য ঋষিদিগের মনস্তত্ত্বের আলোচনায় জার্ম্মান মনীষিগণের মধ্যে পণ্ডিত ভিল্‌হেল্‌ম্ ফন হুমবুল্‌ট প্রভৃতির অভিমত দিতেছি যে, "মানুষের মনোবৃত্তি বা মনস্তত্ত্বের পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হইয়াছে আর্য্য ভাষায়।"

অতি সামান্য মনস্তত্ত্বের আভাস লিখিবার পর, পার্থিব শরীর ত্যাগের সময় মনের অবস্থা কিরূপ হয় বা হওয়া উচিত তাহা অনুমান করা সহজ হইবে। উৎক্রমণ কালে পবিত্র মনের ক্রিয়া হইবে ঈশ্বর-মুখী; আর অপবিত্র মনের ক্রিয়া হইবে কাতর আর্ত্তনাদ। ঈশ্বরমুখী মন দৈহিক যন্ত্রণাকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পারমার্থিক চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া এই ধ্বংসশীল দেহের জন্য বিশেষ কোন কাতরতাই প্রকাশ করেন না। পুণ্যাত্মাগণের মন সাহায্য পায় মহাকাশে অবস্থিত পবিত্র ভাবগুলি হইতে। তদ্রূপ অপবিত্র জীবনের পাপ কলুষিত মন লইয়া, ঘৃণ্য অমানুষী বৃত্তি ও অবিশ্বাসের পথে যাহারা জীবন ক্ষেপণ করেন, তাঁহারাও মৃত্যুকালে মহাকাশে সঞ্চিত পাপীর প্রক্ষিপ্ত মারাত্মক মনস্তত্ত্বের অপবিত্র বিষয়ের মোহে অভিভূত হইয়া অনুতপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তজ্জন্য অন্তিম কাল সমাগত হইলে জড় ভাবাপন্ন ভোগীর নাস্তিক মন ব্যাকুল হইয়া উঠে; তৎকালে অবিবেকীর ন্যায় যা-তা বলিতে থাকে।

সুতরাং পবিত্র মন লইয়া জীবন পথের যাত্রী হইতে হইবে। যদি তাহাতে অনুকূল সমাজের এবং সদ্‌গুরুর উপদেশ লাভ ঘটে, তাহা হইলে জীবন পথে কোন বিঘ্ন আইসে না; তিনি উদ্বেগ শূন্য উচ্চ অন্তঃকরণে, চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুর পরও মন থাকে। মনের অবস্থা কিরূপ উদ্ভব হয় তাহাও বলা হইয়াছে। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে, সুকৃতির ফলে মানবের অন্তরে কলুষ শূন্য 'পবিত্র' সুখাবহ সত্ত্ব ভাবের উদয় হয়; আর নির্ব্বোধ দুর্ম্মনাঃ রজস্তম গুণাশ্রয়ী ব্যক্তি হয় 'অপবিত্র', উন্মনাঃ। সুতরাং মৃত্যুকালে মনের অবস্থা ইহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

গীত

মন হয়ে এল দিন আগত সে দিন
যে দিন ভবপারে যাবি রে।
রবে অহঙ্কার মায়া ছেড়ে যাবে কায়া
সাধের দেহ পড়ে রবে রে ॥
যত আত্মীয় স্বজন করি আকিঞ্চন
বাঁচাতে নারিবে এ শরীরে।
মন দিয়ে কর্ম্মফল না রহিবি পল
কে কার আপন এ সংসারে ॥
ও ভাই সময় থাকিতে শুদ্ধ করি চিতে
পরব্রহ্ম নাম সদা জপ রে।
হবে মৃত্যুকালে মন অভ্যাস কারণ
আসিবে 'হরি ওম্' মুখে রে ॥

—ফণি।

কিরূপ বয়সে মৃত্যু হইলে উৎক্রান্তি সময়ে কষ্ট কম হয়

মৃত্যুকালে দৈহিক যন্ত্রণায় সকলেই অল্প-বিস্তর কাতর হন। ইহার কারণ এই, মৃত্যুসময়ে সূক্ষ্ম শরীর যাহা স্থূল শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সহিত ওতপ্রোতভাবে ব্যান বায়ুর ন্যায় সর্ব্ব শরীরে সম্বন্ধ রাখিয়া এবং স্থূল শরীরের প্রতিবিম্ব সদৃশ হইয়া, যাহা অন্নময় কোষের সহিত গ্রথিত ও অভিন্ন ভাবে অবস্থিত, উৎক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই তাহা পৃথক হইতে থাকে। পৃথক হইবার হেতু এই, বৃদ্ধাবস্থায় রস ধাতুর অভাব হইলে জরা দেখা দেয়; তৎকালে পঞ্চবায়ুর মধ্যে সমান বায়ুর ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইবার ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়; এবং সপ্ত ধাতুর সার 'ওজ' ধাতু শুকাইয়া যায়। তখনই স্থূল দেহ ও লিঙ্গদেহের মধ্যে সংবন্ধন বিশ্লথ হইতে থাকে। পরিণামে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরস্পর অসংযুক্ত হইয়া যায়। অতএব 'রস' ধাতু ও 'ওজ' ধাতুর অভাব যখন ও যে বয়সে দেখা দিবে, এবং তাহা পূর্ণ করিবার শক্তি না থাকিবে, তখন প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে; অর্থাৎ স্থূল শরীর জড়বৎ পড়িয়া থাকিবে ও সূক্ষ্ম শরীর পরলোক গমন করিবে। কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবে অল্প বয়সে হঠাৎ 'ওজ' ধাতুর ক্ষয় অত্যন্ত দুঃখের। তৎকালে অতৃপ্ত অবস্থা বিশেষ কষ্টের কারণ হয়।

প্রকৃতির নিয়মে 'ওজ' ধাতুর ক্ষয় সাধারণতঃ বৃদ্ধাবস্থাতেই হইয়া থাকে; তজ্জন্য অতি বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু হইলে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। যেমন আম সুপক্ব হইলে স্বভাবের নিয়মে আপনি পড়িয়া যায়, অথবা বৃন্ত রসহীন হইলে সহজে পড়িয়া যায়, তদ্রূপ। কিন্তু ঝঞ্ঝাতে অপক্ব অবস্থায় যাহা পতিত হয়, বহুক্ষণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া কষ্ট পাইয়া তৎপরে পড়িয়া থাকে। অতএব বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু হইলে স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্ম শরীর অনায়াসে পৃথক হইয়া যায়।

আর একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে, বৃদ্ধাবস্থায় প্রকৃতির নিয়মে

ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হয়, শরীর অকর্ম্মণ্য হয়, জীবনের বাসনা আকাঙ্ক্ষা ভোগস্পৃহা থাকিলেও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে এবং উদাসীন ও হতাশ ভাবের উদয় হয়, এই জগৎকে আর ভাল লাগে না। তৎকালে মৃত্যু আসন্ন হইলে, উৎক্রান্তি সময়ে শরীরের জন্য বিশেষ মানসিক কষ্টের মধ্যে পড়িতে হয় না। সেইজন্য কথায় আছে, পুণ্যাত্মারা দীর্ঘজীবী হন। আর অল্প বয়সে অর্থাৎ যৌবনে মৃত্যু হইলে সাধারণ সংসারী ব্যক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর থাকেন, তজ্জন্য মৃত্যুকালে নানাবিধ চিন্তায় মানসিক ও কায়িক যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া থাকেন। এই মৃত্যুকালীন চিন্তা, পরলোকে গিয়াও সেই মোহজনিত যে কাতরতা, তাহা দূর হয় না।

বৃদ্ধাবস্থায় ভোগ্যবস্তু ভোগের যে শৈথিল্য ও অবসাদ দেখা দেয়, তাহা অপারগতার জন্য। তজ্জন্য অল্প কারণেই মুখে মুখে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া থাকেন। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, দুর্ব্বলতা বৃদ্ধের মনকে অহেতুক ঈশ্বরমুখী করিয়া থাকে। ভগবানে আত্মনির্ভরতার মঙ্গল প্রবৃত্তি বৃদ্ধ হইলে অল্প-বিস্তর উদ্রেক হইয়া থাকে। বৃদ্ধের আসন্ন কালে যদি কেহ পরব্রহ্ম নাম তাঁহাকে শুনাইতে থাকেন, তাহাতে পরলোকে তাঁহার অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়; অল্প বয়সে তত হয় না। অতএব মৃত্যু বৃদ্ধাবস্থায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাধারণের মধ্যে উল্লেখ আছে অকালমৃত্যু দুঃখের কারণ। ইহজগতে কেহই অকাল মৃত্যু কামনা করে না; যিনি করেন তিনি মহাপাপী। পূর্ণ পরমায়ু পাইতে বাসনা সকলেরই; দীর্ঘজীবীর মৃত্যু হইলে, মৃত্যুকালে কষ্ট কম হইয়া থাকে।

উৎক্রান্তি সময়ে সুষুপ্তি অবস্থা ও শেষ সুষুপ্তির পর জাগরণ অবস্থা

প্রত্যেক জীবনে উৎক্রান্তির কাল উপস্থিত হয়। যাহাকে বলে মরণ কাল। এই মৃত্যুকাল সম্বন্ধে অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন না। অন্তরে ভীত হন, যেন সর্ব্বস্ব হারাইবেন এই তাঁহাদের ভয়। কিন্তু উৎক্রমণ একদিন সকলেরই হইবে; ইহা জানিবার ইচ্ছা করা অজ্ঞানতার পরিচয় নহে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

উৎক্রান্ত—অর্থে উদগত, উত্থিত বা উৎপন্ন। এখানে স্বতঃ প্রশ্ন উঠে, কিম্ বস্তু, কি উত্থিত বা উৎপন্ন হয়; এবং তাহার পূর্ব্বাবস্থা কিরূপ?

উৎক্রমণের পূর্ব্বে ব্যাধিতে বা অন্য প্রকারে শরীর ক্ষয় ও জীর্ণ হয়; যখন আরোগ্যের আর আশা থাকে না তখনই উৎক্রান্তির সময় আসে। তখন ক্রমশঃ শরীরে জড়ভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। স্থূল শরীর স্থির অকর্ম্মণ্য হইলেই সূক্ষ্ম শরীর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়ে, অর্থাৎ উদগত হয়।

এইবার সূক্ষ্ম শরীর বাহির হইবার পূর্ব্বাবস্থা আলোচনা করিব। আমি পরলোকতত্ত্ব অনুশীলন করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে অন্ত-কালে কিছুক্ষণের জন্য বা কিছু অধিক সময় সুষুপ্তি অবস্থায় মগ্ন থাকে। তৎকালে বাহ্য বিষয়-সম্বন্ধ তিরোহিত হয় ও কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না। কোন প্রকার বৃত্তি না থাকিলেই যে, কেবলী ভাব প্রাপ্ত হইবেন তাহাও নহে। অথবা মোক্ষাবস্থার ন্যায় মূল কারণে চির নিবৃত্তি, তাহাও নহে। হয় এই মৃত্যুকালীন সুষুপ্তি অবস্থায় বিজ্ঞানাত্মা বাসনারাশি সংশ্লিষ্ট হইয়াই মায়োপহিত চৈতন্যে বিলীন হয়। কিছুক্ষণের জন্য জীবের নির্লিপ্ত সুখময় অবস্থিতি ঘটে। কোন প্রকার অনুভূতি না থাকায়, সুখ-দুঃখ তিরোহিত হয়। মনে হয় নির্গুণ মায়ার সান্নিধ্য লাভ করে। লোকান্তর গমন কালের সুষুপ্তি

এবং ইহলোকে আমরা প্রত্যহ নিদ্রাকালে যে সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লই, তাহা ঠিক একই প্রকার। এইজন্যই মৃত্যুকালের নিদ্রার নাম হইয়াছে 'মহানিদ্রা'। অন্তঃকালের নিদ্রা ভাঙ্গে পরলোকে যাইয়া।

তৎকালে কর্ম্মেন্দ্রিয়,জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) সমস্তই সম্পীণ্ডিত হইয়া এক অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট অবস্থায় থাকিবার পর অবিদ্যা বিস্তারিত হইলে পুনরায় আপন অস্তিত্বে প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হয়। এই সন্ধিক্ষণের অনুদ্বিগ্ন অবস্থা ঘটিবার পরই, জীব আপন সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পরলোকে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এবং তথায় প্রথমে একপ্রকার স্বপ্নাবস্থায় থাকেন। পরে ক্রমশঃ জাগ্রত হন।

এই লিঙ্গ শরীরের স্বপ্নাবস্থা বড়ই অদ্ভুত। তখন তাহার বাসনা-সঞ্জাত স্মৃতিজনক সংস্কার হইতে বহু প্রকারের বিষয়রাশিই স্বপ্নে প্রতীয়মান হয়। তৎকালে তিনি পরলোকে কি না, তাহা ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তথাপি একটা অদ্ভুত কিছু ঘটিয়াছে যৎ-সামান্য অনুভব করেন। শিব গীতায়, এই সম্বন্ধে পাওয়া যায়, যথা :—

ইয়াসুঃ পরলোকন্তু কর্ম্মবিদ্যাদি সম্ভৃতম্।
ভাবিনো জন্মনোরূপং স্বপ্ন আত্মা প্রপশ্যতি ॥

'পরলোকে গমনের সম্ভাবনা হইলে কর্ম্ম ও বিদ্যাবশতঃ যে প্রকারে ভাবী জন্মের স্বরূপ লব্ধপ্রায় হইয়াছে, সেই কর্ম্মাদির বাসনা বশতঃ আত্মিক স্বপ্নে তাদৃশ জন্মাদি স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকে।'

এইবার মৃত্যুর পরের অবস্থা

পরলোকগত হইলে আত্মিক একপ্রকার কুহেলিকার মধ্যে দাঁড়াইয়া যেন দেখিতেছেন তাঁহার পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরকে। তখন তিনি নিজেকে দেখিয়া মনে করেন, তাঁহার শরীর ছোট কেন! উলঙ্গ কেন !!

মৃতদেহের পার্শ্বে যে সকল আত্মীয় আছেন, তাঁহাদিগকে বিস্ময়ের ভাবে দেখিতে থাকেন। এবং আমরা যেরূপ স্বপ্ন ঘোরে কথা কহিয়া থাকি, ঠিক সেইরূপ অর্দ্ধজাগ্রত ভাবে আত্মিক কিছুক্ষণ থাকেন ও কথা কহিতে চেষ্টা করেন। ক্রমে ক্রমে এই স্বপ্নাবস্থার ঘোর তিরোহিত হইয়া যায়। তৎপরে আত্মিকের সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা দেখা দিয়া থাকে। মায়ার টানে নিজ শবদেহের পার্শ্বে উপস্থিত আত্মীয়গণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন তাঁহার অস্তিত্ব, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া হতাশ ও অবাক হইয়া স্থিরভাবে থাকেন। এবং ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে থাকেন। পরন্তু যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ যোগী, তাঁহাদের বাসনাশূন্য অবস্থা হওয়ায়, মৃত্যুর পর বা মৃত্যুকালে স্বপ্নাবস্থা আসে না।

পরলোকে গিয়া আত্মিক যখন জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পান তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর মৃত শরীরেরই অনুরূপ। তখন তিনি আর উলঙ্গ নন। এখানকার মত পরিধেয় বস্ত্র হইতে পৃথক বটে কিন্তু উলঙ্গ নন, একটা আবরণ আছে অনুভব করেন। তৎকালে অপরিচিত অথবা পরিচিত পরলোকবাসী আত্মিকগণ, তাঁহাকে নানাপ্রকার উপদেশ দেন এবং তথা হইতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁহার স্থূল শরীর ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় অপেক্ষা করেন। তখন তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, তিনি পরলোকে আসিয়াছেন। তৎপরে আপন আপন কর্ম্মফলানুযায়ী স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। নবজাত বিদেহীকে, আগত আত্মিকগণ সঙ্গে লইয়া যথাস্থানে চলিয়া যান।

মৃত্যুর পর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্যক্‌ভাবে থাকে

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়া যখন সূক্ষ্ম শরীরের জাগরণ আইসে, তখন অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পরিপূর্ণ ভাবে থাকে। তবে তাহা স্থূলের মত ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নহে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার সামান্য আভাস দিয়াছি। ইহলোকে যেরূপ আমিত্ব ছিল, পরলোকে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না, এখানকার অপেক্ষা ঐ সূক্ষ্মভাবে তদাত্মক ক্রিয়া তাহার স্পষ্ট হয়; আত্মিক মনে করেন যেন পরিপূর্ণ জীবন পাইয়াছেন। তখন তাঁহার ইহজীবনের সকল ঘটনা মনে পড়িতে থাকে। কারণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকারের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে না। দেখিতে পান, শুনিতে পান, কথা বলেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা স্থূল জগতের লোক শুনিতে পায় না। অদ্ভুত তাঁহাদের ইন্দ্রিয়। ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ বিষয়।

বহু আত্মিক তথায় বাসনা বহ্নির জ্বালায় অস্থির হন। তখন তাঁহারা ভাবেন, 'শুধুই চেয়েছি, চাই নাই বিভুকে'। তখন তাঁহার অন্তর আক্ষেপে ও বিলাপে ভরিয়া যায়। সেখানে আত্মিক চিন্তা করেন, দুঃখের মধ্যে থাকিয়া করিয়াছি সুখের আকিঞ্চন; ভিক্ষুক হৃদয়ের মত কত প্রত্যাশাই না করিয়াছি। সংসারে থাকিয়া বহু উপকরণ, যথেষ্ট ধন বৈভব সংগ্রহ করিয়া, আমার আমিত্বকে বলীয়ান করিয়া, অহমিকায় ভরিয়া ছিলাম। আমি কি নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়াছি; এ যে দেখিতেছি সকলই আজ কিছুই আমার অধিকারে নাই, সম্পূর্ণ নিঃস্ব। আমি তখন ভাবিতে পারি নাই, বিশ্বাস করিতে পারি নাই, এই বঞ্চিত দশায় উত্তপ্ত নিরন্ধ্র ব্যাকুলতার মধ্যে দগ্ধ হইব। একি অশান্তি, এ-যে তিমিরাবৃত অবস্থা, নৈরাশ্য নিশীথের বাতাসে আশার আলো সব নিভিয়া গিয়াছে, কেবল অন্ধকার। ভগবান আমাকে বল দিন, অন্তরে ধৈর্য্য দিন, আমাকে অনাকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল আলোকে

একটিবার স্নান করিয়া উঠিবার শক্তি ও সুযোগ দিন, আর ভুল করিব না। একি দারুণ বিপন্ন অবস্থা, একি বাসনার ক্লেশ, অসহ্য তীব্র বেদনা !

মায়ামুগ্ধ আত্মিক পরলোকে গিয়া চৈতন্য উদয়ের পর এই নিষ্ফল কাতরোক্তি ও খেদ করিয়া থাকেন। ইহলোকে অনিত্য সুখানুসন্ধানী বহু ব্যক্তি পরলোকে এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য ইহজীবনে বিদায়ের অর্থাৎ উৎক্রমণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শত কর্ম্মের মধ্যেও সেই শাশ্বতী গতির আনন্দ লাভের জন্য, ভগবৎ চিন্তন করা বিশেষ আবশ্যক। প্রতিদিনের চলার পথে বিভুর খোঁজে, বিরহীর ন্যায় বিহ্বল হইয়া, অন্তরের মধ্যে অনন্তের ভালবাসা লইয়া আত্মসমর্পণ করা চাই। নচেৎ পরলোকে গিয়া ক্লেশকর শোচনীয় অবস্থায় পড়িতে হইবে। কেহ মনে না করেন, সেখানে অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় ও স্মৃতি লোপ পায় এবং বিবেক বুদ্ধির অভাব ঘটে, অথবা মৃত্যুর সঙ্গে সকল নাশ হইয়া যায়। অনুসন্ধানহীন অবিশ্বাসী অবিবেকীর ভ্রান্ত অভিমত এই যে, মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না, সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়। জানিয়া রাখুন বিভিন্নরূপে সমস্তই থাকে। ইহা সূর্য্যালোকের ন্যায় সত্য।

জীবনের পরিণাম

আমি যুবক যখন ভেবেছি তখন
এ জীবনের আর নাহিক শেষ
নিয়তির নীতি দেখে হয় ভীতি
ক্রমে দন্তহীন আর শুভ্র কেশ।

ওগো, ভাবিতাম আমি মরণের পরে
করমের শেষ হয় একেবারে
ও তাই অসার শিক্ষা দিয়েছিল মোরে
না জাগিল মোর বিবেকের লেশ,
আশার কুহকে প্রতিটি পলকে
ও হো হো, ছন্দেছি কত সুখ আবেশ।

আমার, বিবাহ বাসর এখন স্মরণে
লভিব রূপসী বহু আভরণে
আজ, কোথা সব গেল না হেরি নয়নে
উঃ, বেদনা কাতর মরণ-বেশ
লয়ে বাসনার নেশা, প্রাণেতে হতাশা
এবে, চলেছে কাঙ্গাল পুরাণ দেশ।

কম্পিত অন্তর কেন হয় ওরে
পুত্র মিত্র আসি বিলাপ করে রে
আজ কত চিন্তা উঠি দহিছে অন্তরে
রহে গেল কাজ করম অশেষ
এবে, বিদায়ের কালে কাঁদিছে সকলে
চলি, পরলোক দ্বারে বিদেহী বেশ।

(পরলোকে প্রবেশের পর)

একি যাতনা দিতেছে বাসনার বিষে
কেহ ভাবে নাক ইহলোকে এসে
রঙ্গ সাঙ্গ হল মোহেরি আবেশে
এ বিফলে জনম করেছি শেষ
মোরে রক্ষা কর, বিভু, করিবনা কভু
করুণা অপার দাও উপদেশ।

দেখি, বাসনা শরীর বিদেহী সকলে
ব্যঙ্গ করে তারা হাসে খল্ খলে
কুকর্ম্মের হুঁস্ হয় পরকালে
আজ ভেঙ্গেছে মনের তন্দ্রাবেশ
একি ভীষণ আঁধেরা, লইয়া ইহারা
কোথা যায় অসহ দুরন্ত দেশ।

—ফণি

সপ্তম স্তবক

পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে
কয়েকটি জানিবার বিষয়

সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীবন যাঁহাদের, তাঁহারা মৃত্যুর পর নিজ নিজ কর্ম্মফলানুযায়ী সূক্ষ্ম জগতে সেই সেই লোকে প্রথমে প্রয়াণ করেন। তথায় পার্থিব জগতের সুস্পষ্ট স্মৃতি উদয় হইলে, চিত্তস্থিত বিষয়ের তাড়নায় একটা ভয়ঙ্করী উৎকণ্ঠা দেখা দিয়া থাকে; তখন মায়ার টানে সূক্ষ্ম জগৎ হইতে এই স্থূল পৃথিবীতে আগমন করেন। যাঁহারা পার্থিব জীবনে মানসিক সুস্থতাহীন, বিষয় বৈরাগ্যহীন দশায় অথবা সঞ্চিত অর্থ গুপ্তভাবে রাখিয়া বা কাগজপত্র অজ্ঞাত ভাবে রাখিয়া পরলোক গমন করেন, প্রায়শঃ তাঁহারাই প্রেতদেহটি লইয়া এই পৃথিবীতে নিজ নিজ সংসার দেখিতে আসেন; এবং শান্তি পাইবার মানসে বহুবিধ কার্য্য করেন।

ক
বিদেহী তাঁর আত্মীয়স্বজনকে দেখিতে আসেন কি না

পার্থিব জীবনের কার্য্যকলাপের উপরেই পারলৌকিক অবস্থা নির্ভর করিয়া থাকে। প্রথমতঃ পরলোকে যাইলে, বিদেহিগণের চিত্তচঞ্চলতার জন্য তথাকার উপদেষ্টা বা সহায়কগণ প্রথম প্রথম বিশেষ কিছু চাপ দেন না; তাঁহারা নবাগত আত্মিককে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেন। মায়ার টানে সংসারমুখী হইলে, অত্যন্ত কষ্ট হইবে

তজ্জন্য স্থূল সংসারের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিতে নিষেধ করেন। তত্রাপি অভ্যাসের দোষে মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ লাভ করিয়াও পার্থিব জগতের আত্মীয় স্বজনকে পুনঃ পুনঃ ব্যাকুল ভাবে দেখিতে আসেন। যদি সম্ভব হয় কিছু উপকারও করেন। এ সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু প্রমাণ পাইয়াছি। চক্রের বিবরণের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন।

খ
পরলোকবাসী প্রত্যেক গ্রহের খবর জানেন কি না

পরলোক বিদ্যা অনুশীলনকারী অনেকেই এ সম্বন্ধে কিছু না কিছু প্রশ্ন নিশ্চয়ই করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, জিজ্ঞাসুগণ তাহার কোন সদুত্তর পান নাই। তাহা হইলে অসংশয়ে তাহা প্রকাশ করিতেন। এখানে বিবেচ্য বিষয় এই, আমরা স্থূল চক্ষে যাহা দেখিতে পাই, তাহাকে স্থূল বলিয়াই ধরিতে হইবে। গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জড় উপাদানে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। আমাদের এই বিশাল পৃথিবীও একটি গ্রহ। ইহার সূক্ষ্ম জড়াংশের সহিত আত্মিকগণ সংযোগবিশিষ্ট। মানবাত্মা মৃত্যুর পর স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া, যে লোকে যান তাহা সূক্ষ্ম জগৎ। এই সূক্ষ্ম জগতের পর সূক্ষ্মতম লোক আছে। উচ্চ ভগবৎ-প্রেমী আত্মিকগণের গতি সেই লোকে হইয়া থাকে।

আত্মিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে, কোন গ্রহের খবর তাঁহারা দিতে পারেন না। ইহা দ্বারা মনে হয়, প্রত্যেক গ্রহের জড়াংশ ও সূক্ষ্মাংশের একটা সীমারেখা আছে। পার্থিব শরীর ত্যাগের পর কোন আত্মিক চক্রে আসিয়া বলেন অন্ধকারে আছেন, কেহ এক প্রকার স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে, কেহবা সূর্য্য দেখিতে পান, চন্দ্র দেখিতে পান না। প্রত্যেক আত্মিককেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও নিয়মানুশাসনের মধ্যে থাকিতে হয়। কল্পনাতীত বিশাল বিশ্বের ব্যবস্থা পদ্ধতি অতি বিস্ময়কর। মহামায়ার কি চমৎকার লীলা! সুতরাং আত্মিকগণের নিজ ইচ্ছায় কোন গ্রহের খবর রাখা, অথবা তথাকার সূক্ষ্মাংশে প্রবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে

করা যাইতে পারে। অতএব অন্যান্য গ্রহের সহিত ইহারা একপ্রকার সম্বন্ধ রহিত। যেমন অন্য গ্রহের কোন আত্মিক আজ পর্য্যন্ত কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্ত্যে, কাহারও চক্রে আসেন নাই। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে যে, আমাদের আত্মিকগণ অন্য কোন গ্রহের খবর রাখেন না বা অন্য গ্রহের কথা তাঁহাদের জানা অসম্ভব।

গ
পরলোকে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ অনুভব করেন কি না

সমীক্ষণ দ্বারা জানা গিয়াছে, আত্মিককে আহ্বানের পর তাঁহাদিগকে স্ত্রী, পুরুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিয়াছেন যে, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে তাহা তাঁহারা স্পষ্ট অনুভব করেন।

আত্মিকগণের জন্ম ভূর্লোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যখন হয়, তখন প্রায়শঃ স্ত্রী কিংবা পুরুষ স্ব স্ব জাতি হইয়াই জন্ম লন। এ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় না তাহা নহে। পবিত্র কর্ম্মানুসারে কখন স্ত্রী পুরুষ হইয়া, অথবা কর্ম্মদোষে পুরুষ স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; আত্মিক-গণের মন্তব্য হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়। আর একটি বিষয় জানা গিয়াছে যে, এখানে আমরা যাঁহাদিগকে 'দাসী' বলিয়া উল্লেখ করি, গুণময়ী সত্ত্বস্থা নারীমাত্রেই পরলোকে তাঁহাদিগকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। এখানের নিয়ম সেখানে কিছুই খাটে না। পরলোকে স্ত্রী-জাতির আদর মর্য্যাদা যথেষ্ট। পরন্তু শাসনের বা রীতি-নীতির মধ্যে থাকিতে হয়। এই সকল আত্মিক চক্রে মিডিয়মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যখন কথা কহিতে থাকেন, তখন কোন গোপন তথ্য প্রকাশ করিয়া না দেন, কে কোথায় জন্ম লইয়াছেন তাহা বলিয়া না দেন, তজ্জন্য বহু প্রহরীর ব্যবস্থা থাকে, তাঁহারা সঙ্গে আসেন।

ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মুখে, প্রেত প্রদত্ত সংবাদগুলির একীকরণ দ্বারা বেশ বুঝা যায়, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ থাকে বলিয়াই মায়ার টান হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও কল্যাণের হেতু

পৃথক পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও তাঁহারা আতিবাহিক দেহসুলভ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সংবেশন ব্যবহার-রহিত। পরন্তু পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ কখন কখন হইয়া থাকে।

অন্তরীক্ষ স্তরের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে রাখিয়া, তথাকার উপদেষ্টা অথবা গুরুগণ, বাসনার বিরুদ্ধে সতত সফল সংগ্রাম করিতে উপদেশ দেন। সেখানে নিয়ম শৃঙ্খলার অতি সুকঠোর ব্যবস্থা। কোনরূপ বিষয় চিন্তা করিলেই, চিন্তামূর্ত্তি প্রকাশ পায়; এবং সত্যদর্শী উপদেষ্টা তাহা দেখিয়া অস্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ হইলে দণ্ড দিয়া থাকেন। নচেৎ শান্তি ও স্বস্তি প্রদান করেন। ইহা স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান ব্যবস্থা।

এই স্ত্রী, পুরুষ এবং বালক বালিকার আত্মিকগণকে কেন পৃথক রাখা হয়, সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানা যায় মাত্র। কারণ বিশাল সূক্ষ্ম জগৎ অতিশয় দুর্ব্বোধ্য। অতীন্দ্রিয়ের জ্ঞান সম্যক্‌ভাবে সাধারণ মানব বুদ্ধির বিষয়ীকৃত হইবে কিরূপে! পরলোকবাসী আত্মিক মিডিয়মের সাহায্যে যাহা বলেন, তাহাকেই বিশ্বাস করিয়া সমীচীন বলিয়া মানিয়া লওয়াই উচিত। অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিলে, অবিশ্বাসের স্তরে নিজেকে নামিয়া আসিতে হইবে। অবিশ্বাসীর পরলোক চর্চ্চা করা অসম্ভব। আর অবিশ্বাসীকে আত্মিকগণ বড়ই ঘৃণা করেন, এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের ক্রোধের মধ্যেও পড়িতে হয়। পরলোক তত্ত্ব আলোচনা করিলে এই সম্বন্ধে সকলেরই ভ্রম ভ্রান্তি নিরসন হইবে ও সত্য কি তাহা জানিতে পারিবেন—এইটুকু মাত্র স্পষ্ট ভাবে বলিতে পারি।

পরলোক সম্বন্ধে যাঁহারা বিশ্বাসহীন বা উদাসীন তাঁহাদের জানা উচিত, সীমার বাঁধনে আমরা সকলেই বাঁধা। কিন্তু জ্ঞানচক্ষে দেখিয়াছেন কি, আমাদের জ্ঞানের সীমা কোথায়? আমরা পার্থিব, কি পারত্রিক, এই বিশাল সৃষ্টি রহস্যের, স্থূল বা সূক্ষ্মাংশের কণা মাত্র জ্ঞান কি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি? অথচ গুটিকত ইংরাজী বাঙ্গালা

ঘ
তর্পণের জল পর-লোকবাসী-আত্মিক পান কি না

শব্দ শিক্ষা করিয়া অন্তরে সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান লইয়া, কতই না বোধের পরিচয় দিয়া থাকি !

আর্য্য ঋষিগণ কঠোর তপস্যা ও কৃতসংযম হইয়া, অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ করিয়া, দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে সূক্ষ্মজগতের বিষয় সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়া এই স্থূল পার্থিব জগতে তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা সমুদ্দিষ্ট হইয়া ভেদপ্রত্যয়ীগণও একদিন বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য বহু পুরাণ যুগ হইতে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। পঞ্চমহাযজ্ঞ অর্থাৎ বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ, অগ্নিহোত্র, ভূতবলি ও অতিথি সেবা।

এখন যদি তর্পণ সম্বন্ধে কেহ বলেন, অনেক নিম্নস্তরের অজ্ঞ সুপুত্র তাহার উত্তর দেন, 'মরা গোরু কি ঘাস খায়'? এই সকল ক্ষেত্রে বৃথা তর্ক করা কোন মতেই শ্রেয় নয়। এখানে ঋষিগণের ব্যবস্থা যখন হার মানিয়াছে, তখন বলিতে হয় যে, এই সকল ভেদপ্রত্যয়ী লোকায়তিক বা নাস্তিক ব্যক্তি, তদীয় পিতাকে যাহাই বলুন না কেন, সেখানে আমরা নীরব।

এই বিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা পরলোক সমীক্ষ করেন, তাঁহারা সমর্থন করিবেন, তর্পণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। আমার এক সোদর প্রতিম বিশিষ্ট বন্ধু, যাঁহাকে আমি দাদা বলিতাম, আমার পিতৃবিয়োগের পর তিনি বলিয়াছিলেন, অন্ততঃ প্রত্যেক বৎসর যথাকালে পিতৃতর্পণ করিতে ভুল করিও না। তখন আমার বয়স আনুমানিক ছাব্বিশ বৎসর। এই দাদা কলিকাতাবাসী। বৌবাজারে অক্রুর দত্তের গলিতে তাঁহার বাটী। তিনি অক্রুর দত্তেরই বংশধর। তাঁহার নাম গোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা। যখন তিনি তর্পণ সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। বর্ত্তমানে আমার বয়স সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তর্পণ বন্ধ হয় নাই।

উক্ত দাদার পুরাণ স্মৃতি লইয়া, তর্পণ করা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি যে চক্র করি, তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছি,

আমাদের দেওয়া জল তাঁহারা পান। আত্মিককে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "ঐ জলই ত আমরা খাইয়া তৃপ্ত হই"; "কতক্ষণে ঐ জল পান?" "তৎ-দণ্ডেই পাই"। আরও ভাল ভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য, একদিন তর্পণের সময় একাকী গোপনে আমার সহোদরা ভগ্নীকে জল দিই, এবং তাঁহাকে সন্ধ্যায় চক্রে আনিয়া জিজ্ঞাসা করি, "দিদি আপনার পুত্র মোহন জল দিয়াছিল, পাইয়াছেন কি?" উত্তর দিলেন "হাঁ"। "আর কে জল দিয়াছিল?" "তুইও ত জল দিলি"। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তখন মনে হইল নিশ্চয়ই এই তর্পণের জল তাঁহারা পান। ইহা আমার জ্ঞানমত সত্য।

তবে এই জল আত্মিকগণ কিরূপে প্রাপ্ত হন, ইহা শূন্যমার্গে কিরূপে চলিয়া যায়? এ যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার। মনে হয় পিতৃলোককে আহ্বানের পর যে অপ্‌ বা জল যাহা আমরা প্রদান করি তাহা পঞ্চভূতের তন্মাত্রে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, যাহাকে তদাত্মক বলা হয়, সেই সূক্ষ্ম অপ্‌-তন্মাত্র আত্মিকগণের পানোপযোগী হইয়া তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করে; ইহাই আমার বিশ্বাস। কারণ আত্মিক আর তন্মাত্র, দুটিই সূক্ষ্ম পদার্থ। ঋষি সম্পাদিত অমোঘ মন্ত্রবলে এই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইহাই ঋষিদিগের দিব্যজ্ঞানের পরিচয়। আমরা জড়দেহ লইয়া যে জল পান করি তাহা পার্থিব। কিন্তু ভুবর্লোক অথবা স্বর্গলোক-সুলভ অপার্থিব জল, দ্রুত গতিসম্পন্ন তদাত্মক পরমাণুপুঞ্জ। ইহা শ্রদ্ধাপূর্ণ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ভুবর্লোক বা স্বর্লোক-সুলভ জড়াংশে পরিবর্জ্জিত হইয়া আত্মিকগণের নিকট পৌঁছে; অতএব ইহা চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় হইতেই পারে না। সুতরাং অবিশ্বাস করা বিধেয় নহে। পার্থিব জীবনে তর্পণ আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে একটি শুভানুষ্ঠান। প্রত্যেকেরই যথাকালে শাস্ত্র বিধিমত ইহা করা শ্রেয়। পিতৃ বিয়োগের পর পুত্রের কার্য্য যদি পুত্র না করে, তাহা হইলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তর্পণ সম্বন্ধে চক্রের বিবরণের মধ্যে প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাইবেন।

● অষ্টম স্তবক

প্রাচীন পরলোক তত্ত্ব বিজ্ঞান মণ্ডলের পরিচয়

ইং ১৯৩৯ সালে জব্বলপুর সহরে, মিলুনিগঞ্জের নিকট সূর্য্য মহল্লা গলির প্রান্তভাগে একটি দ্বিতল বাড়িতে 'প্রাচীন পরলোকতত্ত্ব বিজ্ঞান মণ্ডল' স্থাপিত হয়। এই অনুধ্যান কেন্দ্রের সভ্য সাত আট জন মাত্র ছিলেন। মহিলা সভ্যা দুই জন মাত্র ছিলেন। মণ্ডলের সকলেই নিয়মানুযায়ী ছিলেন। আমাদের ভিতর দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, যতদিন না আমরা কৃতকার্য্য হইব, ততদিন নিয়মিতভাবে চক্র করিব। মণ্ডলের ব্যবস্থা ও নির্দ্দেশমত সভ্য সভ্যাগণ ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতেন। তাঁহারা আসিয়া মুখ-হাত-পা ধুইবার পর কিছুক্ষণ ভগবৎ চিন্তন করিতেন। চক্রপতির (গ্রন্থকার) জন্য উপাসনা কক্ষ পৃথক ছিল। মনস্থির করিবার অভ্যাসের পর, গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে চক্রের ঘরে যাওয়া হইত। বাড়িটি একেবারে নীরব নিরিবিলি ; অন্য কেহ ভাড়াটিয়া নাই। বাড়িটিতে ইলেকট্রিক ছিল না, তজ্জন্য একটি হ্যারিকেন আলো, ছোট কুলঙ্গির মধ্যে কাল পর্দ্দা দিয়া ঢাকা থাকিত। তাহাতে ঘরটি অন্ধকার মনে হইত।

প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া চক্র করা হইত। সন্ধ্যার পর চক্র আরম্ভ হইত। আমাদের চক্রে বসিবার জন্য একজন মহিলা প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আসতেন। তাঁহার নাম ছিল 'মুন্নি'। সময়ে সময়ে

আরও মহিলা উপস্থিত হইয়া চক্রে বসিতেন। প্রথম আমরা ২৮ দিন নিষ্ফলভাবে বসিবার পর, বঙ্গের একটি খৃষ্টান মহিলার আত্মিক চক্রে আবির্ভূত হন। সেই দিন মিডিয়ম হন 'মুন্নি'। কিন্তু মিডিয়ম মুখে কিছু বলিতে না পারায়, একটি উড্ পেন্‌সিল তাঁহার হস্তে দিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি ধরিয়া লইলেন, এবং কাগজের প্যাডের উপর প্রশ্নের উত্তর লিখিতে লাগিলেন। মুন্নি ইংরাজি জানিতেন না, কিন্তু যে আত্মিক আসেন তিনি তাঁহার নাম ইংরাজিতে 'লুসি' লিখেন। সকলের তরল বিশ্বাস সে দিন গাঢ় হইয়া উঠে।

তৎপরে দুই এক দিন লিখিয়া উত্তর দিবার পর, মিডিয়মের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আর একদিন 'মুন্নি' মিডিয়ম হইয়াছেন, কিন্তু উড্ পেন্‌সিল ধরিতেছেন না; অধর ওষ্ঠ কাঁপিতেছে, প্রশ্ন করিতে মুখে উত্তর দিতে লাগিলেন। বহু প্রশ্ন সে দিন করা হয়। এই দিনও 'লুসির' আত্মিক আসিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা বেশ বুঝিতে পারিতাম, লুসির পবিত্র আত্মিক আমাদিগকে স্নেহ করিতেন। তজ্জন্য তিনি যে দিন চক্রে আসিতেন তৎপূর্ব্বেই আসিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতেন এবং ঠিক সেই দিনই আসিতেন।

একদিন ভিতর হইতে চক্রঘরের দরজা শিকল দ্বারা বন্ধ আছে, আমরা টেবিলের চারিদিকে বসিয়া স্তোত্র, গান শেষ করিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ দরজায় জোরে যেন কেহ ধাক্কা মারিলেন। আমরা সকলেই চকিত হইয়া উঠিলাম। নিচের দরজা বন্ধ, বাড়িতে আর কেহ নাই, যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই চক্রের ঘরে, এরূপ ভাবে কে ধাক্কা মারিল! কিছুক্ষণ পরে মিডিয়মের উপর যখন আত্মিকের আবেশ হইল, তখন জিজ্ঞাসা করায়, আত্মিক বলিলেন, "দরজায় ধাক্কা আমিই দিয়াছি।" কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলেন, "একটি সূচনা দিয়া আসিলাম।" আত্মিকগণ মধ্যে মধ্যে মজাও করেন।

এই 'প্রাচীন পরলোকতত্ত্ব বিজ্ঞান মণ্ডল' অনেক দিন ছিল। আমার সহকারী চক্রপতি মাস্টার জীবনলাল মারা যাইবার পর তত্ত্ব

মণ্ডল বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হই। কারণ আমার সময় অত্যন্ত কম ছিল; উপযুক্ত সহকারীর অভাব, নানা ব্যাপারে অনেকেই ভীত হইতেন, তজ্জন্য বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমি বহুস্থানে চক্র করিয়াছিলাম; তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তন্মধ্যে কতকগুলি এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। পরলোক তত্ত্ব বিজ্ঞান মণ্ডল হইতে চক্র করিবার একটি যন্ত্র, যাহার নাম 'আত্মনীন' যন্ত্র রাখা হইয়াছিল, তাহা এখনও আমার নিকট আছে।

মণ্ডলের প্রার্থনা, স্তোত্র ও গীত

[চক্রে বসিবার প্রথমে চক্রপতির প্রার্থনা]

হে পরম পিতা পরমেশ্বর, হে করুণাময় বিভু, আপনার অপার কৃপায় এবং আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ আহ্বানে অদ্যকার চক্রে যেন কোন পবিত্র আত্মিকের আবির্ভাব হয়। আমাদের ভিতর সন্দিগ্ধচেতা ব্যক্তি হয়ত থাকিতে পারেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ও আত্মোন্নতির জন্য পরলোক-বাসী আত্মিকগণের আগমন বাঞ্ছনীয়। আমরা পরলোক সম্বন্ধে পরিজ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের অন্তরের ভ্রম, ভ্রান্তি সম্যক্‌রূপে নিরসন করিতে চাই। আমরা পবিত্র আত্মিকগণের উপদেশে যেন নিজ নিজ জীবনের কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে সমর্থ হই। হে আত্মভূ, আমরা মনোহত না হই। কোন বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে পতিত না হই। সঙ্কল্পে সিদ্ধি দিন।

তৎপরে পরমাত্মার স্তোত্র পাঠ

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণেব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতি প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপ প্রকাশিন্, অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব, জগদ্ভাসকাধীশ পায়দে পায়াৎ॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্বোধি পোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

———

পরব্রহ্মের প্রণাম

'ওঁ নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ॥
শান্তায়াব্যক্ত রূপায় মায়াধারায় বিষ্ণবে।
স্বপ্রকাশায় সত্যায় নমোঽস্তু বিশ্বসাক্ষিনে॥

———

গুরুকে প্রণাম

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বং নমামি॥

মণ্ডলে নিম্নলিখিত গীতগুলি সাধারণতঃ মৃদুস্বরে গাওয়া হইত

গীত—১

বিভু কেন থাক অদৃশ্য নিকেতনে।
(হরি) তুমি যারে বুঝাও সেই বুঝে,—
থাক তুমি কোন্ খানে।
ভক্ত বলে বিশ্বপ্রভু
প্রেমে দেখা দেন কভু
আমি প্রেমহীন দেখিব কেমনে;
সংসার সংসর্গ দোষে
প্রেমেরি বিকার বশে
চিন্তনহীন প্রভু কৃষ্ণ ভজনে।
তুমি কৃপা কর যারে
মুক্তি পায় সে এ সংসারে
তত্ত্ব বোধ দাও তারে দর্শনে;
(আমার) শুভ বুদ্ধি নাই ঘটে
তৃপ্তি নাই ভবেরি হাটে
ভুল ভেঙ্গে দাও প্রভু জীবনে।
বিশ্বভরা ভূমা তুমি
(তবে) ভ্রান্তি বশে কেন আমি
সত্যের সন্ধান দাও স্মরণে
অজ্ঞানীর নাই শক্তি
দাও হে অন্তরে ভক্তি
নিষ্ঠা যেন আসে তব সাধনে।

—ফণি

গীত—২

মা মা বলে ডাকি তোরে
সাড়া দিস্‌না কেন কালা মেয়ে ;
কানেতে কি খোল হয়েছে
আছিস মা তাই চুপটি দিয়ে।
বিশ্বমাতা হয়ে কেন
জেগে ঘুমাও মাগো মগ্ন হয়ে,
উঠ মা করুণাময়ী
জেগে উঠ না মা ছেলের রায়ে।
(মা তোর) যে ছেলেটি কেঁদে উঠে
অমৃত দাও মা আদর দিয়ে,
মুক্তি পায় সে জন্ম হতে
মম হৃদি কাঁপে মরণ ভয়ে।
মায়া ব্রহ্ম জালে ঘিরে মা—
কেন রাখিস মোরে শাস্তি দিয়ে,
পায়ে ধরি মুক্তি দে মা
হাঁপ্‌ ছাড়ি মাগো বাইরে গিয়ে।
আর্ত্ত শরণাগত মাগো
করুণা কর মোর দুঃখ চেয়ে,
মোহ দিয়ে মা মহামায়া
আর ঢং করিস ন কালা হয়ে।
কালা মা বিষম কালা
গড় করি তোর অভয় পায়ে
আদর করে কোলে নে মা
ঘুমিয়ে পড়ি তোর কোলে শুয়ে।

—ফণি

গাত—৩

(বাউল)

আশা ছাড় আত্ম ভজ দ্বন্দ্ব ত্যজ
ও ধাঁধায় পড়া মন।
মানাভিমান দিচ্ছে ঠেলা, এ যে মায়ার ভেল্কি বিষয়
জন,—
কেহ নয় আপন।
ধন দৌলত কোটা বাড়ী থাকবে পড়ি,—
যাবার বেলা নিঃস্ব যাবি মিলবে না কড়ি,
কার লাগি ভাবিস ওরে আশার ঘোরে
তোরে রিক্ত করে ছটা জন,—
কেহ নয় আপন।
ভবে জীবন হেঁয়ালি (মন) বুঝতে নারিলি,
গোলক ধাঁধায় ঢুকে তুই রাস্তা হারালি ;
হেথা মোহের ঠেলায়, ভোগ্য মেলায়
এ ভাঙ্গে না ভুল আজীবন,—
এ মায়ারি স্বপন।
মন তুই অর্থ বিলাসী (তোর) ঢং দেখে হাসি
পঞ্চভূতের দেহ ছাড়লে হবি সন্ন্যাসী ;
শেষে তুই শূন্য হাতে চলবি পথে,
ভবে কর্ত্তা সাজা অকারণ,—
সমঝে চল মন।
শুন বন্ধু দেবে বলে, ভাই সকল,
দ্বন্দ্ব ছাড়া মনের মাঝে তত্ত্ব ধন মিলে,
এ পারে মায়ার ঘোরে, মউজ করে
ওরে, পাবিনা রে শান্তি ধন,—
সবই অকারণ।

নিরাধার চিত্তে চলিলে (মনে) শান্তি যে মিলে,
মাভৈঃ পাবি আত্ম নারাণ সাধন করিলে,
ছেড়ে দে ফলের আশা, থাকবি খাসা
(মন) রবে না মায়ার বাঁধন,—
হবে সানন্দ জীবন।

—ফণি

গীত—৪

'মা,—মাগো কৃপা কর সন্তানে এবার,
তব স্নেহ আশে রয়েছে শরীর
মন ব্যাধি মাগো করে গো অধীর
পঞ্চভূত দেহ হবে যবে স্থির
হৃদিব্রহ্ম দ্বার খুলো একটি বার।

শরণাগত মাগো এ দীন সন্তান
অশ্রু দিয়ে স্বকর্ম্ম করিগো প্রদান
মা, দিন চলে গেল এল যে নিদান
করুণাময়ী উমা কর গো উদ্ধার।

জ্ঞান চক্ষু খুলে দেগো মা শঙ্করী
ভবে ক্লেশ ভার (আর) সহিতে না পারি
বাসনার চাপে (মন) হয়ে গেছে ভারি
কি করি কি করি মা, অশুভ অপার।

দয়াময়ী নাম ধর মা ভবানী
কর্ম্ম-ফেরে পড়ি কাঁদিগো জননী
পুনঃ জন্ম জ্বালা দিওনা ঈশানী
মাগো, ছুটে যায় যেন মায়া অবিদ্যার।

—ফণি

গীত—৫

(প্রসাদী সুর)

মা আমার মন পাগ্‌লা কেনে,
তারে শান্তি কর মা বসুক ধ্যানে।

এ পাগল মন থাকে না ঘরে ;—
জপে বসে মা ঘুরে মরে,
এর ওষুধ বলে দে না মাগো, খাইয়ে দেখি খুঁজে এনে।

কানে মন্ত্র দিয়ে মা হররমে,—
গুরু গেছেন তব ধামে
এ যে শুধাই কারে বলে দে মা,—যদি ক্ষ্যাপা মন্‌টা মানে।

মন সুখের নেশায় ক্ষেপে উঠে—
মা,—অস্থির সে মরে ছুটে,
বিবেকরূপী লগুড় মেরে মা, (মনের) ঠ্যাং ভেঙ্গে দে একটা টানে।

মায়ের স্নেহ পায় অন্ধ ছেলে
বড় দুঃখ মা, দৃষ্টি গেলে
একবার খুলে দে মা দিব্যচক্ষু, দেখি আনন্দেতে পরম জ্ঞানে।

—ফণি

চক্র করিয়া পরলোকবাসীকে আনিবার পদ্ধতি

ভূর্লোক ব্যতীত অন্যলোক হইতে আত্মিকগণ আসিয়া এই পার্থিব দেহধারী ব্যক্তিগণের সহিত মিডিয়মের সাহায্যে কথোপকথন করিয়া থাকেন। সে কিরূপে করা যায় তাহাই এই প্রবন্ধের কথনীয় বিষয়। প্রথমতঃ জানিয়া রাখা উচিত, মনস্তত্ত্বের সাহায্যেই প্রেততত্ত্ব সাধিত হয়। যে নৈসর্গিক উপায়ে পরস্পরের অর্থাৎ আত্মা ও পরলোকবাসী আত্মিক, এই উভয়ের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়, ইহা হইতেছে মনস্তত্ত্বের একটি অংশ।

যাঁহারা চক্র করিবেন বা চক্রে বসিবেন, তাঁহাদের যথেষ্ট মনোবলের প্রয়োজন। মনোবল বৃদ্ধির উপায় সংযম ও ভগবৎ-চিন্তন। আর শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, শীতবীর্য্য আহারই পরলোক তত্ত্বানুসন্ধানীর পক্ষে প্রশস্ত। পেট ভরিয়া খাইয়া কখনও চক্রে বসিতে নাই। যেদিন চক্র করিবেন বা বসিবেন, অন্ততঃ দুই দিন পূর্ব্ব হইতে বা তৎপূর্ব্ব হইতে কাম, ক্রোধ ও লোভ বর্জ্জন করিতে হয়। নিরামিষ ভোজন আবশ্যক।

কিরূপ ব্যক্তির উপর আত্মিকের সমাবেশ হয়

যাঁহারা চিন্তাশীল, সরল ও ভাবুক স্বভাবের, তাঁহাদের উপরেই সাধারণতঃ আত্মিক সমাবেশ হইয়া থাকে। আত্মিক সমাবেশ হইলে, আবিষ্ট বা যোগনিদ্রাগত ব্যক্তির চৈতন্য বিলুপ্ত হয়, স্বীয় জ্ঞান ও ব্যক্তি[illegible] আদৌ থাকে না। আত্মিককে বিদায় দিবার পর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায় চক্রে একজনের উপরেই আত্মিক সমাবেশ হইয়া থাকে। আবার কখন কখন বা দুই জনের উপরও একই চক্রে দুইটি আত্মিক আসিয়া থাকেন। আমার একটি চক্রে এইরূপ ঘটিয়াছিল; তজ্জন্য একটি আত্মিককে বিদায় দিয়া, অন্যটির সহিত কথা কহিয়াছিলাম।

আবেশ হইবার ঠিক পূর্ব্বে মনের মধ্যে অবসাদ ও ঘোর ঘোর ভাব দেখা দেয়। তৎকালে আবিষ্ট ব্যক্তি চক্রে যে আত্মিক আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে পান; এটি তাঁহার জ্ঞান হইলেও অল্প অল্প মনে থাকে। তাহার পর সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা।

আবেশ হইবার ঠিক পূর্ব্বে কিরূপ অবস্থা হয়

পবিত্রতা, শুদ্ধাচার এবং বিশ্বাসের অভাব হইলে, প্রায়ই নিম্ন-স্তরের আত্মিক আসিয়া অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট দেয় ও ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত গোঙানি এবং অস্থিরতা উপস্থিত হয়, শেষে ধীরে ধীরে অবসাদগ্রস্ত হইয়া চৈতন্য লোপ পায়। অনেক দুষ্ট আত্মিক সহজে ছাড়িতে চায় না। এখানে উপযুক্ত চক্রপতির আবশ্যক। এই সকল নিম্নস্তরের আত্মিক আমাদের পার্থিব আলোক আদৌ সহ্য করিতে পারে না। কারণ তাহারা গাঢ় অন্ধকার মধ্যে থাকে। চক্র-ঘরে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোক জ্বালা উচিত নয়। তাহাতে আবিষ্ট ব্যক্তির যথেষ্ট ক্ষতি হয়, অত্যন্ত ঝট্‌কা লাগে এবং শ্বাসকষ্ট হয়। তবে টর্চ্চের সাহায্যে টেবিলের নিম্ন-পৃষ্ঠে আলোক রাখিয়া, সেই আভায় দেখা যাইতে পারে। আর যদি উচ্চস্তরের আত্মিক আসেন, অতি আনন্দের সহিত আলোক জ্বালিয়া কথা বলা যায়। তাহাতে আবিষ্ট ব্যক্তির কোন কষ্ট হয় না। আবেশ হইবার সময় যৎসামান্য কষ্ট হয় মাত্র।

একটি গোল টেবিল হইলে, তিনজন হইতে ছয়জন বসা উত্তম। কিন্তু চ[illegible] টেবিল হইলে চারিজন বসাই শ্রেয়। সময়টি নাতিশীতোষ্ণ হওয়াই প্রশস্ত। সন্ধ্যার পর বসিতে হয়। সুগন্ধি ফুল টেবিলের মধ্যস্থলে রাখিয়া, পবিত্র জলে চন্দন ঘষিয়া সকলে কপালে মাখিবেন। মনোরঞ্জন সুগন্ধ ধূপ চক্র-ঘরে জ্বালিয়া, মনের শান্ত ভাব লইয়া, নিজ নিজ হাতওয়ালা চেয়ারে স্থির ভাবে বসিবেন। সময় দেখিবার জন্য একটি ঘড়ি ও একটি টর্চ্চ রাখা আবশ্যক। এক গ্লাস জল পৃথক স্থানে

চক্র করিবার সহজ নিয়ম

রাখিতে হয়; একখানি পাখা রাখাও আবশ্যক। আবিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান আনিবার জন্য আবশ্যক হইতে পারে। একটি লেড পেনসিল ও মোটা কাগজের খাতা রাখিতে হয়। আত্মিকগণ নূতন মিডিয়মের জন্য কখন কখন লিখিয়াও উত্তর দেন।

একটি তামার বা রূপার সরু তার, তাহার দুইটি অগ্রভাগকে পরস্পরের মধ্যে পাকাইয়া ঝালিয়া দিতে হয়। এই তারটি টেবিলের অপেক্ষা কিছু ছোট হইলে টেবিলের উপর হাত রাখিয়া ধরিবার সুবিধা হয়। প্রত্যেকেই দক্ষিণ হস্ত দিয়া তারটি ধরিবেন। ইহা ধরিবার নিয়ম—দক্ষিণ হস্তটি উপুড় করিয়া, তারটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দিয়া চালাইয়া মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা তারটি টেবিলের উপর টিপিয়া ধরিতে হয় এবং দক্ষিণ পার্শ্বের লোকটি তাহার বামকর আলগা ভাবে উক্ত তার-সংলগ্ন দক্ষিণ করের উপর স্থাপন করিবেন। প্রত্যেকেই এইরূপ ভাবে তারটি দক্ষিণ হস্তে ধরিবেন এবং পার্শ্বস্থিত ব্যক্তি তাঁহার বামকর তার স্পর্শ না করিয়া তাহার উপর রাখিবেন। তাহার পর আলোক নিভাইবার লোক আলোক নিভাইবেন ও দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিবেন। তৎপরে আহ্বান, স্তোত্রপাঠ ও মৃদুস্বরে সঙ্গীত হইবার পর, স্থিরভাবে কোন মৃত আত্মিককে চিন্তা করিবেন। যাঁহাকে চক্রে আনিতে সকলে ইচ্ছুক তাঁহার চিন্তা করিতে হয়। চক্রপতিই আহ্বান ও স্তোত্র পাঠ করিবেন। গান যিনি গাহিতে পারেন তিনিই গাহিবেন। সকলেই এরূপ ইচ্ছা করিবেন না যে, আত্মিক আমার নিকট আসুন। তাহাতে আত্মিকগণ প্রত্যেকের নিকট ঘুরিয়া বেড়ান। তজ্জন্য প্রায়ই চক্রসফল হয় না। কেবল চক্রে আসিতে মনে মনে আহ্বান করিবেন। যিনি চক্রপতি হইবেন তাঁহার প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ও জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

চক্রপতির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য

নিম্নস্তরের আত্মিকগণ, যাঁহারা অন্ধকার মধ্যে থাকেন, আবেশ হইবার পরে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, 'আলোক জ্বালিব কি?'

যদি 'হাঁ' উত্তর পাওয়া যায় তখন চক্রপতি আলোক জ্বালিতে আদেশ দিবেন। আত্মিকের সহিত চক্রপতি যখন কথা কহিবেন, তখন নম্র বিনীতভাবে আলাপ করিবেন এবং বিদায়ের কালে অভিবাদন করা বিধেয়। শৃঙ্খলাভঙ্গ না হয় তজ্জন্য চক্রপতির অধিকার থাকিবে প্রশ্ন করিবার। বিদায় অভিবাদনের পর আত্মিকগণ তখনই চলিয়া যান, আর উত্তর পাওয়া যায় না। আত্মিকগণ সকল বিষয়ের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। তাঁহাদিগকেও সর্ব্বদা পারলৌকিক অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। সুতরাং সমীচীন উত্তর না পাইলে চক্রপতিকে সে প্রশ্ন ছাড়িয়া অন্য প্রশ্ন করিতে হয়। চক্রপতি সতত গম্ভীর স্বরে বাক্যালাপ করিবেন। নূতন আবিষ্ট ব্যক্তিকে পনর মিনিটের অধিক আবিষ্ট অবস্থায় রাখা উচিত নয়। কারণ পায়ের দিক হইতে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতে থাকে; ইহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। হুঁশ আসিতে বিলম্ব হইলে, মুখে জলের ঝাপটা এবং বাতাস করিলে শীঘ্র হুঁশ হয়। এই সকল প্রকৃত তথ্যকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে।

যিনি চক্রপতি হইতে ইচ্ছুক তাঁহাকে প্রত্যহ ভগবৎ চিন্তন ও ত্রাটক অভ্যাস করিতে হয়। ত্রাটক অভ্যাসের নিয়ম এই, প্রত্যহ সকালে এক আধ ঘণ্টা দুই তিন বৎসর নিয়মিত ভাবে কোন একটি স্বচ্ছ পদার্থের (যেমন স্ফটিক) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, পলক শূন্য হইয়া মনের ক্রিয়া অবরুদ্ধ করিয়া, স্থির দীপ শিখার ন্যায় বসিয়া থাকিতে হয়। ইহাতে মনোবল অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চঞ্চল মন দ্বারা পরলোক সমীক্ষণ করা অসম্ভব মনে হয়। ত্রাটক অভ্যাসে চক্ষে জল আসিলে সেদিন বন্ধ রাখিয়া ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা বাড়াইতে হয়।

চক্র সম্বন্ধে সামান্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা

তারটি অবলম্বন করিয়া, হাতের উপর হাত দিয়া বসিবার পদ্ধতি কেন? পরলোক তত্ত্বানুসন্ধান কেবল মনের ক্রিয়ার উপরেই নির্ভর করে 'মন' তীব্র বিশুদ্ধ তড়িৎ-বল সম্পন্ন প্রকৃতি পুরুষের নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ ছায়ামাত্র; মায়া স্পর্শ মাত্রেই মনের কর্ম্ম-প্রীতি জাগে। মায়া মনকে সজাগ

রাখিতে না পারিলে, ইন্দ্রিয় বৃত্তি অর্থাৎ সুস্থ ইন্দ্রিয় ও কর্ম্ম প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও মন ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

'মন' যেরূপ বিশুদ্ধ তড়িৎ, 'মায়া' সেইরূপ জৈবিক চুম্বকশক্তি সম্পন্ন। এই জৈবিক চুম্বক, নিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন ক্রিয়াযুক্ত। নিবর্ত্তন অর্থাৎ ফিরাইয়া আনা বা প্রত্যাকর্ষণ (Negative) এবং প্রবর্ত্তন অর্থাৎ উত্তেজনা প্রবৃত্তিজনক (Positive)। বিজ্ঞানে চুম্বকশক্তির ক্রিয়ায় দেখা যায়, সমান জাতীয় চুম্বককে তাড়িত করে, ও অসমান চুম্বক শক্তি আকর্ষণ করে। জৈবিক চুম্বকও ঠিক তদ্রূপ করিয়া থাকে। আমাদের এই শরীরের বামভাগে নিবর্ত্তন, এবং দক্ষিণভাগে প্রবর্ত্তন শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। স্ত্রী-জাতির ভিতর নিবর্ত্তন শক্তির প্রভাব অত্যন্ত অধিক, আর পুরুষের মধ্যে প্রবর্ত্তন শক্তি প্রখর। যদিও এই উভয় জাতির মধ্যেই যুগ্মভাবে নিবর্ত্তন শক্তি বিদ্যমান। এইজন্য চক্রমধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমান্বয়ে বসান হইয়া থাকে।

জড়বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান ও মায়া সম্বন্ধে চিন্তা করিলে মনে হয়, সৃষ্টির নীতি ও কার্য্যক্রম প্রায় এক জাতীয়। জড়বিজ্ঞানের বেতার বার্ত্তায় পবিত্র সূর্য্যরশ্মি এবং তড়িৎ ও চুম্বকশক্তির ক্রিয়ায় ইথারের মধ্য দিয়া সহস্র সহস্র যোজনে বার্ত্তা প্রেরণ যদি সম্ভব হয়, মনোবিজ্ঞানে পরম পবিত্র আত্মরশ্মি এবং জৈবিক তড়িৎ ও চুম্বকশক্তি দ্বারা ব্যোমপথে অন্তরীক্ষবাসীর নিকটও সেইরূপ খবর পেঁাছান সম্ভব হয়। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ বা আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বামভাগ নিবর্ত্তন ও দক্ষিণভাগ প্রবর্ত্তন শক্তিযুক্ত। এখন এই শক্তিদ্বয়ের মিলনের ফল কি? চক্রে প্রবর্ত্তনের উপর নিবর্ত্তন মিলিত হইলে, মনের তড়িৎ-প্রবাহ ক্রিয়াশীল হইয়া দুইটি অবস্থার সৃষ্টি করে। একটি হয় অনাকুল একাগ্র ভাবের সহিত ইচ্ছার স্ফুরণ, আর একটি হয় ভ্রূমধ্যে চক্ষের পার্শ্বে টিপিলে যে আত্মদ্যুতি প্রকাশ পায়, তাহা সন্ধুক্ষিত অর্থাৎ উদ্দীপিত হয়। আমাদের

মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারাই জৈবিক তড়িৎ-প্রবাহ বিশেষভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি অন্যের ভ্রূমধ্যে মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ না করিয়া সঞ্চালন করিলে যে স্পর্শানুভব হয়, তাহা হইতেছে জৈবিক তড়িৎ-ক্রিয়া।

তামার তার অথবা রূপার তার পূর্ব্ব ব্যবস্থামত স্পর্শ করিয়া থাকার উদ্দেশ্য, জৈবিক তড়িৎ-প্রবাহের তারের মধ্য দিয়া দ্রুত স্ফুরণ। তৎসঙ্গে দক্ষিণ হস্তের উপর বাম প্রপানি রাখায়, নিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তনের চৌম্বক আকর্ষণ ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে। তখন প্রত্যেকের হাত ধীরে ধীরে অবসন্ন হয় এবং সামান্য ঝিন্ ঝিন্ করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে যাঁহার ভ্রূমধ্যে আত্মদ্যুতি ভিতরে উজ্জ্বল হইতে থাকে তিনিই আবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে স্থির মনে আপন শক্তিমত পরলোকে সংবাদ পাঠাইতে সক্ষম হন। আত্মিকগণ সেই সংবাদেই চক্রে মিডিয়মের নিকট আসিয়া থাকেন। আত্মদ্যুতি স্থূল চক্ষে দেখা যায় না। চক্ষু বন্ধ করিয়া নাসিকার বিপরীত দিকের চক্ষের পার্শ্বদেশ টিপিলে যে নিভা দেখা যায় তাহাই ক্ষীয়মাণ আত্মদ্যুতি অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মদ্যুতি নহে।

কোনরূপ নেশা করিয়া চঞ্চল চিত্তে চক্রে বসা আদৌ উচিত নহে। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আর যাঁহাদের প্রমেহ, উপদংশ, কুষ্ঠ প্রভৃতি জঘন্য ব্যাধি হইয়াছে তাঁহারা চক্রে বসিবেন না। উচ্চস্তরের আত্মিকগণ, আমাদের এই স্থূল শরীরকে ঘৃণা করেন; অনেকের গাত্রে একপ্রকার দুর্গন্ধ আছে, তাঁহাদেরও বসা উচিত নহে। কারণ আত্মিকগণ চক্রে আসিয়াও এই প্রকার দেহে প্রবেশ করেন না। প্রত্যহ পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিতে হয়। একই চেয়ারে প্রত্যহ বসা উচিত নহে; স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বসিতে হয়।

যথার্থ কথা এই, অবিশ্বাসী ব্যক্তিদ্বারা সত্য অনাদৃত হইলেও যথা-কালে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু মিথ্যা সামান্য ব্যাহত হইলে নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এক

অপূর্ব্ব শক্তি নিহিত। সেই শক্তির বিকাশে পারত্রিক এবং পারমার্থিক জ্ঞানার্জ্জনের শক্তিলাভ ঘটে। কিন্তু ঐহিক সর্ব্বস্ব, ঘোর জড়বাদীর পক্ষে তাহা অসম্ভব। অবিশ্বাসী নাস্তিকের ভিতর সেই শক্তি সুপ্তভাবে থাকে। কেবল মাত্র চেষ্টা যত্ন ও বিশ্বাসের অভাবে অন্তঃশত্রু সদৃশ জাড্যাবস্থা অন্তর্হিত হয় না। যাঁহাদের চেষ্টা, যত্ন ও সাধনা আছে তাঁহারাই পরলোকবাসী আত্মিকের জ্ঞানলাভে সমর্থন হন।

গীতায় পরলোক ও জন্মান্তরবাদ

গীতার ধ্যান

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্॥*
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবেদ্বেষিণীম্॥

ব্যাসদেবকে প্রণাম

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপদ্মনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈক পাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥

---

* মহাভারতের মধ্যে ভীষ্ম পর্ব্বে উপনিষদ্ রূপ গীতা ২৫ হইলে ৪২ অধ্যায় পর্যন্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা দেবভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে সনাতন ধর্ম্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানরূপ পারিজাতের সৌরভ লইয়া এই প্রপঞ্চময় জগতে যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন সারা পৃথিবী তাহার পবিত্র গন্ধে মাতিয়া উঠে।

দুঃখের বিষয় ৭৪৫ * শ্লোকের সম্পূর্ণ গীতা বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য। লোকায়তিক ভারত বিজয়ী মুসলমানগণ আর্য্য সংস্কৃতি নাশ করিবার মানসে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল পুস্তকাগার ধ্বংস করিবার পর, বহু অমূল্য সম্পদ নষ্ট হইয়া যায়। পশ্চাৎ মহামতি সম্রাট আকবরের চেষ্টায় গীতার অনুবাদ অসম্পূর্ণ ভাবে সঙ্কলিত হয়।

আর্ত্তজনের আত্মশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য ভারতবর্ষে সেই বেদিতব্য গীতা, যাহা অন্যত্র ছিল, তাহাই পৃথিবীর মনীষিগণ আপন আপন ভাষায় অনুবাদ করিয়া গীতাকে রক্ষা করিতেছেন। এই ভারতে বাঙ্গলা, হিন্দী, মারাঠী, মেবারী, কানাড়ী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, গুরুমুখী, গাড়োয়ালী, নেপালী, তিব্বতী, তেলেগু, তামিল, অসমীয়া, উৎকলী, প্রভৃতি ভারতের সমৃদ্ধ ভাষায় অনুবাদ ত আছেই, তাহা ছাড়া উর্দ্দু, ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালিয়ান, রাশিয়ান, বোহেমিয়ান, সোয়েডিশ, স্পেনিশ, ডাচ, জাপানী প্রভৃতি বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

যে সকল আত্মবঞ্চক বর্ব্বর, পরলোকে অবিশ্বাসী, যাঁহারা জন্মান্তর ও পরলোক মানেন না, তাঁহাদের জন্য যাহা সর্ব্বজনীন ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ভারতের পরমার্থ তত্ত্ব সম্পদ, সেই অবিংসবাদী উপনিষদ শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা হইতে গুটিকত শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

---

* ভীষ্ম পর্ব্বের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে আছে :—

ষট্ শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশব।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়।।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মান মুচ্যতে।

শ্লোক সংখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ—৬২০, অর্জ্জুন—৫৭, সঞ্জয়—৬৭, ধৃতরাষ্ট্র—১ = ৭৪৫।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ২ অঃ। ১২ শ্লোঃ

'আমি যে কখন ছিলাম না এমন নয়, সেইরূপ তুমিও কখন ছিলে না তাহাও নয়, এই নৃপগণ যে ছিলেন না তাহাও নয়, এই দেহত্যাগের পর আমরা সকলে থাকিব না এমন নয়।' (অর্থাৎ জ্ঞানীর চক্ষে মৃত্যু পরিবর্ত্তন মাত্র, এই স্থূল দেহের বিনাশে সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হয় না।)

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ অঃ ২। ১৩

'যেমন জীবের এই দেহে কৌমার, যৌবন, জরা অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা ক্রমে আসিয়া থাকে, দেহান্তর প্রাপ্তিতে অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্তিতে প্রকৃত জ্ঞানিগণ মোহগ্রস্ত হন না।'

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ অঃ ২। ২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ অঃ ২। ২৩

'মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আমাদের এই আত্মাও জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।' (সেই দেহে পরলোকে থাকেন, তাহা সূক্ষ্ম শরীর।) ২২

'এই আত্মাকে শস্ত্রসকল ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।' (সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর আমরা মৃত্যুর পর ধারণ করিয়া থাকি ; সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে দেখা যায় না।) ২৩

জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ অঃ ২। ২৭

'জাত ব্যক্তির মরণ নিশ্চিত এবং আপন কর্ম্মানুসারে মৃতের পুনর্জ্জন্ম নিশ্চিত, অতএব তুমি অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করিও না।'

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ অঃ ২। ৫১

'আত্মশুদ্ধি সম্পন্ন কর্ম্মযোগী মনীষিগণ কর্ম্মজাত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া (অর্থাৎ বার বার জন্মাবর্ত্তন হইতে মুক্ত হইয়া) সর্ব্ব উপদ্রব রহিত (দেহাত্মিকা বুদ্ধি শূন্য হইয়া) মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন।'

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ অঃ ৪। ৫

'ভগবান বলিলেন, হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সমুদয় জানি কিন্তু অবিদ্যা মায়ায় জীবের অনুস্মৃতিজ্ঞান আবৃত থাকে বলিয়া তুমি তাহা জান না।'

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জ্জুন ॥ অঃ ৪। ৯

'হে অর্জ্জুন, যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত জন্ম ও অস্বাভাবিক কর্ম্ম স্বরূপতঃ জানেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন এবং দেহত্যাগ করিয়া আর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না।'

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ অঃ ৫। ১৭

যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সেই ব্রহ্মে যাঁহাদের আত্মভাব, সেই

পরমাত্মায় যাঁহাদের স্থিতি (অর্থাৎ চিত্তনিরোধ অবস্থা), যাঁহারা ব্রহ্মে অনুরক্ত, যে আত্মজ্ঞান দ্বারা পাপ পুণ্যের স্মৃতি মাত্র নাই, তাঁহারা মোক্ষলাভ করেন; তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।' (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।)

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি ॥ অঃ ৬। ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ অঃ ৬। ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরাং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ অঃ ৬। ৪২

তত্র তং বুদ্ধি সংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন! ॥ অঃ ৬। ৪৩

'শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ! যে ব্যক্তি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার ইহলোকে ও পরলোকে অধোগতি হয় না। যেহেতু হে বৎস, শুভকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।' ৪০

'যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের লোক (জনলোক, তপলোক প্রভৃতি) লাভ করিয়া তথায় বহু বৎসর বাস করেন; অনন্তর শুচি সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।' (আশয়ী ব্যক্তির ন্যায় ভূবর্লোক হইতে ঘন ঘন জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।) ৪১

'অথবা তিনি জ্ঞানবান যোগনিষ্ঠ ব্যক্তির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্ম এই লোকে অতি দুর্লভ।' ৪২

'হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ দুই প্রকার জন্মেই পূর্ব্বজন্মের উত্তম সংস্কারবশে মোক্ষলাভের জন্য অধিকতর প্রযত্ন করিয়া থাকেন।' ৪৩

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ অঃ ৬।৪৫

'যোগী ইহজন্মে পূর্ব্ব জন্মাপেক্ষা প্রযত্ন সহকারে যোগে যত্নশীল হইয়া পাপমুক্ত হন। বহু জন্মের সাধনার ফলে সম্যক জ্ঞানী হইয়া পরে পরমগতি প্রাপ্ত হন।' ৪৫

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ অঃ ৭। ১৯

'বহু জন্মের সাধনার ফলে (প্রত্যেক জন্মেই আত্মোন্নতি হয়) তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে, এই চরাচর বিশ্ব বাসুদেব জ্ঞানে (যেখানে আমি তুমির ভাব লোপ পায়) ভজনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাপুরুষ সুদুর্ল্লভ।' ১৯

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ অঃ ৮। ১৫

'মহাত্মাগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া দুঃখ পরিপূর্ণ অনিত্য সংসারে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না। যেহেতু তাঁহারা পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।' ১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ অঃ ৮। ১৬

'হে অর্জ্জুন, ভূবর্লোক, স্বর্গলোক প্রভৃতি ভুবনে যত লোক আছে তথা হইতে পুনরায় আবর্ত্তনশীল হয়; কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে এই ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।' ১৬

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ অঃ ৮। ২৬

'প্রকাশময় শুক্লাগতি, এবং তমোময় কৃষ্ণাগতি, জগতের এই দুইটি

মার্গ পরলোক গমনের পথে অবিনশ্বররূপে প্রসিদ্ধ আছে। শুক্লাপথে পরম গতিলাভ, কৃষ্ণাপথে পুনরায় ভূলোকে প্রত্যাবৃত্ত হয়।' ২৬

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ অঃ ৯। ২১

(যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ কামনা করেন তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বরূপ, অনৈসর্গিক দেব ভোগ উপভোগের শেষ পরিণাম কি তাহা বলিতেছেন) 'তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, এবং বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, কামনা পরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।' ২১

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ অঃ ১৩। ২২

'পরম পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া (অর্থাৎ মায়া প্রকৃতির আবরণের মধ্যে থাকিয়া) প্রকৃতিজাত গুণসকল (কার্য্য-কারণ, শরীর এবং অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়জাত সুখ-দুঃখ) ভোগ করেন; কিন্তু এই মায়াবরিত পরম পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে যে জন্ম হয় তদ্বিষয়ে একমাত্র হেতু সত্ত্ব, রজ, তমগুণের সংসর্গ।' ২২

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ অঃ ১৩। ২৪

'যিনি পরম পুরুষকে আত্মরূপে জানেন এবং বিকারগ্রস্ত অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে মিথ্যা বলিয়া জানেন, তিনি যে কোন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না।' ২৪

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ অঃ ১৪। ১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ অঃ ১৪। ১৫

'সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি কালে মানুষ পরলোকগত হইলে ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রকাশময় লোক সকল (যেমন স্বঃ, মহ, জনঃ, তপ প্রভৃতি লোক) প্রাপ্ত হন।' ১৪

'রজোগুণের বৃদ্ধি সময়ে মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্ম হয়, এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হয়।' ১৫

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ অঃ ১৪। ১৮

'সত্ত্বপ্রধান (সংশুদ্ধমনা জ্ঞানবান) ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে গমন করেন, রজোপ্রধান (লোভাদি দ্বারা বিষয়স্পৃহা বশতঃ দুঃখভোগী) ব্যক্তিগণ মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, আর অতি নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী তামসিক ব্যক্তিগণ অধোপথে গমন করেন।' (অধলোক অর্থাৎ পাতালে জন্মগ্রহণ করেন।) ১৮

গুণানেতামতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুর্জ্জরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ অঃ ১৪। ২০

'দেহোৎপত্তির কারণ এই তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ, তম) অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু জরারূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন।' (অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জরা ইহা স্থূল দেহের অবস্থা বিশেষ, সুতরাং 'দেহী' বলিতে সূক্ষ্মদেহ পরলোকে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।) ২০

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ অঃ ১৫। ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে,
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ অঃ ১৫। ৪

'ইহলোকে এই মায়ারূপী অশ্বত্থের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না, কারণ এই বিশ্বসংসার অনাদি ও অনন্ত (চক্রবৎ) সুতরাং মধ্যও জানা যায় না। এই বদ্ধমূল মায়া অশ্বত্থকে দৃঢ়ভাবে অনাসক্তিরূপ শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া সেই পরমতত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হয়, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে সেই আদি চিৎশক্তির শরণাপন্ন হই।' (অর্থাৎ একনিষ্ঠ শরণাগতি) ৩। ৪

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ অঃ ১৫। ৬

'তপস্বিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না, যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই আমার পরমধাম অর্থাৎ স্বরূপ।' ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ অঃ ১৫। ৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ অঃ ১৫। ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ অঃ ১৫ । ৯

'আমার স্বরূপ লাভ করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কারণ কর্ত্তা ভোক্তারূপে অবিদ্যা উপাধি বিশিষ্ট জীব আমরই চিরস্থায়ী অংশ; পরন্তু দেহাদি নিবিড় সংযোগের প্রভু সেই জীব যখন এই পঞ্চীকৃত শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন অপঞ্চীকৃত যে সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হন তাহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই কয়টিকে আকর্ষণ করে। সে কিরূপ? সূক্ষ্ম বায়ু যেরূপ পুষ্পাদি হইতে গন্ধ আহরণ করে, জীব সেইরূপ দেহান্তর গ্রহণকালে পূর্ব্বের স্থূল দেহ হইতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সঙ্গে লইয়া গমন করে।' (অর্থাৎ আমাদের স্থূল দেহের ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্মাংশ, সূক্ষ্ম দেহে স্থিতি লাভ করে।) ৭। ৮

'সেই দেহী পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে (অর্থাৎ পঞ্চীকৃত নূতন স্থূল শরীর প্রাপ্ত হইলে) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক আশ্রয় পূর্ব্বক রূপ রসাদি বিষয় মনাদির সাহায্যে উপভোগ করে।' ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ অঃ ১৫ । ১০

'উৎক্রমণশীল অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গমনকারী; যিনি স্থূল দেহে অবস্থান পূর্ব্বক বিষয় ভোগ করেন, অথবা যিনি ত্রিগুণের বিকার সুখ দুঃখ ও মোহের সহিত যুক্ত হন, সেই দেহীকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না অর্থাৎ অনুমান করিতে পারে না, অন্তর্ম্মুখী জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দেখিতে পান।' (এখানে দেখেন অর্থাৎ অনুভব করেন।) ১০

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ অঃ ১৬। ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কাম-হৈতুকম্ ॥ অঃ ১৬। ৮

'আসুর স্বভাবযুক্ত লোকেরা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মের নিবৃত্তি সম্বন্ধে জানে না ; সুতরাং তাহাদের শুচি, আচার এবং সত্য নাই।' ৭

'আসুর স্বভাব ব্যক্তিরা বলে যে, এ জগতে সকলই মিথ্যা। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই, এই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তারূপে ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই ; স্ত্রী-পুরুষগণ পরস্পর কামবশে মিলিত হইয়া এই জগতকে সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা ভিন্ন এই জগৎ আর কি হইতে পারে ?' ৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ অঃ ১৬। ৯

'এই নাস্তিক মত আশ্রয় করিয়া পারলৌকিক সাধনচ্যুত, উগ্রকর্ম্মা, অহিতকারী ও অল্পবুদ্ধি আসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জগতের ধ্বংসের জন্য জন্মগ্রহণ করে।' ৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥অঃ ১৬।২০

'হে অর্জ্জুন, মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে অর্থাৎ পরম পুরুষকে না পাইয়া ক্রমশঃ অধোগতি (নীচ যোনি) লাভ করে।' ২০

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাংপ্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ অঃ ১৮।১২

'সকাম কর্ম্ম হইতে অনিষ্ট, ইষ্ট, ইষ্টানিষ্ট এই তিন প্রকার মিশ্র কর্ম্মফল ভোগ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মৃত্যুর পর পরলোকে হইয়া থাকে, কিন্তু দেহাত্ম-বুদ্ধি রহিত সন্ন্যাসিগণের এই সকল কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না।' ১২

অন্যান্য শাস্ত্রেও পরলোক ও জন্মান্তর সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

চরক সংহিতায়—

সূত্রস্থানম্ একাদশোঽধ্যায়ঃ। (ভগবান আত্রেয় কহিতেছেন)—

এষা পরীক্ষা নাস্ত্যন্যা যয়া সর্ব্বং পরীক্ষ্যতে।
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈবং তয়া চাস্তি পুনর্ভবঃ॥

'আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি,—এই চারিপ্রকার প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা হইয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত পরীক্ষার অপর কোন উপায় নাই। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারাই সদসৎ যাবতীয় পদার্থের পরীক্ষা হইয়া থাকে এবং এইরূপ পরীক্ষা দ্বারাই পুনর্জ্জন্ম যে আছে তাহা জানা যায়।'

ভগবান বুদ্ধ, জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতেন।

ভগবান কাহাকে বলে,—

উৎপত্তিং চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানমিতি॥

বিষ্ণু পুরাণ।

অর্থাৎ যিনি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ, পরলোকে গতি ও ইহলোকে আগতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা অবগত আছেন, তিনিই ভগবান।

গীতার ইতিবৃত্ত

যদিও নিম্নলিখিত 'গীতার ইতিবৃত্ত' রচনা, পরলোক সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রহিত, প্রয়োজন শূন্য বিষয়, তথাপি পাঠক মনোযোগ পূর্ব্বক চিন্তা করিবেন যে, পরলোক-যাত্রী সকলেই; প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, দীন-দরিদ্র প্রজা, সকলেরই পরিণাম একই প্রকার। বৃথা 'আমার আমার' করা।

অনেকেরই মনে এ প্রশ্ন উঠিবে যে, পাঁচ সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবদ গীতার উদ্ভব, তাহার প্রমাণ বা নিশ্চয়ের হেতু কি? রাজেন্দ্রগণের রাজত্বের হিসাব সংগ্রহ করিলেই তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে।

গীতা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কুরুক্ষেত্রের সময়ে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে গীতার জন্ম। এই গীতা কত প্রাচীন বুধগণ যাহা আপন আপন যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ঠ মতভেদ বর্ত্তমান।

গীতার পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মন্তব্য

১। মিঃ বৈদ্য এবং অধ্যাপক পাঠাওয়ালের মন্তব্য এইঃ খ্রীঃ-পূর্ব্ব তিনহাজার বর্ষ পূর্ব্বে গীতা রচিত।

২। অধ্যাপক সেনগুপ্তের মতেঃ খ্রীঃ-পূর্ব্ব ২৫৬৬ সনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল।

৩। মিঃ কারান্তিকর বলেনঃ খ্রীঃ-পূঃ ১৯৩১ সনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়।

৪। লোকমান্য তিলকের মতঃ খ্রীঃ-পূঃ ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে গীতা রচিত।

৫। ডাঃ দফতুরির মতেঃ খ্রীঃ-পূঃ ১১৬২ সনে গীতার জন্ম।

৬। ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য : খ্রীঃ-পূঃ একাদশ শতাব্দীতে গীতার উদ্ভব।

৭। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে : খ্রীঃ-পূঃ অনুমান অষ্টম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে গীতার উদ্ভব।

৮। সার আর. কে. ভাণ্ডারকরের মন্তব্য : খ্রীঃ-পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে গীতা রচিত।

৯। মারাঠি পণ্ডিত টেলাং বলেন : খ্রীঃ-পূঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে গীতার জন্ম।

১০। জার্ম্মান পণ্ডিত গার্ব্বের মতে : খ্রীঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গীতা সমুদ্ভব।

১১। ডাঃ লরিনসরের মতে : গীতা যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পরে রচিত।

আরও বহু পণ্ডিতের গবেষিত মত আছে, অনাবশ্যক বিধায় তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গ্রন্থকারের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনুমান খ্রীঃ-পূর্ব্ব ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে দ্বাপর যুগের শেষ বৎসরে হইয়াছিল।

আমি যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নিম্নে দিতেছি— রাজপুতনা দেশে মেবার রাজ্যে উদয়পুরে ও চিতোরগড়ে যাহা অনেকে বিদিত আছেন, যে দুইটি পাক্ষিক পত্র শ্রীনাথ দ্বার হইতে প্রকাশিত হইত, সেই বিদ্যার্থী সম্মিলিত "হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা" ও "মোহন চন্দ্রিকা" নামক পত্রিকা হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ সংগ্রহ করেন। আমিসেই ইতিহাসের সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুবাদ করিএবং তৎসঙ্গে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ. পি-এইচ. ডি. মহাশয়ের লিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সামান্য সাহায্য লইয়া বিচার পূর্ব্বক লিখিয়াছি।

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে আর্য্য রাজগণ, পরে মুসলমান এবং ইংরাজ রাজগণ, তৎপশ্চাৎ স্বাধীন ভারতের ১৯৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত লিখিত হইল।

শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির বংশ অনুমান ২৯ পুরুষ, ১৬৯২ বৎসর, ৩ মাস, ২৯ দিনের মধ্যে হইয়াছিল :—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। যুধিষ্ঠির	৩৬	৮	২৫
২। পরীক্ষিৎ	৬০	০	০
৩। প্রথম মহাভারত শ্রবণ-কর্ত্তা জনমেজয়	৮৪	৭	২৩
৪। রাজা অশ্বমেধ	৮২	৮	২২
৫। দ্বিতীয় রাম	৮৮	২	৮
৬। ছত্রমল	৮১	১১	২৭
৭। চিত্ররথ	৭৫	৩	১৮
৮। দুষ্টশৈল	৭৫	১০	২৪
৯। রাজা উগ্রসেন	৭৮	৭	২১
১০। ভুবনপতি	৬৯	৫	৫
১১। রণজিৎ	৬৫	১০	৪
১২। ঋক্ষক	৬৪	৭	৪
১৩। সুখদেব	৬২	০	২৪
১৪। নরহরিদেব	৫১	১০	২
১৫। সুচিরথ	৪২	১১	২
১৬। শূরসেন (২য়)	৫৮	১০	৮
১৭। পর্ব্বতসেন	৫৫	৮	১০
১৮। মেধাবী	৫২	১০	১০
১৯। সোনচীর	৫০	৮	২১
২০। ভীমদেব	৪৭	৯	২০
২১। নৃহরিদেব	৪৫	১১	২৩
২২। পূর্ণমল	৪৪	৮	৭
২৩। করদবী	৪৪	১০	৮
২৪। পলংমিক	৫০	১১	৮
২৫। উদয়পাল	৩৮	৯	০
২৬। দুবনমল	৪০	১০	২৬
২৭। দমাত	৩২	০	০
২৮। ভীমপাল	৫৮	৫	৮
২৯। ক্ষেমক	৪৮	১১	২১

রাজা ক্ষেমককে তাঁহার প্রধান পাত্র বিস্রবা বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন ; ১৪ পুরুষ = ৫০০ বৎসর ৩ মাস ১৭ দিন। তাহার বিস্তার :—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। বিস্রবা	১৭	৩	২৯
২। পুরসেনী	৪২	৮	২১
৩। বীরসেনী	৫২	১০	৭
৪। অনঙ্গশায়ী	৪৭	৮	২৩
৫। হরিজিৎ	৩৫	৯	১৭
৬। পরমসেনী	৪৪	২	২৩

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন	রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
৭। সুখপাতাল	৩০	২	২১	১১। অমীপাল	২২	১১	২৫
৮। কদ্রুত	৪২	৯	২৪	১২। দশরথ	২৫	৪	১২
৯। সজ্জ	৩২	২	১৪	১৩। বীরসাল	৩১	৮	১১
১০। অমরচূড়	২৭	৩	১৬	১৪। বীরসাল সেন	৪৭	০	১৪

বীরসাল সেনের প্রধান পাত্র বীরমহা বীরসাল সেনকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করেন ১৬পুরুষ=৪৪৫ বৎসর ৫ মাস ৩ দিন। ইহার বিস্তার :—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন	রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা বীরমহা	৩৫	১০	৮	৯। তেজপাল	২৮	১১	১০
২। অজিত সিংহ	২৭	৭	২৯	১০। মানিকচন্দ্র	৩৭	৭	২১
৩। সর্ব্বদত্ত	২৮	৩	১০	১১। কামসেনী	৪২	৫	১০
৪। ভুবনপতি	১৫	৪	১০	১২। শত্রুমর্দ্দন	৮	১১	১৩
৫। বীরসেন	২১	২	১৩	১৩। জীবনলোক	২৮	৯	১৭
৬। মহীপাল	৪০	৮	৭	১৪। হরিরাব	২৬	১০	২৯
৭। শত্রুশাল	২৬	৪	৩	১৫। বীরসেন (২য়)	৩৫	২	১০
৮। সংঘরাজ	১৭	২	১০	১৬। আদিত্যকেতু	২৩	১১	১৩

প্রয়াগের রাজা ধন্ধর মগধ দেশের রাজা আদিত্যকেতুকে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন ৯ পুরুষ=৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন। ইহার বিস্তার :—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন	রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা ধুন্ধর	৪২	৭	২৪	৫। তুর্নাথ	২৮	৫	২৫
২। মহর্ষি	৪১	২	২৯	৬। জীবনরাজ	৪৫	২	৫
৩। সনরচ্চী	৫০	১০	১৯	৭। রুদ্রসেন	৪৭	৪	২৮
৪। মহাযুদ্ধ	৩০	৩	৮	৮। আরালক	৫২	১০	৮
				৯। রাজপাল	৩৬	০	০

সামন্ত মহানপাল, রাজপালকে মারিয়া রাজ্য করেন ১ পুরুষ ১৪ বৎসর। ইহার বিস্তার নাই। রাজা মহানপালের রাজ্যের পর মহারাজ বিক্রমাদিত্য অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) হইতে আক্রমণ করতঃ রাজা মহানপালের রাজ্য অধিকার করেন মাত্র ১ পুরুষ ৯৩ বৎসর। ইহার বিস্তার নাই।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন লাভের পর হইতে বিক্রম সংবৎ প্রচলিত হয় ইহাই অনুমান। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শকগণের শত্রু ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য বিক্রমাদিত্যের অপর একটি নাম শকারি। খ্রীষ্ট জন্মের ৫৭ সৎসর পূর্ব্বে বিক্রম সংবৎ, খ্রীষ্ট জন্মের ৭৮ বৎসর পরে শকাব্দের প্রতিষ্ঠা হয়। সংবৎ ও শকাব্দে ১৩৫ বৎসরের ব্যবধান।

শালিবাহন বা সাতবাহন বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমী পুত্র শাতকর্ণি অথবা কনিষ্ক শকাব্দ প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারই প্রবল প্রতাপে শকগণ রাজ্যভ্রষ্ট হয়।

শালীবাহন বংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত মোট অনুমান ২৭৫ বৎসর রাজত্ব করেন (ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ মিলে না)।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের প্রধান পাত্র পৈঠনের যোগী রাজা সমুদ্র-পাল, ইহাকে মারিয়া রাজ্য করেন। ১৬ পুরুষ=৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ দিন। ইহাদের বিস্তার ঃ—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন	রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। সমুদ্রপাল	৫৪	২	২০	৬। সামপাল	২৭	১	১৭
২। চন্দ্রপাল	৩৬	৫	৪	৭। রঘুপাল	২২	৩	২৫
৩। সাহায়পাল	১১	৪	১১	৮। গোবিন্দপাল	২৭	১	১৭
৪। দেবপাল	২৭	১	২৮	৯। অমৃতপাল	৩৬	১০	১৩
৫। নরসিংহপাল	১৮		২০	১০। বলীপাল	১২	৫	২৭

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন	রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১১। মহীপাল	১৩	৮	৪	১৪। মদনপাল	১৭	১০	১৯
১২। হরিপাল	১৪	৮	৪	১৫। কর্ম্মপাল	১৬	২	২
১৩। ভীমপাল	১২	১০	১৩	১৬। বিক্রমপাল	২৪	১১	১৩

পশ্চিম দিকের বণিক জাতীয় রাজা মুলুকচন্দ, রাজা বিক্রমপালকে আক্রমণ করিয়া ময়দানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং উক্ত যুদ্ধে বিক্রমপালকে মারিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য করেন। ১০ পুরুষ=:৯১ বর্ষ ১৬ দিন মধ্যে হইয়াছিল। ইহাদের বিস্তার ঃ—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন	রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। মুলুকচন্দ	৫৪	২	১০	৬। কল্যাণচন্দ	১০	৫	৪
২। বিক্রমচন্দ	১২	৭	১২	৭। ভীমচন্দ	১৬	২	৯
৩। মানকচন্দ	১০	০	৫	৮। লোবচন্দ	২৬	২	২২
৪। রামচন্দ	১৩	১১	৮	৯। গোবিন্দচন্দ	৩১	৭	১২
৫। হরিচন্দ	১৪	৯	২৪	১০। গোবিন্দচন্দের রাণী পদ্মাবতী	১	০	০

রাণী পদ্মাবতী অপুত্রক অবস্থায় মরিয়া গেলে, মন্ত্রিগণ মিলিয়া হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়া দেন। তিনি রাজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। ৪ পুরুষ=৫০ বর্ষ ২১ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার বিস্তার ঃ—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। হরিপ্রেম	৭	৫	১৬
২। গোবিন্দপ্রেম	২০	২	৮
৩। গোপালপ্রেম	১৫	৭	২৮
৪। মহাবাহু	৬	৮	২৯

রাজা মহাবাহু রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে প্রস্থান করেন। বঙ্গদেশের রাজা অধিসেন তাহা শুনিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ১২ পুরুষ=১৯১ বর্ষ ১১ মাস ২ দিনের মধ্যে হয়। ইহার বিস্তার ঃ—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন	রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা অধিসেন	১৮	৫	২১	৭। কল্যাণ সেন	৪	৮	২১
২। বিলাব সেন	১২	৪	২	৮। হরি সেন	১২	০	১৫
৩। কেশব সেন	১৫	৭	১২	৯। ক্ষেম সেন	৮	১১	২৫
৪। মাধব সেন	১২	৪	১	১০। নারায়ণ সেন	১	২	২৯
৫। ময়ূর সেন	২০	১১	১৭	১১। লক্ষ্মী সেন	১৬	১০	০
৬। ভীম সেন	৫	১০	৯	১২। দামোদর সেন	১১	৫	১৯

রাজা দামোদর সেন আপনার পাত্রদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পাত্র দীপ সিংহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিয়া রাজাকে মারিয়া স্বয়ং রাজ্য করেন। ৬ পুরুষ=১০৭ বর্ষ ৬ মাস ১২ দিনের মধ্যে হয়। ইহার বিস্তার ঃ—

রাজা	বর্ষ	মাস	দিন	রাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। দীপসিংহ	১৭	১	১৬	৪। নরসিংহ	৪৫	০	১৫
২। রাজসিংহ	১৪	৫	০	৫। হরিসিংহ	১৩	২	২৯
৩। রণসিংহ	৯	৮	১১	৬। জাবন সিংহ	৮	০	১

রাজা জীবন সিংহ কোন কারণ বশতঃ আপনার সৈন্য উত্তর দকে প্রেরণ করেন; বিরাটের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান সেই সংবাদ পাইয়া জীবন সিংহকে আক্রমণ করতঃ যুদ্ধে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য অধিকার করেন।

পৃথ্বীরাজ—১২ বর্ষ ২ মাস ১৯ দিন।

পৃথ্বীরাজ সংবৎ ১২৪১ সালে দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন, ইংরাজী ১১৮৪ খ্রীঃ।

তরাইনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় যুদ্ধে শিয়াবুদ্দীন ঘোরীর নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী ও নিহত হন। ইং ১১৯৬ খ্রীঃ।

শিয়াবুদ্দীন ঘোরীর প্রতিনিধি রূপে কুতবদ্দীন আইবক দিল্লী অধিকার করিয়া থাকেন ১০ বৎসর। তৎপরে ১২০৬ খ্রীঃ শিয়াবুদ্দীন ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতবদ্দীন আইবক দিল্লীর সুলতান হইলেন।

দাস বংশ

১২০৬ খ্রীঃ হইতে ১২৯০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(৮৪ বৎসর)।

খল্‌জী বংশ

১২৯০ খ্রীঃ হইতে ১৩২০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(৩০ বৎসর)।

তুগ্‌লক বংশ

১৩২০ খ্রীঃ হইতে ১৪১৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(৯৩ বৎসর)।

সৈয়দ বংশ

১৪১৪ খ্রীঃ হইতে ১৪৫১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(৩৭ বৎসর)।

লোদী বংশ

১৪৫১ খ্রীঃ হইতে ১৫২৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(৭৫ বৎসর)।

মুঘল রাজবংশ

১৫২৬ খ্রীঃ হইতে ১৫৩৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(১৩ বৎসর)।

সুর বংশ

১৫৩৯ খ্রীঃ হইতে ১৫৫৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(১৬ বৎসর)।

মুঘল রাজবংশ

১৫৫৫ খ্রীঃ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(৩০৩ বৎসর)।

ইংরাজ রাজত্ব

১৮৫৮ খ্রীঃ হইতে ১৯৪৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত—(৮৯ বৎসর)।

বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের

১৯৪৭ খ্রীঃ হইতে ১৯৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত লিখিত হইল—(১১বৎসর)
(বর্ত্তমান সংবৎ ২০১৫ বৎসর)।

যুধিষ্ঠির হইতে মহান পাল পর্য্যন্ত—৩০২৭ বর্ষ—০—৫ দিন।

বিক্রমাদিত্য হইতে পৃথ্বীরাজের
পতন পর্য্যন্ত সংবৎ—১২৫৩ বর্ষ ২ মাস ৭ দিন
মোট—৪২৮০ বর্ষ ২ মাস ১২ দিন

কুতবদ্দীন আইবক হইতে
বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের
১১ বর্ষ পর্য্যন্ত—৭৬১ বর্ষ ০— ০
মোট—৫০৪১ বর্ষ ২ মাস ১২ দিন।

কলিযুগে ভারতের প্রথম সম্রাট শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দক্ষিণায়নে হয়; তজ্জন্য ভীষ্মদেব শরশয্যায় থাকিয়া উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করেন। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে, বিরুদ্ধ পরমাণুসংহতি ব্যবহার করিয়াও অর্থাৎ অগ্নিবাণে, বরুণ বাণ মারিয়াও ১৮ দিনে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী (১) ধ্বংস হইবার পর মাত্র ১০ জন জীবিত ছিলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠির অত্যন্ত শোকাভিভূত হন; এবং পারত্রিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অনুমান দেড় বৎসরেরও উপর অতীত হয়।

তৎকালে পাণ্ডবগণের ক্ষাত্রশক্তি নিঃশেষিত হয়। পুনরায় যোদ্ধবৃন্দের সংগ্রহে ও শিক্ষায় অনুমান দশ বৎসর অতীত হয়।

অতএব অনুনাশ্বের সহিত যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন উদ্যোগ অনুষ্ঠান করিতে অনুমান দুই বৎসর অতীত হয়।

(১) অক্ষৌহিণী—

পদাতি—	১,০৯,৩৫০
অশ্ব—	৬৫,৬১০
হস্তী—	২১,৮৭০
রথ—	২১,৭০০
এক অক্ষৌহণী—	২,১৮,৭০০

তৎপরে অশ্বমেধের অশ্ব সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে। অশ্বের রক্ষক হইয়া ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ নূতন সৈন্যদল 'অনীকিনী' বা 'চমূ' সঙ্গে লইয়া গমন করেন। পথে নিলাধ্বজ, হংসধ্বজ, শিখিধ্বজ, বক্রুবাহন, বীর ব্রহ্মা, তাম্রধ্বজ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ হয়, এবং বহু বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। পরিশেষে রুষ্টি-তুষ্টির মধ্যে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। ইহাতেও অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের উপর অতীত হইয়াছে অনুমান করা যায়।

তৎপরে শ্রীমন্মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্রাটরূপে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনারূঢ় হন।

অতএব,—

১ বৎসর	৬ মাস
১০ "	০ "
২ "	০ "
৫ "	০ "
১৮ বৎসর	৬ মাস

যুধিষ্ঠির হইতে স্বরাজ পর্য্যন্ত

পূর্ব্বের হিসাব মত ৫০৪১ বৎসর ২ মাস ১২ দিন।

অতএব মোট ৫,০৫৯ বৎসর ৮ মাস ১২ দিন পূর্ব্বে মহাসমর হয়। কার্ত্তিক মাসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কারণ কলির গতাব্দ ৫,০৫৯ বৎসর, (ইং ১৯৫৮ সালে) কলি যুগাদ্যা, মাঘী পূর্ণিমায়। সুতরাং ৮ মাস ১২ দিনে কার্ত্তিক মাস হইবে। ঠিক দ্বাপর যুগের শেষ বৎসরে যুদ্ধ হয়।

সুতরাং হিসাব করিলে দেখা যায়, ৫,০৫৯ বর্ষ ৮ মাস ১২ দিন হইতে ১৯৫৮ খ্রীঃ বাদ দিলে খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ — ৮ মাস ১২ দিন পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল।

এই যুদ্ধেই গীতার জন্ম। (কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর হইতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়)।

১। ঐতিহাসিক Dr. R. S. Tripathi M. A., Ph. D (London) তাঁহার "History of Ancient India" নামক গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"The traditional date, 3102 B. C. of the famous war between the rulers of the two places will hardly stand the test of criticism but it has with some plausibility been placed about 1000 B. C."

Mr. J. Rao thinks that the war took place in 3139 B. C. as according to a tradition Krishna passed away at the commencement of the "Kaliyuga" after the lapse of 36 years from the Mahabharata war. (The age of the Mahabharat, p. 5). ইহাতে প্রমাণ হয় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ৩,১০৩ অব্দে হইয়াছিল।

উপসংহার

পরলোক সমীক্ষণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে অল্প বিস্তর দর্শন, উপনিষদ্, মহাভারত, পঞ্চদশী, তন্ত্র, সংহিতা, গীতা প্রভৃতি আর্য্য শাস্ত্রের গুহা মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। তথা হইতে যুক্তি লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে বেশ কষ্ট হইয়াছে। এখন গ্রন্থ সমাপ্তির সময়, এই আয়াসলব্ধ ফলের প্রত্যেক স্তবকের তত্ত্বার্থ সঙ্কলন করিয়া মোটামুটি গ্রন্থের উপসংহার করি।

প্রথম স্তবকে, দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি ঈশ্বর ও জীবাত্মার স্বরূপ ; প্রকৃত সাধনা ও উপাসনার জন্য পূজা করিতে হয়, তখন কাহার পূজা করা উচিত ? নিজের ভিতর যিনি আছেন, যাঁর সত্তায় এই জীবৎ অবস্থা, যাঁহার সহিত আমার নিকট সম্বন্ধ, যিনি বিশ্বাত্মারই এক অবস্থা বিশেষ জীবাত্মা, যে জীবাত্মার সাকার মূর্ত্তি এই আমাদের শরীর ; অতএব পরম পিতার পূজায় জীবাত্মা ও তাঁর সাকার মূর্ত্তির ধ্যান করাই শ্রেয়। কারণ আমার ন্যায় স্বরূপ লইয়া জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ভগবান যে একটি। সুতরাং আত্মপূজাই প্রকৃত পূজা।

পরলোকে গিয়া পরমগতি লাভ করিতে হইলে, সাধককে ব্যহ্যাড়ম্বর ত্যাগ করিয়া নিরালায় সাধনা করিতে হয়। নচেৎ কর্ম্মানুসারে গতাগতি, যাহাকে মানব আবর্ত্ত বলে, তাহা ভোগ করিতেই হইবে। মানব জীবনে মানবীয় সম্পদ লাভ করিতে হইলে, কাম, ক্রোধ, লোভ ত্যাগ করা অথবা বশে রাখা বিশেষ আবশ্যক। বাদ প্রতিবাদ লইয়া পার্থিব জীবন বিগত করা কোন মতেই শ্রেয় নয়। এখানে বহুবাদী দেখা যায়, যেমন যদৃচ্ছাবাদী, স্বভাববাদী, জড়বাদী, কালবাদী, শূন্যবাদী, লৌকিকবাদী, প্রভৃতি। পরন্তু আত্মজ্ঞ হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে যে যুক্তি তাহাই গ্রহণযোগ্য।

২য় স্তবক,—জন্মবৃত্তান্ত, উচ্চস্তরের ও নিম্নস্তরে আত্মিকগণ, পিতা মাতার স্বভাব, চরিত্র, মনোবল বিচার করিয়া নিজ নিজ স্তরানুযায়ী গর্ভে আশ্রয় লন। মানব কর্ম্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অন্ধকার ও তমভাবপূর্ণ উপেক্ষণীয় অবস্থায় রহিয়াছে; সেইটি হইতেছে গর্ভাধান। অশিষ্ট অবিশ্বাসী নিকৃষ্ট স্তরের আত্মিকগণ প্রাক্তন ফল লইয়া ভূবর্লোক হইতে অসার জীবনে দুঃখ ভোগ করিবার জন্য এই পার্থিব জগতে পুনঃ পুনঃ আসিতেছেন, এবং ইহলোক, পরলোক করিতেছেন। বর্ত্তমানে ইহাদের পিতা মাতা লাভ সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে উত্তম গুণসম্পন্ন সন্তানের জনক জননী হইতে পারেন তদ্বিষয়ে চর্চ্চা করা হইয়াছে।

৩য় স্তবক,—আমরা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি, শৈশব হইতে নব যৌবনের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত কোন্ বিষয়ে আমাদের যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য। আলোচ্য বিষয় শিক্ষা, সেবা, বিশ্বাস, মায়া-মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাভিমান বুদ্ধি ও জীবনের ভুলপথ পরিহার করিয়া পারলৌকিক জীবন সুখের করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

৪র্থ স্তবক,—যৌবনের খেয়ালে ও গতিবিধি সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে যে বিপদ ঘটে, তাহা লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া নাস্তিকতা, বাসনা, মায়া ইত্যাদি লইয়া এবং যৌবনকাল যে মানবের উত্থান-পতন-কেন্দ্র তাহা দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জীবন গঠন প্রণালীতে পরলোকের চিন্তা না থাকিলে আসুরী ভাব ও আসক্তি প্রবল হয়; তাহাতে নিজের ও জগতের ক্ষতি হইয়া থাকে। যাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই, তাহা লইয়া সামান্য অনুসন্ধান বা সমীক্ষণ করিতে গিয়া, আর্য্যশাস্ত্রের শীতল ছায়ায় অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

৫ম স্তবক,—মানবের প্রৌঢ়াবস্থায় সংসারের ঘোর লাগিয়া ঠিক সন্নিপাতগ্রস্ত রোগীর মত হইয়া উঠে। সংসার জীবনে ভুলের জন্য সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই পার্থিব

সম্পদ-লিপ্সা ও আত্মম্ভরিতা। আর দেখি আত্মীয় বিয়োগে শোক ও বিক্লব অবস্থা।

পার্থিব মৃত শরীরের নিকট শোক করিলে, তাঁহার কতখানি পারলৌকিক জীবনের আনন্দ অবরুদ্ধ করা হয়, তাহার যথার্থ জ্ঞান না লইতে পারিলে সেই পরলোকবাসীর জীবন মরুময় করিয়া দেওয়া হয়। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অস্বীকৃতিতেই অসুরত্বের গরিমা। মায়ায় জীব পরলোকে কষ্ট পায়। যাহাতে তাহা না ঘটে তৎসম্বন্ধে যথা-সম্ভব চর্চ্চা করা হইয়াছে।

৬ষ্ঠ স্তবক,—বৃদ্ধাবস্থা বা অন্তিম অবস্থার চিন্তা করা হইয়াছে। মানব পার্থিব জীবনে বহু কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া জরাগ্রস্ত পরিশ্রান্ত শরীর লইয়াই অন্তিম অবস্থায় উপনীত হয়। তজ্জন্য আমরা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি, গর্ভে আশ্রয় লওয়া হইতে গর্ভমুক্তির পর পার্থিব জগতে আসা, ক্রমে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়া, পরলোকের জন্য এই অন্তিম দশায় কিরূপ প্রস্তুত হইলাম। মৃত্যু প্রত্যেক জীবনেই ঘটিবে। তাহা না ভাবিয়া পার্থিব জীবনে বৃথা অমর সাজিয়া, কে কোথায় কালের করাল গ্রাস হইতে নিস্তার পাইয়াছে? অন্তিম দশার জন্য চতুর মানব নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া, সতত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। যাঁহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকেন তাঁহারাই ত সাধক। সেই সাধকগণই মমত্ব পরিহার করিয়া গীতার উপদেশ মত একাগ্র চিত্তে 'ওঁ নারায়ণ' সতত অভ্যাস করিয়া থাকেন। এই অভ্যাসের ফলে পরম পিতার করুণা লাভ ঘটে। এই মায়াময় সংসারে কেহ কি ভাবে না যে, মুহূর্ত্ত পরে মৃত্যু তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিয়া দিবে! যাহারা লক্ষ্যহীন তাহাদের মহামোহ ভাব কাটে না; পরলোকে ও পুনর্জ্জন্মে তাহাদের কল্যাণ নাই, শ্রেয়ঃ নাই।

৭ম স্তবক,—এইবার আসিল পরলোক, অপঞ্চীকৃত অবস্থা। মৃত্যুর পর নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী অনুকূল প্রতিকূল অবস্থায়

আত্মিকগণ অবস্থান করেন। পরলোক সম্বন্ধে বিশ্বাস অবিশ্বাস লইয়া বহু ব্যক্তি আলোচনা করিয়া থাকেন। যথাজাত অবিশ্বাসিগণ নিম্নস্তরের জ্ঞান লইয়া যে উত্তর দেন তাহাতে সত্যের নাম গন্ধ মিলে না। পরলোক সম্বন্ধে জানিবার ও বুঝিবার বহু বিষয় লইয়া চর্চ্চা করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে যথাসম্ভব লেখাই শ্রেয়ঃ। পারলৌকিক জীবনে, পার্থিব জীবন অপেক্ষাও নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়। তবে এখানেও যেরূপ ব্যভিচার হয়, সেখানেও তদ্রূপ অন্যথাচরণ ঘটিয়া থাকে; তজ্জন্য শাসন ভোগ করিতে হয়। অনেকের ধারণা পরলোকবাসিগণ ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন, কিন্তু সমীক্ষণ দ্বারা যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহজীবনে আমরা যেরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকি, তদপেক্ষা অত্যধিক জ্ঞান পরলোকে গিয়া লাভ করা যায় না। মাত্র একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং গতি সম্পন্ন হইয়া থাকে, যাহা আমাদের মধ্যে সম্ভব নহে। আমরা পার্থিব জীবনে সত্ত্ব ভাবাপন্ন থাকিয়া, পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, পারলৌকিক জীবন পরম আনন্দের হয়। বাসনাই পরলোকে বিষম অবস্থার কারণ হইয়া থাকে।

৮ম স্তবক,—এইবার নিবিড় স্তব্ধতার ভিতর দিয়া, সাধন ও মনন দ্বারা সন্ধান করিতে হইবে সেই স্পন্দহীন, স্পর্শহীন আত্মিক কে। সজল বিমল প্রেম লইয়া লোকান্তরের যাত্রী, সূক্ষ্ম শরীরীকে আনিতে হইবে আপন চক্রে। এই কর্ম্মে চিত্তের বিশ্বাস ও পবিত্রতাই হইবে আসল। আমাদের প্রবল ইচ্ছা ও আহ্বানে, আত্মিকগণ যখন উপস্থিত হইবেন চক্রে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অজ্ঞাত সত্যকে দেখিয়া, লোকনাথের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়া, পরম আনন্দে দূর হইয়া যাইবে আমাদের এই নশ্বর জীবনের বৃথা অতৃপ্ত বাসনার হাহাকার। অন্তরের কুটিলতা, অস্মিতা, ভোগস্পৃহা নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে সেই দর্শনে। আর কিছু ভাল লাগিবে না; মনে হইবে সব নিষ্ফল, নিরর্থক।

তখন আমরা ভালবাসিতে শিখিব ধর্ম্ম-ধৌত কর্ম্মকে। পবিত্র জীবন গড়িয়া উঠিবে পরলোক অনুশীলনে। পরলোকবাসী আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের আগমনে, তাঁহাদের সহিত আলাপে, তাঁহাদের সুখ দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া, পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে আমাদের মন। তৎকালে অন্তরের রন্ধ্রপথে বেপমান চঞ্চল মনকে লক্ষ্য করিয়া, সেই অসতর্ক ফাঁক দিয়া, বিবেকের বিশুদ্ধতম জ্যোতি অন্তরকে নিস্তরণের যোগ্য করিয়া, অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ জাগাইয়া, নূতন মানুষ করিয়া তুলিবে। ঘোর সংসারী ব্যক্তির মনের মালিন্য অকৌশল গলিয়া যাইবে, ধুইয়া যাইবে সেই পবিত্র ভাবের স্রোতে।

যাঁহারা ধৈর্য্যের সহিত পরলোক চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের অন্তরে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার উদয় হয়। তখনই তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন। সংকল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই সিদ্ধ সংকল্প; বিফলতা তাঁর অজ্ঞাত। ভীত ত্রস্ত সংশয়ান্বিত মানব তাঁহারা নন। পারলৌকিক জ্ঞান লাভের ব্যাকুলতা কোন দিন বৃথা যায় না। যিনি মরণপথের বন্ধু তিনিই অন্তরে অনুরণিত করেন পরম পবিত্র সুর। সেই পরিশুদ্ধ সুর হইতেছে জীবন সঙ্গীত; এই সঙ্গীত কেহ কেহ শুনেন, আর কেহ বা তাহাতে আদৌ ধ্যানই দেন না। পরলোক চর্চ্চায় যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা না পাইলে শৈথিল্য আসিয়া থাকে। তৎকালে নূতন সাধক পরলোক চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন। অন্তরের ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় তাহা অবহেলিত হয়। সুতরাং চিত্তের দৃঢ়তা বিশেষ আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই, অনুচিত হইলেও পরলোক সমীক্ষণ গ্রন্থে গুটিকত গান দেওয়া হইয়াছে। যে গানের বিশেষ কোন ভাব-ভঙ্গি নাই, তাহার পরিচয় কি দিব! পরন্তু পাঠক যখন পড়িতে পড়িতে আলোক পাইবেন না, তখন সেই নির্ম্মলতম অন্ধকারে বসিয়া আপন মনে একটু গুণ গুণ করিয়া লইবেন। তবেই না পড়িতে ভাল লাগিবে।

এই স্তবকে প্রাচীন পরলোকতত্ত্ব বিজ্ঞান মণ্ডলের পরিচয়, চক্র করিবার পদ্ধতি, গীতায় জন্মান্তরবাদ, গীতার ইতিবৃত্ত ও শ্লোক সংখ্যা

ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। উপসংহারের পর পৃথক ভাবে চক্রের বিবরণ পড়িবেন। কারণ পুস্তক অষ্টম স্তবকেই সমাপ্ত হইল।

শেষে চক্রের সামান্য কয়েকটি সত্য বিবরণ মাত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পরলোকবাসীর অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া চক্র করিবার আকাঙ্ক্ষা হইবে। এবং চক্র করিলে দেখিতে পাইবেন ইহা কত সত্য। চিন্তাশীল ব্যক্তি অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইবেন।

দেব প্রপন্নার্ত্তি হর প্রসীদ, প্রসীদ বিশ্বেশ্বর বিশ্ববন্দ্য।
প্রসীদ গঙ্গাধর চন্দ্রমৌলে, মাং ত্রাহি সংসারভয়াদ্ নাথম্॥

যঃ সাক্ষাৎ পরমেশানঃ পরমানন্দময়স্তথা।
স্রষ্টা পাতাচ সংহর্ত্তা তং নমামি শিবং শিবম্॥

সার কথা

এষণা তেয়াগ করি
কর্ম্মফল পরিহরি
কর্ম্ম কর ইহলোকে
গতি হবে দিব্যলোকে।
অবিশ্বাস কর দূর
প্রণবেতে দাও সুর
মুক্ত হ'লে মায়া-পাশ
আবর্ত্ত হইবে নাশ।

হরি ওঁ তৎ সৎ।

চক্রের বিবরণ

স্থান ও তারিখ
কাশীধাম, ১৩/১৭৪
সোনারপুরা।
৯ই আশ্বিন, ১৩৫০ সাল।

সময়
আরম্ভ ৭—৪৫ মিঃ
আত্মিকের আগমন ৮—২৫ মিঃ
মিডিয়ম—যোগমায়া।

মৃত্যুর এক মাস ছয় দিন পরে তৃতীয় স্তরবাসী সুধীরবালা দেবীর আত্মিকের আবির্ভাব। মিডিয়ম মুখে কোন উত্তর দিতে পারেন না, মাত্র লিখিয়া জানান 'সুধীর'।

মিডিয়মের আবেশ হইবার ঠিক পূর্ব্বে চক্রগৃহ মধ্যে এক উজ্জ্বল আভা পরিদৃষ্ট হয়।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
কাশীধাম, সোনারপুরা।
১০ই আশ্বিন, ১৩৪০ সাল।

যোগমায়া
কাত্যায়নী (২) ফণিভূষণ

সময়।
আরম্ভ ৭—৫৫ মিঃ
শেষ ৮—৪০ মিঃ
মিডিয়ম—যোগমায়া।

১। আপনি কে?
উঃ—সুধীর।

২। কে দিদি?
উঃ—হাঁ, (ইনি চক্রপতি ফণিভূষণের ভগ্নী)। আত্মিক বলিতে থাকেন—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, ছেড়ে দাও। তখন আত্মিককে নমস্কার জানাইয়া চক্রপতি বিদায় দেন।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

লেখক
বীরেন্দ্রনাথ সরকার।

স্থান ও তারিখ	প্ল্যান্‌চেট	সময়
কাশীধাম, ১৩/১৭৪	প্যাম্না	আরম্ভ রাত্রি ৮টা
সোনারপুরা	ব্রজবালা (৩) মোহিনী	শেষ „ ৯—১০ মিঃ
১১ই আশ্বিন, ১৩৫০ সাল	ফণিভূষণ	মিডিয়ম ব্রজবালা দেবী
মঙ্গলবার		মুখে উত্তর দেন

১। আপনি কে ?
উঃ—সুধীর।

২। দিদি কয়জন মুক্তাত্মা আপনাকে লইতে আসিয়াছিলেন ?
উঃ—দুইজন।

৩। তিনি কোন্ স্তরের মুক্তাত্মা ?
উঃ— পঞ্চম স্তরের।

৪। আপনি এখন কোন্ স্তরে আছেন ?
উঃ—তৃতীয় স্তরে।

৫। আপনি থাকিবার কোন নির্দিষ্ট স্থান পাইয়াছেন কি ?
উঃ—পাই নাই।

৬। আপনি যে স্তরে আছেন তাহা উজ্জ্বল না নিবিড় অন্ধকার ?
উঃ—আলোক আছে।

৭। আমি আপনার কে ?
উঃ—আমার ভাই।

৮। মোহিনী যখন আপনার শ্রাদ্ধে পিণ্ড দিতেছিল তখনআপনি উপস্থিত ছিলেন ?
উঃ—ছিলাম। আত্মিক মিডিয়মের সাহায্যে বলিলেন বড় কষ্ট হচ্ছে, ছেড়ে দাও।

তখন অভিবাদন জানাইয়া আত্মিককে বিদায় দেওয়া হয়। তৎপশ্চাৎ ধীরে ধীরে মিডিয়মের জ্ঞান আইসে।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

লেখক—
বীরেন্দ্রনাথ সরকার

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড,
ধরমপেট, নাগপুর
ইং—3.10.47.

সময়
আরম্ভ রাত্রি ৮-২৫ মিঃ
শেষ ,, ৯-১০
মিডিয়ম—শিবানী দেবী
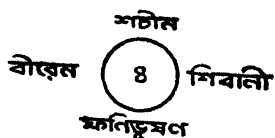
১। আপনার নাম কি ?
উঃ—ভোঁদো (যোগমায়া)।

২। আপনি কোন স্তরে আছেন ?
উঃ—কাশীতে।

৩। আপনার মৃত্যুর পর কে লইয়া গিয়াছিল ?
উঃ—বীরেন, মোহিনী সকলে লইয়া গিয়াছিল।

৪। সে কথা নয়, ও জগতে আপনাকে সাথে করিয়া কে লইয়া গিয়াছিলেন ?
উঃ—শিবের মত একজন।

৫। আপনার মায়ের সহিত দেখা হয় ?
উঃ—না।

৬। মুনীন্দ্রের (আত্মিকের স্বামী) সহিত দেখা হয় ?
উঃ—না। আমাকে কেন ডাকিতেছ ?

৭। আপনি কেমন আছেন ?
উঃ—ভাল।

৮। আপনাদের ওখানে স্ত্রী পুরুষ ভেদ অনুভব করেন ?
উঃ—হাঁ করি।

৯। ওখানে স্ত্রী পুরুষ কি পৃথক ভাবে থাকেন ?
উঃ—হ্যাঁ, স্ত্রী পুরুষ আলাদা থাকে।

১০। আপনি কতদিন মারা গিয়াছেন ?
উঃ—দেড় বৎসর।

১১। আপনি যেখানে আছেন সেখানে আলো আছে না অন্ধকার ?

উঃ—আলো। আমাকে ডেকোনি এখানে এসে কি করব।

১২। তোমার দিদিমার (চক্রপতির মাতা) সহিত দেখা হয় ?

উঃ—না।

১৩। যেখানে থাক সেখানে কি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে ?

উঃ—না।

১৪। কাশীতে কোথায় থাকেন ?

উঃ—শিব মন্দিরে থাকি।

১৫। মৃত্যুর পর কোন কষ্ট হয়েছিল ?

উঃ—হাঁ কষ্ট হয়েছিল। এবং অন্ধকারে ছিলাম।

১৬। কতদিন হইল আলোকে আসিয়াছেন ?

উঃ—তুই মাস মাত্র।

১৭। আমরা তোমাদের খবর জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক ?

উঃ—আমার কথা বলিবার শক্তি কম।

১৮। আপনার সহিত আর কোন আত্মিক এসেছেন ?

উঃ—না। আমার নিকট দুর্গা (আত্মিকের ভাইঝি) থাকে।

১৯। অনাথের (শিবানীর স্বামী) সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না।

২০। আপনি কাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন ?

উঃ—শিবানীর।

২১। কোন্ স্থান দিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিলেন ?

উঃ—মুখ দিয়া।

২২। শিবানীর ফিটের অসুখ আছে কোন ঔষধ বলিতে পারেন।

উঃ—চেষ্টা করব।

২৩। ছোট বৌয়ের মাথা জ্বালা করে, কোন ঔষধ দিতে পারেন?
উঃ—ছোট বৌয়ের ঔষধ মায়ের কাছে পাইবে।

২৪। বীরেনের (আত্মিকের পুত্র) জন্য মন কেমন করে কি ?
উঃ—মিডিয়ম তাহাতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। (পরলোকেও মায়ারহাত হইতে মুক্তি নাই) অতঃপর আত্মিকের ক্রন্দন থামাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়, এবং চক্রপতি নমস্কার জানাইয়া বিদায় দেন।

(মিডিয়মের গলার স্বর ইহজগতে আত্মিকের গলার স্বরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল)

লেখক	চক্রপতি
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড,
পোঃ—ধরমপেট, নাগপুর
ইং 5.10.47.

সময়
আরম্ভ ৭—৪৫ মিঃ
শেষ ৮—৩৫ মিঃ
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। আপনার নাম কি ?
উঃ—ভোঁদো (যোগমায়া)।

২। আজ তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করব ?
উঃ—কি বল।

৩। ওখানে কিভাবে চলাফেরা করতে হয় ?
উঃ—হাওয়ায়।

৪। তোমাদের কোন কাজ করতে হয় ?
উঃ—আমাকে কোন কাজ করতে হয় না।

৫। তবে তুমি কি কর ?
উঃ—পূজা পাঠ সর্বদাই করি।

৬। তোমাদের ওখানে সকাল সন্ধ্যা হয়?
উঃ—হ্যাঁ।

৭। তুমি আমাদের দেখতে পাচ্ছ?
উঃ—হ্যাঁ আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি।

৮। তুমি আগে যাদের ভালবাসতে তাদের এখনও ভালবাস?
উঃ—না।

৯। তুমি আমাদিগকে দেখতে আস?
উঃ—হ্যাঁ দেখতে আসি।

১০। মুনীন্দ্রের (আত্মিকের স্বামী) মৃত্যুর সময় তুমি এসেছিলে?
উঃ—হ্যাঁ।

১১। তোমার সঙ্গে দুর্গা এসেছে?
উঃ—দুর্গা আসে নাই।

১২। অত দূরে থাকো তাহা হইলেও তোমরা অত শীঘ্র কি করে আস?
উঃ—হাওয়ায়। কি বলব আমি।

১৩। মোহিনী এখানে এসেছে তা তুমি জান?
উঃ—মোহিনী এখানে এসেছে সেত আমি জানি।

১৪। বারেনকে তুমি কাল কোলে করে চুমু খেয়েছিলে?
উঃ—হ্যাঁ। (বীরেন আত্মিকের পুত্র, ৪-১০-৪৭ চক্রে বীরেন সামান্য আবেশ অবস্থায় দেখে তার মা কোলে করে চুমু খাচ্ছে)।

১৫। আমরা যেমন খাই তোমরাও কি খাও?
উঃ—খাই।

(ক) কি খাও?
উঃ—আমরা গন্ধটা খাই।

১৬। কাল তোমায় সন্দেশ খাওয়াব, খাবে ?

উঃ—খাব। একটা জিনিস খাব, বীরেনকে দিতে বলবে, আম খাব।

১৭। এখানে আসবার সময় তোমাদের কোন বাধা বিঘ্ন থাকে কি ?

উঃ—না, তবে দুর্গা আপত্তি করে। বলে আমি কার কাছে থাকব, কাঁদে।

১৮। তোমার কাছে আর কে কে থাকে ?

উঃ—দুর্গা ছাড়া আর কেহই থাকে না।

১৯। সেখানে তোমরা হাস বা কাঁদ, যেমন আমরা হাসি বা কাঁদি ?

উঃ—হ্যাঁ, আমরা হাসি কাঁদি।

২০। আচ্ছা তোমরা বই পড়তে পার ?

উঃ—কোথায় বই পাব যে পড়ব।

২১। আমি যে গীতা শুনালাম শুনেছ ?

উঃ—হ্যাঁ শুনেছি। কাশীতে রোজই গীতা শুনি।

২২। তুমি কোন্ মন্দিরে আছ ?

উঃ—কেদারের মন্দিরে আছি।

২৩। তোমার চেহারাটা একবার দেখা দিতে পারবে ?

উঃ—আমি দেখা দিলে তুমি যে ভয় পাবে।

২৪। না আমি ভয় পাব না, তুমি একবার দেখা দিও ?

উঃ—আমার চেহারা দেখলে তুমি ভয় পাবে নাত; আমি কাশীতে দেখা দেব।

২৫। না ভয় পাব না। তবে একটু ভাল মুর্ত্তিতে দেখা দিও ?

উঃ—আমি সব রকমই পারি।

২৬। বীরেন ম্যাট্রিক পাস করেছে জান ?

উঃ—হ্যাঁ জানি।

২৭। বীরেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে জান ?

উঃ—হ্যাঁ জানি।

২৮। বীরেন জীবনে উন্নতি করবে ?

উঃ—হ্যাঁ করবে। (এবং মিডিয়ম আবেশ অবস্থায় বীরেনের মাথার উপর হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।)

২৯। মোহিনীর দোকান উঠে গেছে জান ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩০। এখন ও কি করবে একটু যুক্তি দিতে পার ?

উঃ—(কিছুক্ষণ পরে) ও যাহা মনে ভাবিয়াছে তাহাই করুক।

৩১। শিবানীর ঔষধের কি হল ?

উঃ—ফিটের ওষধ নাই, তবে মির্গির ঔষধ আছে, 'কৃষ্ণ তুলসীর শিকড়'।

৩২। আমরা যখন তোমায় ডাকি তুমি অসন্তুষ্ট হও ?

উঃ—না। তবে আমার ক্ষতি হয়। আর দুর্গা কাঁদে। আমায় ডেকোনি।

৩৩। দুর্গাকে একদিন এখানে নিয়ে আসবে ?

উঃ—সে আসতে চায় না, সে বলে আমি গিয়ে কি করব। আমার মা এখানে আছে যখন। তোমরা খালি খালি বিরক্ত কর।

৩৪। তোমরা ঘুমাও ?

উঃ—হ্যাঁ, ঘুমাই।

৩৫। কখন ঘুমাও ?

উঃ—যার যখন ইচ্ছা।

৩৬। বারীনকে দেখতে পাচ্ছ ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩৭। ও ঐরকম রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন ?

উঃ—বারীন বড় হলেই ঠিক হয়ে যাবে।

৩৮। ছোট বৌয়ের ঐ ঔষধ বাঁধলেই কি ভাল হবে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩৯। আজ তর্পণের সময় তোমাকে জল দিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছ কি ?

উঃ—হ্যাঁ পাইয়াছি।

৪০। আচ্ছা, বাবা, মা ইত্যাদিকে যে জল দিই তাঁরা তাহলে পান ?

উঃ—হ্যাঁ, তাঁরা পান, ঐ জলই ত আমরা খাই।

৪১। বেরীবেরীর ঔষধ কি বলতে পার ?

উঃ—না জানি না।

৪২। তোমার ঐ রোগই ত হয়েছিল ?

উঃ—আমার এখন আর কোন রোগ নাই, ঔষধের জন্য চেষ্টা করব।

অতঃপর আত্মিককে নমস্কার জানান হয়। এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মিডিয়মের দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

লেখক	চক্রপতি
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার।	ফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ৬-১০-৪৭

সময় ও মিডিয়ম
চক্র আরম্ভ সন্ধ্যা ৮ টায়
শেষ „ ৮-৫৫ মিঃ
মিডিয়ম শিবানী দেবী

১। তোমার নাম কি ?

উঃ—ভোঁদো।

২। আজ আসতে দেরি হল কেন ?

উঃ—কি করে আসব, দুর্গা যে আসতে চায় না।

৩। দুর্গা এসেছে কি ?

উঃ—হ্যাঁ দুর্গা এসেছে।

৪। আজ তোমায় আম খাওয়াব। কি করে তোমায় খাওয়াব ?

উঃ—ঐখানে দাও আমি খাব।

৫। কে তোমাকে দেবে ?

উঃ—যে হোক দিলেই খাব।

৬। প্রথমে কি খাবে ?

উঃ—আম খাব।

৭। তুই খাচ্ছিস ?

উঃ—হ্যাঁ।

৮। কেমন লাগছে ?

উঃ—ভাল।

৯। আমটা মিষ্টি ?

উঃ—হ্যাঁ মিষ্টি।

১০। খাওয়া হয়ে গেলে আমায় বলিস ? তা না হলে আমি কি করে জানব বল ?

উঃ—আচ্ছা বলব! (আম খাইতে খাইতে মিডিয়ম হাসিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে বলিল খাওয়া হয়ে গেছে)

১১। তোমাকে তুই বলে ডাকছি বলে সেজন্য ত রাগ করছিস না ?

উঃ—না।

১২। এইবার সন্দেশ খাও ?

উঃ—আচ্ছা সন্দেশ খাব। (মিডিয়মের মুখ নড়িতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে আপনিই বলিল) সন্দেশটা খুব ভাল।

১৩। দুর্গাকে কি করিয়া খাওয়াব ?

উঃ—ঐখানে দাও ও খাবে। (দুর্গা মিডিয়মের মধ্যে নাই, বাহিরে আছে)

১৪। দুর্গার খাওয়া হয়ে গেলে তুই বলিস আমাকে ?

উঃ—আচ্ছা বলব।

দুর্গা আম খেতে চাইছে না।

১৫। তবে ও কি খাবে ?

উঃ—ও আখ খাবে।

১৬। দুর্গা সন্দেশ খাবে ত ?

উঃ—খাবে। কিছুক্ষণ পরে বলিল খাওয়া হয়ে গেছে।

১৭। জল খাবে ত ?

উঃ—না আমরা জল খাই না।

১৮। তোকে ত আমি সকালে তর্পণের সময় জল দিয়েছি; খেয়েচিস ত ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৯। প্রবাদ আছে যে ধবা অবস্থায় মৃত্যু হলে তাদের নাকি সিন্দূর চুবড়ি মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, এটা কি সত্যি ?

উঃ—না; নিয়ে ঘুরতে হয় না, তবে এক জায়গায় রেখে দিতে হয়।

২০। আচ্ছা আমরা তোকে এখানে 'ভোঁদো' বলে ডাকতাম, সেখানে তোকে কি বলে ডাকে ?

উঃ—আমায় দেবী বলে ডাকে।

২১। দুর্গাকে কি বলে ডাকে ?

উঃ—কুমারী বলে ডাকে! তবে আমি দুর্গা বলে ডাকি।

২২। সেখানে গিয়ে কোন থাক্‌বার স্থান পাইয়াছিস কি ?

উঃ—হ্যাঁ পাইয়াছি।

২৩। সেটা কিরূপ ?

উঃ—ভাল।

২৪। কি রকম দেখতে সেটা ?

উঃ—এই ঘরের মতন, আমি কেদারের মন্দিরের ভিতরই থাকি।

২৫। তোমার মা ঘরে যে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথকে পূজা করতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেটা গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেটা তুলে দিলে কে ?

উঃ—আমি তুলে দিয়েছি।

২৬। আত্মিকের প্রশ্ন,—কেন ফেলল ?

উঃ—চক্রপতি, তা আমি কি করে জানব। আত্মিকের মন্তব্য,(সেইজন্যই ত মোহিনীর দোকান উঠে গেল)।

২৭। তোমার মৃত্যুর সময় মনোমোহনকে ও মোহিনীকে ডাকিয়াছিলে কেন ?

উঃ—বীরেনের ভার দেবার জন্য। মনোমোহন ত' ভার নিয়েছে, মিডিয়ম কাঁদিতে লাগিল, তারপর সান্ত্বনা দেওয়ার পর মৃদু হাসিতে থাকে।

২৮। এর জন্যেত খুশী হওয়া উচিত। খুশী হয়েছিস ?

উঃ—হ্যাঁ।

২৯। মনোমোহনকে আশীর্ব্বাদ করেছিস ?

উঃ, হ্যাঁ।

৩০। তোর সঙ্গে আর দুর্গার সঙ্গে কি করে পরিচয় হল ?

উঃ—দুর্গা মন্দিরে ছিল, আমি যেতেই সে পিসি বলেই জড়িয়ে ধরল। আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম।

৩১। একটা চিঠি আছে সেটা তুই কাশীতে তোর গুরুদেবের নিকট রেখে দিতে পারবি ?

উঃ—আমি কখন যেতে পারব ; তবে তোমরা ডাক তাই আসি, চিঠি নিয়ে যেতে পারব না।

৩২। সেদিন যে বলেছিলে দেখা দেব, আজ দেখা দে না মা ?
উঃ—এত লোকের সামনে। তুমি ত কাশীতে কেদারের মন্দিরে দেখবে বলেছ। আমি কাশীতে দেখা দেব।

৩৩। আচ্ছা দুর্গাকে শিবানীর ভিতর পাঠিয়ে দিতে পারিস ?
উঃ—কি করে বলব। দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করব। চক্রপতি, বলিলেন হ্যাঁ, কর। (দুর্গা বলছে ঢুকে কি করব। বাবা, দাদু, কাকা সকলকে ত দেখতে পাচ্ছি)

৩৪। একটু বল্‌না ওর সঙ্গে দুই চারটা কথা বলি ?
উঃ—ও কিছুতেই কথা বলতে চাইছে না।

৩৫। আচ্ছা কাল আসবে ত ?
উঃ—ও বলছে আসব। আমি আর আসব না, তবে তাকে দিয়ে আমি চলে যাব।

অতঃপর আত্মিককে নমস্কার জানান হয় ; এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মিডিয়ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিছুক্ষণ পরে মিডিয়ম প্রকৃতিস্থা হয়।

লেখক	চক্রপতি
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার	শ্রীফণিভূষণ দেব

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ৭-১০-৪৭

বীরেন
শিবানী (৭) শচীন
ফনিভূষন

সময় ও মিডিয়ম
চক্র আরম্ভ সন্ধ্যা ৭-৫৮ মিঃ
শেষ ৮-৩৫ „
মিডিয়ম শিবানী দেবী

১। আপনার নাম কি ? (কিছুক্ষণ চুপ্ থাকার পর অতি কষ্টে উত্তর দেয়)
উঃ—দুর্গা।

২। কষ্ট হচ্ছে ?
উঃ—হ্যাঁ।

৩। তোমার পিসিমা এসেছেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

(চক্রপতি বলিলেন ভোঁদো, দুর্গাকে কথা বলিবার একটু সাহায্য কর)

৪। আজ তোমাকে আখ খাওয়াব। প্রথমে আখ খেয়ে নাও তারপর তোমায় দুচারটি কথা জিজ্ঞাসা করব। ভোঁদো আছে ত না চলে গেছে ?
উঃ—আছে।

আচ্ছা এইবার আখটা খেয়ে নাও। (এই কথা বলার সাথে সাথে মিডিয়মের মুখ নড়িতে লাগিল)

অতি স্বস্তির সহিত মিডিয়মের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল ; আঃ !

৫। আখটা মিষ্টি ?
উঃ—হ্যাঁ মিষ্টি। আঃ আখটা খুব ভাল।

৬। আখে কিসের গন্ধ পাচ্ছ ?
উঃ—আতরের গন্ধ।

৭। খাওয়া হয়েছে ?
উঃ—হ্যাঁ।

৮। আর খাবে ?
উঃ—না।

৯। তোমার যে টিফিন বাক্সে টাকা আছে, তার ১০০৲ টাকা তোমার স্কুলে দেওয়া হয়েছে ; বাকী টাকা তুমি কি করতে চাও তোমার বাবা জিজ্ঞাসা করছে ? বাবা !
উঃ—বাবাকে বলো কেদারের বাড়ীতে কিছু করে দিতে।

১০। তোমার মৃত্যুর পর তোমার ঠাকুরমার সহিত দেখা হয়েছিল ?
উঃ—হাঁ দেখা হয়েছিল।

১১। এখন তিনি কোথায় ?
উঃ—জানি না।

১২। কতদিন তোমার কাছে ছিলেন ?
উঃ—দুই মাস, তারপর কোথায় চলে গেছে জানি না।
(আমি কথা বল্‌তে পারছি না)

১৩। কেদারের বাড়ীতে তোমায় যদি কিছু খাবার দেওয়া হয় তুমি খাবে ?
উঃ—কি খাব, আমি আখ খেতে চেয়েছি খেয়েছি ত।

১৪। আচ্ছা ভোঁদোকে জিজ্ঞাসা কর ও যে আমায় দেখা দেবে বলেছিল তাহলে কি শিবানীকে কাশীতে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে ? (ভোঁদোকে জিজ্ঞাসা করার মত মিঃ মুখ নড়িতে লাগিল)
উঃ—না অমনি দেখা দেবে বলছে।

১৫। কেদারের মন্দিরের কোন্ খানে ?
উঃ—কেদারের ঘরে বলছে।

১৬। কখন দেখা দিবে ?
উঃ—যখন ইচ্ছা।

১৭। তোমায় পরলোকে কে নিয়ে গিয়েছিল ?
উঃ—একটা দ্বারবানের মত লোক।

১৮। আমি কে ?
উঃ—ছোট দাদু।

১৯। আমি তোমায় কি বলে ডাকতাম ?
উঃ—বোষ্টমী বলে।

২০। তুমি আমাদের চক্রে আসতে কাঁদ কেন ?
উঃ—আমার মন কেমন করে।

২১। তোমার যখন মৃত্যু হয় তখন তোমার বয়স ছিল বার, এখন তোমার ১৬ বৎসর হয়েছে। তুমি বড় হয়েছ ?

উঃ—না। সেই রকমই।

তৎপরে আত্মিককে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় দেওয়া হয়।

লেখক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১১-১০-৪৭
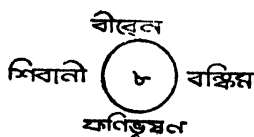
সময় ও মিডিয়ম
চক্র আরম্ভ ৮-২৫ মিঃ
শেষ ৯-৪০ „
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

(অদ্য চক্রের শেষে মিডিয়ম প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিয়াছিল, জ্ঞান লোপ পাইবার পূর্ব্বে একটি ফুলের গন্ধে বিভোর হয়ে পড়ি।)

১। আপনার নাম কি ?

উঃ— সুধীর।

২। কে দিদি ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩। আপনি কোন্ স্তরে আছেন ?

উঃ—সপ্তম স্তরে।

৪। সেটা আলো না অন্ধকার ?

উঃ—আলো।

৫। মায়ের সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না। মা নেই, চলে গেছে। সে সব কথা আমার বলবার দরকার নেই, কোথায় গেছে।

৬। কিছুদিন আগে বাবাকে যখন ডেকেছিলাম তখন তিনি সপ্তম স্তরে ছিলেন, এখন কোথায় ?

উঃ—বাবা তার চেয়েও উঁচুস্তরে চলে গেছেন।

৭। আপনি যেখানে আছেন সেটার নাম কি ?
উঃ—সপ্তম দ্বীপ।

৮। ভোঁদোর সঙ্গে দেখা হয় ?
উঃ—না।

৯। ভোঁদো ত বলে গেল সে কাশীতে কেদারের মন্দিরে থাকে।
উঃ—হ্যাঁ তা জানি আমি।

১০। ভোঁদো আমায় দেখা দিবে বলেছে ?
উঃ—হ্যাঁ তা পারে।

১১। দুর্গার সহিত দেখা হয় ?
উঃ—না। তবে মৃত্যুর পর দু মাস তার সঙ্গে ছিলাম। তারপর সপ্তম স্তরে চলে যাই।

১২। মৃত্যুর পর আপনাকে সঙ্গে করে কে নিয়ে গিয়েছিলেন ?
উঃ—দুইজন সাধু।

১৩। তাঁদের নাম কি ছিল ?
উঃ—সে কথা আমি বলতে পারব না।

১৪। সেখানে আপনারা কি করেন ?
উঃ—আনন্দ করি। পূজা পাঠ করি।

১৫। কখন পূজা পাঠ করতে হয় ?
উঃ—সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় পূজা করতে হয়।

১৬। তাহলে সেখানে দিন রাত্রি হয় ?
উঃ—হ্যাঁ।

১৭। রাত্রি অন্ধকার কি ?
উঃ—হ্যাঁ।

১৮। আচ্ছা আপনি যেখানে থাকেন সেটা এখান থেকে কত দূর ?
উঃ—সে শুনে তোমার দরকার ?

১৯। আমাদেরও ত একদিন যেতে হবে ; তাই আপনাদের নিকট জেনে নিচ্ছি।

উঃ—ওসব বিরক্ত কর না। আঃ, কেন আমায় ডাক।

২০। পরলোক সম্বন্ধে তু-চারটি কথা আমাদেরও জানতে ইচ্ছা করে ত ?

উঃ—আমার এখানে আসবার কোন দরকার নাই। আমার এখানে আসতে ইচ্ছা করে না। আমার এই মায়াজালে আসবার কি দরকার।

২১। আপনি কতদিন মারা গেছেন বলতে পারেন ?

উঃ—হ্যাঁ, চার বৎসর পূর্বে। (১৩৫০ সালের ৫ই ভাদ্র দেহত্যাগ করেন) দেখ ফণি, আমায় খবরদার ডাকবি না।

(তারপর কিছুক্ষণ আত্মিককে মিনতি করার পর পুনরায় প্রশ্ন করা হয়।)

২২। আচ্ছা দিদি, তোমাদের ওখানে মেয়ে পুরুষ কি আলাদা থাকে ?

উঃ—হ্যাঁ, আলাদা থাকে।

২৩। তাদের সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—দেখা হয় তবে মিল হয় না।

২৪। বিষ্ণুপদর সহিত দেখা হয় ?

উঃ—হ্যাঁ দেখা হয়।

২৫। দাস মহাশয় (আত্মিকের স্বামী) কোথায় আছে জানেন!

উঃ—এখানেই আছে, সেইজন্যই ত মায়ার জালে পড়তে চাই না।

২৬। আজ তর্পণের সময় আপনাকে জল দিয়াছিলাম পেয়েছিলেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

২৭। তর্পণের সময় আপনি এখানে এসেছিলেন ?

উঃ—না। তর্পণের জল আমাদের নিকট পৌঁছে যায়।

২৮। মা কোথায় আছেন ?

উঃ—মা জন্মেছেন।

২৯। কোথায় জন্মেছেন বল না দিদি ?

উঃ—সে বলবার হুকুম নাই।

৩০। বাবার সহিত দেখা হয়েছিল ?

উঃ—হ্যাঁ, বাবার সহিত দেখা হয়েছিল, তারপর কোথায় চলে গেছেন।

৩১। বল না দিদি, মা কোথায় জন্ম নিয়েছেন ?

উঃ—হুকুম নাই।

৩২। কত বড় হয়েছেন ?

উঃ—চার বৎসরের।

৩৩। তার জন্য কি আপনাদের দণ্ড হয় ?

উঃ—হ্যাঁ দণ্ড হয়। কারো কথা কিছু বলবার যো নাই।

৩৪। আপনি যেখানে আছেন সেখানে আত্মীয় কে কে আছেন ?

উঃ—আত্মীয় কেউ নাই।

৩৫। অন্য কেউ ত আছেন ?

উঃ—আমায় বিরক্ত কর না। কেন বিরক্ত কর।

৩৬। বল না দিদি, কে কে সেখানে আছে ?

উঃ—তুমি চিন্‌বে কেমন করে।

৩৭। তবু দু'একটা নাম করুন না ?

উঃ—কত দেশের লোক তুমি কি করে জানবে। আমরা কি সেখানে নাম ধরে ডাকি ?

৩৮। তবে আপনাদের কি বলে ডাকে?

উঃ—আমাদের সকলকে 'দেবী' বলে ডাকে। আমাদের আসল নামের কোন পরিচয় নাই; কে কার নাম জানে। আমরা কি এমন করে কথা বলতে পারি।

৩৯। সেই জন্যই ত আপনাকে যন্ত্র ব্যবহার করিবার জন্য একটা মিডিয়মের ভিতর আনতে হয়?

উঃ—কার ভিতর এসেছি সে কথা কি আমি জানি না?

৪০। কার ভিতর এসেছেন?

উঃ—আমার হতভাগিনীর ভিতর।

(মিঃ, কান্নার মত অবস্থা হয়েছিল)

অতঃপর আত্মিককে প্রণাম জানান হয়, এবং চলিয়া যাইতে অনুরোধ করা হয়। ৯—৪০ মিঃ সময় মিডিয়মের জ্ঞান ফিরে আসে।

লেখক — চক্রপতি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। — শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১২-১০-৪৭

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ ৭-৫০ সন্ধ্যা
শেষ ৯টায়
মিঃ—শিবানী দেবী

১। আপনি কে?

উঃ—অনাথ। (মিডিয়মের স্বামী)

২। আজ তোমাকে একখানা গান শুনাব। শুনতে পাচ্ছ?

উঃ—হ্যাঁ।

(গ্রামোফোনে গান শুনান হয়)

৩। তুমি কতদিন পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছ?

উঃ—দুই বৎসর পূর্ব্বে। (১৩৫২ সালে ১৩ কার্ত্তিক, সকাল ১০॥ টায় দেহত্যাগ করে।)

৪। তোমাকে পরলোকে কয়জন লইয়া যায়?

উঃ—আমাকে তিন জনে নিয়ে গিয়েছিল।

৫। কে কে নিয়ে গিয়েছিল?

উঃ—শিব আর দুই জন দৈত্য।

৬। প্রথমে তুমি কোথায় ছিলে?

উঃ—অন্ধকারে।

৭। কয়দিন অন্ধকারে ছিলে?

উঃ—তিন মাস ছিলাম।

৮। তারপর কোথায় গিয়াছ?

উঃ—আলোতে।

৯। কতদিন আলোতে এসেছ?

উঃ—এক বৎসর ৯ মাস।

১০। তুমি সেখানে থাকবার স্থান পেয়েছ?

উঃ—হ্যাঁ পেয়েছি।

১১। সেটা কি রকম?

উঃ—যেমন এখানটা।

১২। সেখানে গাছপালা আছে?

উঃ—হ্যাঁ আছে।

১৩। নদী আছে?

উঃ—হ্যাঁ আছে।

১৪। সেখানে কিসের দেওয়াল?

উঃ—দেওয়াল নেই।

১৫। তবে সেটা কি রকম?

উঃ—এমনি একটা মাঠের মত।

১৬। তোমাদের কিছু খাইতে হয়?

উঃ—হ্যাঁ।

১৭। কি খাও ?

উঃ—আমরা গন্ধটা খাই।

১৮। আজ তোমাকে সন্দেশ খাওয়াব খাবে ত ?

উঃ—আমার খাবার খেদ কিছু নাই। যা দেবে তাই খাব।
(অতঃপর সন্দেশ খাওয়ান হয়)

১৯। সন্দেশটা কেমন ?

উঃ—ভাল।

২০। সব কখানা খাও।

উঃ—হুঁ। (কেঁদে ফেলিল) কিছুক্ষণ পরে, আঃ আর খাব না।

২১। আচ্ছা দেশনেতা সুভাষচন্দ্রের সহিত দেখা হয় ?

উঃ—না। কার সঙ্গে কারো পরিচয় নাই।

২২। তোমরা কাপড় পর ?

উঃ—না।

২৩। তবে তোমরা উলঙ্গ হয়ে থাক ?

উঃ—না। তবে আমাদের যেন কাপড় পরা আছে বলে মনে হয়।

২৪। তোমায় এসব জিজ্ঞাসা করছি বলে বিরক্ত হচ্ছ নাত ?

উঃ—না বিরক্ত হচ্ছি না।

২৫। তুমি কোন্ স্তরে আছ ?

উঃ—পঞ্চম স্তরে।

২৬। সেটার নাম কি ?

উঃ—আমি ত জিজ্ঞাসা করি নাই।

২৭। সেখানে কি কি আছে ?

উঃ—কাছারি বাড়ী আছে, সেখানে বিচার হয়। ঘর দোরও আছে।

২৮। তোমাদের কি করতে হয় ?

উঃ—পূজা করতে হয়।

২৯। তোমরা বই পড় ?

উঃ—বই কোথায় পাব।

৩০। তোমাদের পূজা কে করান ?

উঃ—গুরু আছে।

৩১। কে তিনি ?

উঃ—যে যেমন লোক তার তেমন গুরু। আমার গুরু আমায় শাস্তি দেয় না। আমি কোথাও যেতে চাই না, সে জোর করে অন্য জায়গায় পাঠাতে চাইছে।

৩২। তুমি খুব কুকুর পুষতে ভাল বাসতে। সেখানে কুকুর আছে ?

উঃ—আমার কুকুরই আমার কাছে আছে।

৩৩। তোমার এখানে আসতে ইচ্ছা করে ?

উঃ—হ্যাঁ একটু একটু আসতে ইচ্ছা করে।

৩৪ তোমার কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩৫ বিষ্ণুপদর সহিত দেখা হয় ?

উঃ—দেখা হয়। কেউ কার ত পরিচয় জানে না, আর কেউ কার সঙ্গে কথাও বল্‌তে পারে না।

৩৬। তোমার ওখানে ছোট ছোট ছেলে আছে ?

উঃ—হ্যাঁ আছে।

৩৭। ক বৎসরের ছেলেরা আছে ?

উঃ—দুই, তিন, সাত, দশ ইত্যাদি বৎসরেরর ছেলে আছে।

৩৮। আচ্ছা আমি কে ?

উঃ—ছোট মামা।

৩৯। সুফলের বাবা, বিজয়ের সঙ্গে দেখা হয় ?
উঃ—হ্যাঁ দেখা হয় কিন্তু কথা কইতে দেয় না।

৪০। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয় ?
উঃ—না।

৪১। আর একখানা গান শুনবে না ?
উঃ—হ্যাঁ শুনব। (গান শুনান হয়)।

৪২। তোমার এখানে (মিডিয়মের মধ্যে) আসতে কষ্ট হয় ?
উঃ—হ্যাঁ কষ্ট হয়।

৪৩। আচ্ছা তুমি যেখানে থাক সেটা এখান থেকে কতদূর ?
উঃ—অনেক দূর।

৪৪। আচ্ছা তোমায় নমস্কার করছি, তুমি যেতে পার।
উঃ—আমিও নমস্কার জানাচ্ছি মামা। এই কথা বলার সাথে সাথে আত্মিক মিডিয়ম ত্যাগ করেন। কিছুক্ষণ পরে মিডিয়মের জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

লেখক	চক্রপতি
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার	ফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১৩-১০-৪৭

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ ৯টায়
শেষ ৯-৩০ মিঃ
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

মিডিয়মের উপর আত্মিকের আবেশ হইবার পর গীতা শুনান হয়।

১। আপনি কে ?
উঃ—সুধীর। কেন আমায় ডাকছিস্ ?

২। আজ দিদি, তোমায় সন্দেশ খাওয়াব, খাবে ত ?
উঃ—আমি খাব নি।

৩। আমায় অত স্নেহ করতে,তা আমার একটা কথা রাখবে না?
উঃ—আচ্ছা তবে দে।

৪। আমি এজন্য খাওয়াচ্ছি যে, আমরা প্রসাদ পাব।
উঃ—আমার খেতে ইচ্ছা নেই।

৫। সন্দেশটা ভাল ?
উঃ—ভাল।

৬। খাওয়া হয়ে গেলে আমায় বল ?
উঃ—ব্যাস। আমি তোকে কি বললাম। তুই ডাকিস কেন।

৭। কেন দিদি, তোমার শাস্তি হয় ?
উঃ—না, তবে আহ্নিক করতে বসেছিলাম সেই সময় ডাকলি।

৮। আচ্ছা দিদি মৃত্যুর সময় তোমার কি কষ্ট হয়েছিল ?
উঃ—না বিশেষ কিছু কষ্ট হয় নাই।

৯। মৃত্যুর সময় আমায় ডেকেছিলে বা স্মরণ করেছিলে ?
উঃ—হ্যাঁ, ডেকেছিলাম।

১০। মৃত্যুর পর আপনাকে যখন ডেকেছিলাম তখন আপনি চক্রে এসে বলেছিলেন "আপনার কষ্ট হয়।" কি কষ্ট হত দিদি ?
উঃ—কষ্ট অনেক কিছুই হত। তখন কথা বললেই মারব মারব করত।

১১। কে মারতে আসত ?
উঃ—যারা বিচার করে।

১২। মা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন বল না দিদি ?
উঃ—না। মায়ের খবর দেব না।

১৩। মা যেখানে জন্মেছেন একবার সেখানে গিয়ে দেখে আসতাম বল না দিদি ?
উঃ—উঁহু ; বলবার যো নেই।

১৪। আমরা কি করলে আপনারা সুখী হইবেন ?
উঃ—কি করলে আর সুখী হব।

১৫। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলে ?

উঃ—হুঁ।

১৬। এখানে আর কোন আত্মিক এসেছেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৭। বিষ্ণুপদকে এত করে ডাকছি আসছে না কেন ?

উঃ—ঐত একজন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৮। কে ও ?

উঃ—আমার সঙ্গে ত আর কথা নেই।

১৯। আচ্ছা দিদি তোমার এজগতে আসতে ইচ্ছা করে ?

উঃ—না।

২০। তবে থাকুন না ওখানে ১০০০, তুই হাজার বৎসর ?

উঃ—ইচ্ছামত কি হয়। বিচারে যা হবে তাই।

২১। সেখানে কে বিচার করেন, কোন সাধু ?

উঃ—না।

২২। তবে কে ?

উঃ—একজন রাজার মত লোক।

২৩। তিনি সিংহাসনে বসেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

২৪। মন্ত্রী, অমাত্য ইত্যাদি আছে ?

উঃ—হ্যাঁ। সেখানে শাসন খুব ; কথা কইতে গেলেই সাজা। আবার কোথাও যাবারও যো নেই। তোমরা ইচ্ছা করলে যেখানে ইচ্ছা যেতে পার, আমরা পারি না। আমায় খবরদার ডেকোনি।

২৫। আচ্ছা মনোমোহন প্রায়ই পেটের যন্ত্রণায় ভোগে, কেন হয় বলতে পার ?

উঃ—(কিছুক্ষণ চুপ করিয়া) আমায় বলে আর কি হবে আমি কি তার মা আছি ?

২৬। সুভাষচন্দ্রের সহিত দেখা হয় ?

উঃ—না। আর ওসব কথা আমরা কি করে জানব। চারিদিকে অনেক লোককে দেখতে পাই, কিন্তু কথা বলবার কি যো আছে !

২৭। (চক্রপতি উপস্থিত সকলকে প্রণাম করিতে বলায়) সকলে আত্মিককে প্রণাম করে। উত্তরে আত্মিক বলেন, থাক্ থাক্। চক্রপতি আত্মিককে প্রণাম করেন ও আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন জানান। উত্তরে আত্মিক বলেন, থাক্ ভাই। এবং মিডিয়মের সাহায্যে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

অতঃপর আত্মিককে চলে যাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎক্ষণাৎ চলিয়া যান এবং ধীরে ধীরে মিডিয়মের জ্ঞান ফিরিয়া আইসে।

লেখক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব
১৩।১০।৪৭

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ২-১১-৪৭

ফনিভূষণ
বীরেন (১১) শিবানী

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮-১৫ মিঃ
শেষ ৯টায়
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। আপনি কে ?

উঃ—ভোঁদো।

২। এসেছিস মা ?

উঃ—হ্যাঁ। আমায় কেন ডাকছিস ?

৩। কি বল্লি ? "ডাকছিস" !

উঃ—কে মামা ; আমি বুঝতে পারিনি মামা।

৪। কাশীতে গিয়া তোকে অত ডাকলাম তুই দেখা দিলি নি?

উঃ—আমি পঞ্চম স্তরে চলে গেছি।

৫। আমরা কাশীতে গিয়াছিলাম তুই জানিস ?

উঃ—হ্যাঁ।

৬। কতদিন হল পঞ্চম স্তরে গিয়াছিস ?

উঃ—প্রায় একমাস।

৭। দুর্গা কোথায় আছে ?

উঃ—দুর্গা কাশীতেই আছে।

৮। তার মানে তুই আমাকে দেখা দিবার প্রতিশ্রুতি দিবার পরই উচ্চস্তরে চলে যাস ?

উঃ—হ্যাঁ।

৯। বড় আশা ছিল দেখবার ?

উঃ—আমি পঞ্চম স্তরে চলে গেছি বলে সেই জন্য আমি দেখা দিতে পারি নাই।

১০। আজ আসতে দেরি করলি কেন ?

উঃ—আমাদের বিচার হচ্ছিল সেই সময় তোমরা ডাকলে।

১১। এখন একবার দেখা দিতে পরবি নি ?

উঃ—না। দেখা দিলে যারা দূষিত তাদের মত শাস্তি হবে। এবং নিম্ন স্তরে নামিয়ে দেবে।

১২। তাহা হইলে আমরা কি করে বিশ্বাস করব তোদের অস্তিত্ব ?

উঃ—তোমাদের এত অবিশ্বাস ! তবে শিবানীর (মিডিয়মের) একটা অঙ্গহীন করে দেব, তবে তোমাদের বিশ্বাস হবে।

১৩। না না অমন কাজ করিস নি; আমাদের বিশ্বাস আছে, তবে তুই দেখা দিলিনি সেইজন্য মনটা কেমন খট্‌কা লাগে।

উঃ—ওর (শিবানীর) মুখটা ঠুকে দিব, তবে বিশ্বাস হবে।

১৪। না না অমন কাজ করিস নি মা, আমাদের খুব বিশ্বাস আছে। আমাদের ভাগ্যে দেখা নাই।
উঃ—তবে আমাদের স্বপনে যেমন দেখ, সেই রকম দেখ।

১৫। তুই যদি থাকতিস তা হলে দেখা দিতিস?
উঃ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

১৬। বীরেন বলছে যে, আমার মা যে এসেছেন, জানালাটা যদি খুলে দিয়ে যান তাহা হইলে সে জানবে যে, তার মা এসেছে; তা তুই পারবি?
উঃ—না। তাহলে আমরা দূষিত হয়ে যাব এবং শাস্তি দেবে।

১৭। আচ্ছা সেখানে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়?
উঃ—না। তোমরা আমায় বিরক্ত করোনা।

১৮। আচ্ছা একটা কথা বলব রাখবি?
উঃ—বল।

১৯। একটু সন্দেশ খেয়ে যানা মা?
উঃ—আচ্ছা দাও। (সন্দেশ খাওয়ান হয়, আত্মিক বলেন সন্দেশটা ভাল)

২০। কিসের সন্দেশ?
উঃ—খেজুরে গুড়ের। আমি খেজুরের গুড় খুব ভালবাসি। তবে আমাদের এ খাবার হুকুম নাই।

২১। একটু খেজুরের গুড় খাবি?
উঃ—দাও। গুড়টা ভাল।

২২। গুড়টা নলেন কেমন?
উঃ—নলেন নয়, পাটালি।

২৩। জল খাবি ত?
উঃ—না, জল আমাদের খাবার উপায় নাই। তাহলে শাস্তি হবে।

২৪। তুই এখন খুব উজ্জ্বল আলোতে আছিস ?
উঃ—হ্যাঁ।

২৫। সেখানে কি আছে ?
উঃ—সেখানে বিচার হচ্ছে, রাজা আছে। আরও অনেক কিছু আছে।

২৬। আচ্ছা সুভাষ বোস বেঁচে আছেন না তাঁর মৃত্যু হয়েছে ?
উঃ—জানি না! কারণ আমাদের সঙ্গে কারও পরিচয় নাই। তাছাড়া এদিক ওদিক যেতে দেয় না।

২৭। তোর দিদিমা অনেক দিন হল মারা গেছে। তোর মা এসে বলে গেল যে, তিনি জন্ম নিয়েছেন, তুই জানিস ?
উঃ—আমি কি করে জানব।

২৮। ও সব কথা বুঝি বলতে পারিস না। বললে বুঝি শাস্তি হয় ?
উঃ—হ্যাঁ শাস্তি হয়।

২৯। তোদের কি করতে হয় ?
উঃ—আমাদের খালি পূজা পাঠ করতে হয়।

৩০। তোদের খুব গন্ধ যুক্ত ফুল দিয়ে পূজা করতে দেয় ?
উঃ—হ্যাঁ, আমাদের পূজা করতে দেয়,আবার কেড়ে নেয়।

৩১। আচ্ছা একটা গন্ধযুক্ত ফুলের নাম বল না ?
উঃ—ফুলের নাম বলতে পারব না। (এই দেখ না আমায় মারছে) তৎক্ষণাৎ আত্মিককে বিদায় দেওয়া হয়। মিডিয়মের প্রকৃতিস্থ হইতে সময় লাগে।

লেখক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
জোনসগঞ্জ
জবলপুর
ইং ৮-১১-৪৭
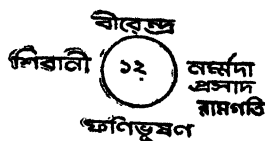
সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮টা
শেষ ৮-৫৫ মিঃ
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। আপনি কে ?
উঃ—সুধীর।

২। আমরা সকলে আপনাকে প্রণাম করছি।
উঃ—কর। কেন ডাকিস খালি।

৩। আপনাকে বিজয়ার প্রণাম করব বলে ডেকেছি ?
উঃ—তোরা এমনি প্রণাম করলেই ত হত। (চক্রপতিকে আশীর্ব্বাদ করেন) আত্মিক বলিলেন আর কে আসবে ? ছোট বৌ কোথায় ? অতঃপর বৌকে আশীর্ব্বাদ করেন।

৪। বিজ্ঞানকে (চক্রপতির পুত্র) প্রণাম করিতে বলা হয়। তোমায় প্রণাম করছে ?
উঃ—তুই কত বড় হয়েছিস। আয় বাবা (মাথায় ও পিঠে হাত বোলান)।

৫। আচ্ছা দিদি গয়ায় পিণ্ডি দিলে আপনারা কি পান ?
উঃ—হ্যাঁ।

৬। আচ্ছা পিণ্ডি দিলে কি হয় ?
উঃ—যন্ত্রণা ভোগ আর হয় না।

৭। কি যন্ত্রণা আপনাদের হয় ?
উঃ—শাস্তি করে।

৮। সেদিন নাগপুরে এসেছিলেন, আপনার সাজিতে কি গন্ধওলা ফুল ছিল ?
উঃ—'শিব শঙ্কর' ফুল। আমি পূজা করতে যাচ্ছি তোরা ডাকলি।

৯। ফুলটা কিরকম দেখতে ? ধুতুরা ফুলের মত, না গোলাপের মত, না অন্য কিছুর মত ?

উঃ—এই অপরাজিতা ফুলের মত। সে ফুল তোরা কোথায় পাবি।

১০। এই যে ভদ্রলোকটি (রামগতি মুখোপাধ্যায়) বসে আছেন ইনি আমার গুরু ভাই। এঁর স্ত্রী মারা গেছেন তাঁর কোন খোঁজ দিতে পারেন ?

উঃ—আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয় না। কার সঙ্গে কারও পরিচয় হয় না। সে ত তোকে বলেছি।

১১। আচ্ছা দিদি নাগপুরে ত মিষ্টি খেয়েছিলেন। আমার দোকানের মিষ্টি একটু খান না ?

উঃ—তোর যেরকম ইচ্ছে।

১২। বিজয়ার একটু প্রসাদ পেতাম আমরা।

উঃ—দে তোর সাধ হয়েছে যখন। (আত্মিককে রসগোল্লা এবং কলা দেওয়া হয়) আমি কলা খেতে ভালবাসি। আর কি, বাস্, দিয়েছিস তো। যা তোর বিজয়া দশমীর খাওয়ান হলো।

১৩। আমরা এখানে আছি সব দেখতে পাচ্ছেন ?

উঃ—হ্যাঁ, ঠিক দেখছি।

১৪। আচ্ছা আপনারা কোথা দিয়ে দেখেন ?

উঃ—শরীরের সর্ব্ব যে কোন দিক দিয়েই দেখতে পাই। অবশ্য যদি ইচ্ছা করি।

১৫। আপনি কোথা দিয়ে ইহার ভিতর প্রবেশ করেছেন ?

উঃ—মুখ দিয়ে।

১৬। আমার যে এই মেয়েটা অসুখে অমন হয়ে পড়ে রইল ও কি আর ভাল হবে না ?

উঃ—সে কথা কি আর বলব ভাই।

১৭। কিছু ঔষধ পত্র বলে দিতে পারেন ?

উঃ—(কিছুক্ষণ বাদ) বলিলেন বাবার চরণামৃত মাখাস, আর বাবার গুহার জল মাখাস। (তারকেশ্বরের) অতঃপর অভিবাদনপূর্ব্বক আত্মিককে বিদায় দেওয়া হয়।

লেখক — চক্রপতি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। — শ্রীফণিভূষণ দেব।

৮।১১।৪৭

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ২০-৩-৪৮

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃ
শেষ ৯-৫ "
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

আজ মিডিয়ম অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে।

১। আপনি কে ?

উঃ—পূর্ণ। (পূর্ণচন্দ্র দাস)

২। আপনার কষ্ট হচ্ছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩। আপনার মৃত্যু কোথায় হয়েছিল ?

উঃ—কাশীতে।

৪। শবদাহ পর্য্যন্ত আপনি উপস্থিত ছিলেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

৫। উপস্থিত কোন স্তরে আছেন ?

উঃ—তৃতীয় স্তরে।

৬। আপনি কাশীতে কতদিন ছিলেন ?

উঃ—এক বৎসর।

৭। আপনি যেখানে আছেন সেখানে আত্মীয় কেহ আছে ?

উঃ—কেহ নাই।

৮। মৃত্যুর সময় আপনার কি খাইবার ইচ্ছা হয়েছিল ?

উঃ—কিছু না।

৯। কাউকে দেখবার ইচ্ছা হইয়াছিল ?

উঃ—না। তবে ঘরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। (ইহার বাড়ী হাওড়ায়)।

১০। মৃত্যুর পূর্ব্বে অসুস্থ অবস্থায় কাশীতে কতদিন ছিলেন ?

উঃ—তিন দিন।

১১। আপনার কতদিন হলো মৃত্যু হইয়াছিল ?

উঃ—চার বৎসর। তিন পেরিয়েছে। (মৃত্যু ১৩৫০ সালের কার্ত্তিক মাসে হয়; ভুল করলে)।

১২। মৃত্যুর পর আপনাকে অন্ধকারে লইয়া গিয়াছিল কি ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৩। মৃত্যুর পর আপনাকে কেহ লইতে আসিয়াছিল কি ?

উঃ—হ্যাঁ, আসিয়াছিল।

১৪। কে তাঁহারা ?

উঃ—একজন শিবের মত আর একজন দ্বারবানের মত দেখতে।

১৫। আপনাকে সেখানে কিছু কাজ করতে হয় ?

উঃ—না।

১৬। পূজাপাঠ ও করতে হয় না ?

উঃ—হ্যাঁ, পূজা পাঠ করতে হয়।

১৭। অনাথের সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না।

১৮। তোমার মেজদাদার সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না। বলতে পাচ্ছি না, বড় কষ্ট হচ্ছে।

১৯। আচ্ছা আপনাকে আজ ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু কাল আসবেন ত; প্রতিশ্রুতি দিন।

উঃ—হ্যাঁ, আসব।

লেখক	চক্রপতি
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ২২-৩-৪৮
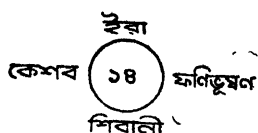
সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৭-৫০ মিঃ
শেষ ৮-৩৫ „
মিডিয়ম —শিবানী দেবী

১। আপনি কে ?
উঃ—পূর্ণ।

২। আজ আশা করি ভাল ভাবে কথা বলতে পারবে ?
উঃ—হ্যাঁ, পারব।

৩। সেদিন বোধহয় বসবার সুবিধা করতে পারনি ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪। আজ কষ্ট হচ্ছে ?
উঃ—না কষ্ট হচ্ছে না।

৫। আজ আসতে দেরি হল কেন ?
উঃ—আমি পূজা করতে বসেছিলাম তুমি ডাকলে।

৬। তোমায় তুমি বলে ডাকছি তাতে রাগ করছ নাত ?
উঃ—না।

৭। তুমি আমার বাল্যবন্ধু ?
উঃ—হ্যাঁ।

৮। তুমি যেখানে আছ তার একটু পরিচয় দাও না ? সেটা কত দূরে ?
উঃ—অনেক দূর, সে কি করে বললে বুঝবে।

৯। তবে কি সেটা চন্দ্র সূর্য্য থেকে দূরে ?
উঃ—হ্যাঁ, চন্দ্র সূর্য্য থেকে অনেক দূরে।

১০। আমরা যখন ডাকি কি করে বুঝতে পার ?
উঃ—আমরা সর্ব্বদাই বুঝতে পারি।

১১। তোমার মৃত্যুর পর কোথায় ছিলে ?
উঃ—কাশীতেই ছিলাম।

১২। সে কথা না, শবদেহটা যখন পড়েছিল তখন কোথায় ছিলে ?

উঃ—ঐ বাড়ীতেই ছিলাম।

১৩। আচ্ছা আজ যখন এসেছ রসগোল্লা খাবে ?

উঃ—দাও। (অতঃপর আত্মিককে রসগোল্লা দেওয়া হয়) খাওয়া হয়ে গেছে।

১৪। তোমরা তোমাদের মূর্ত্তি আমাদের দেখাতে পার ?

উঃ—পারি, কিন্তু দেখাব না।

১৫। কেন ?

উঃ—শাস্তি হবে ; আমরা ত আর দূষিত হয়ে নেই। দূষিত হলে শাস্তি দেবে।

১৬। সুভাষ বোসের কোন খবর বলতে পার ?

উঃ—না। সুভাষ এখানে নাই।

১৭। ও জগতেই নেই ?

উঃ—এ জগতে অন্য কোন স্তর আছে কিনা জানি না।

১৮। আমার দিদির সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—হ্যাঁ কাশীতে দেখা হয়েছিল, তিন বৎসর পূর্ব্বে।

১৯। ভোঁদোর সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—হ্যাঁ।

২০। দুর্গার সঙ্গে ?

উঃ—হ্যাঁ।

২১। আমাদের কি কেহ মূর্ত্তি দেখাতে পারে না ?

উঃ—অনেক আছে। দুর্গা পারে।

২২। তর্পণের সময় সন্তান জল না দিলে কষ্ট হয় ?

উঃ—হ্যাঁ কষ্ট হচ্ছে। তবে দাদা জল দিয়েছে।

২৩। আমিও ত জল দিয়েছি ?

উঃ—হ্যাঁ।

২৪। কেশব জল দেয় না ?

উঃ—ও কিছুই করে না। (আত্মিক কাঁদিয়া ফেলিল)।

২৫। ও জগতে কি রকমে আছ ?

উঃ—এখানে কিছুই সুখ নাই।

২৬। অন্ধকারে কত দিন থাকতে হয়েছিল ?

উঃ—এক বৎসর।

২৭। পরলোক সম্বন্ধে যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদের কি করলে বিশ্বাস করান যায় ?

উঃ—কি বলব। আমরা অত্যাচার করলে।

২৮। ওখানে কে কথা বলছে ?

উঃ—মনোমোহন। (ঘরের মধ্যেই ছিল)

২৯। এ ঘরে কে কে আছে ?

উঃ—কেশব (আত্মিক কাঁদিয়া ফেলিল। কেশব ইহার পুত্র) আমায় কেন ডেকেছ ! মায়া হয়।

৩০। আচ্ছা সেখানে রাজা আছেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩১। সেখানে সাধু সন্ন্যাসী আছেন ?

উঃ—হ্যাঁ। আমি এখানে এ জগতে আসতে চাই, আসতে দেয় না।

৩২। তোমার সেখানে গুরু আছে ?

উঃ—আমি ওসব ভালবাসি না ! আচ্ছা আজ নমস্কার জানাচ্ছি। তবে যাবার আগে একটা গান শুনে যাও। আত্মিক বলিলেন "আমিও নমস্কার করছি।" (হাত তুলিয়া মিঃ নমস্কার করেন)।

৩৩। তুমি গান শুনতে খুব ভালবাসতে না ?

উঃ—হ্যাঁ। (একটি গান শুনান হয়)।

৩৪। গানটা কেমন ?

উঃ—ভাল।

৩৫। আর শুনবে ?

উঃ—না।

৩৬। তোমার পরমার্থিক উন্নতির জন্য কি সাহায্য করতে পারি ? গীতা শুনবে ?

উঃ—শুনব।

৩৭। কোথায় শুনাব ?

উঃ—এমনি আমার নাম করে শুনাইও।

৩৮। কেশবকে বলব ওর বৃহস্পতিবার ছুটি থাকে, সেদিন গীতা শুনাবে। কখন শুনবে ?

উঃ—সন্ধ্যা কিম্বা সকালে।

৩৯। কিন্তু সে সময় ত তুমি পূজা কর ?

উঃ—সকাল দশটায় দিও।

৪০। কি করে ডাকবে ?

উঃ—আমি হাওড়ার বাড়ীতে রোজ যাই।

৪১। কেশবকে তর্পণ করতে বলব।

উঃ—আচ্ছা। দাদা জল দিয়েছিল তাই খেয়েছিলাম। ও ছাড়া আর কিছু আমাদের খাবার নাই।

৪২। কেশব ভক্তি করে তোমায় ?

উঃ—হ্যাঁ তা করে। সকালে উঠে যখন যায় প্রণাম করে।

৪৩। তুমি কার ভিতর এসেছ ?

উঃ—শিবানীর।

৪৪। সেদিন ওর এত কষ্ট হয়েছিল কেন ?

উঃ—আমি ওর চোল চেপে ধরেছিলাম। গলা টিপে দিয়েছিলাম।

৪৫। কেন ?

উঃ—আমায় ডাকে কেন ?

৪৬। কেশব কেমন কারবার চালাচ্ছে ?
উঃ—ভালই।

৪৭। সে দিন তুমি একটা ভুল করলে। তোমার মৃত্যু হয়েছিল ৪ বৎসর আগে ?
উঃ—হ্যাঁ। আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল।

৪৮। সেই জন্যই বুঝি শিবানীকে মারবার চেষ্টা করছিলে ?
উঃ—হ্যাঁ, ও মরে যাক্ না, ওর বেঁচে থেকে কি হবে !

৪৯। কেশব ভাইদের ভালবাসে ত ?
উঃ—হ্যাঁ।

৫০। সে সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই ?
উঃ—না।

৫১। বিভূতি সে এখন কোথায়, তোমার কাছে ?
উঃ—(ব্যঙ্গসুরে) যাাঃ, সে এখন এখানে আসবে।

তৎপরে, কেশব প্রণাম করিবার পর, আশীর্ব্বাদ করে।
অতঃপর আত্মিককে চলিয়া যাইতে বলা হয়।

লেখক— চক্রপতি
বীরেন্দ্রনাথ সরকার শ্রীফণিভূষণ দেব।

আত্মিককে নিম্নলিখিত গানটি শুনান হয়

মা, এখনও কি ব্রহ্মময়ী, হয়নি মা তোর মনের মত,
মা অকৃতী সন্তানের প্রতি মাগো, যন্ত্রণা আর দিবি কত,
মা, জ্ঞান রত্ন দিয়েছিলি, মসিল দিয়ে তশীল করিলি, মা—
হিসাব করে দেখ দেখি মা, আমার দুখের আর বাকি কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, ওমা বিষয় বিষ খাওয়াইলি
এখন বিষের জ্বালায় সদাই জ্বলি
দুর্গা বলে আর ডাকব কত।
আমার দুর্গতি নাশ বলে মা ডাকব কত।

স্থান ও তারিখ	চক্রনির্দেশ	সময় ও মিডিয়ম
২০ নং মামা রোড ধরমপেট, নাগপুর ইং ২৫-৩-৪৮	বীরেন্দ্র (১৫) শিবানী	আরম্ভ সন্ধ্যা ৮-৪০ মিঃ শেষ ৯-৩৫ মিঃ মিডিয়ম শিবানী দেবী

১। আপনি কে ?

উঃ—ভোঁদো।

২। ভাল আছিস ত মা ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩। আজ ত আর কষ্ট কিছু হয় নি ?

উঃ—না।

৪। সেদিন যে তারা দুইজন ধরে নিয়ে গেল তারা অত্যাচার করে নি ?

উঃ—না।

৫। আজ মা তোকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করব বলবি ত ?

উঃ—হ্যাঁ বল, কি শুনবে বল।

৬। আচ্ছা তোমাদের যাঁরা গুরু তাঁরা এই চক্রে এসে আমাদের কিছু উপদেশ দিতে পারেন না ?

উঃ—না, পারেন না। তাঁরা আমাদের উপদেশ দেবার জন্য আছেন।

৭। আমাদের উপদেশ শুনতে ইচ্ছা করে, আমাদেরও ত একদিন যেতে হবে ?

উঃ—ও কথা বলো নি।

৮। একবার চেষ্টা করে দেখিস না যদি আনতে পারিস ?

উঃ—আচ্ছা দেখব।

৯। দুর্গা এখন কাশীতেই আছে না ?

উঃ—হ্যাঁ।

১০। তুমি এখন কোন স্তরে আছ ?

উঃ—পঞ্চম স্তরে।

১১। সেখানে স্তরগুলি কি রকম আমায় একটু বুঝিয়ে দে না মা ?

উঃ—ওখানকার স্তরগুলি এখানে যেমন এক একটা দেশ সেই রকম।

১২। সেখানে বাড়ী ঘর আছে ?

উঃ—হ্যাঁ আছে।

১৩। কি করম দেখতে ?

উঃ—যেমন তোমাদের সেই রকমই। তবে ফাঁকা মত।

১৪। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে ?

উঃ—হ্যাঁ আছে।

১৫। পুরুষ ছেলে আছে ?

উঃ—হ্যাঁ আছে।

১৬। আমাদের আত্মীয় সেখানে কেউ আছে ?

উঃ—সব আলাদা থাকে কি করে বলব। কার সঙ্গে কার পরিচয় নাই। সেখানে আপন বলে ত আর কিছু নাই।

১৭। তোমাদের কি কোনই শরীর নাই ?

উঃ—না।

১৮। সেখানে কি করলে সাজা দেয় ?

উঃ—তারা যা বলে তা না করলেই সাজা দেয়। আবার নিচেয় নামিয়ে দেয়।

১৯। একটা স্তর থেকে অন্য স্তরে যাও কত দূর ?

উঃ—একটা গ্রহের এপাশ থেকে ওপাশ পর্য্যন্ত।

২০। দিদির সঙ্গে তোমার দেখা হয় ?

উঃ—মায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় না।

২১। তোদের গুরুদেবকে আমাদের উপদেশ দিতে বলবি ?

উঃ—হুঁ বলে দেখব।

২২। কাশীতে বামুন দিদিকে যখন মিডিয়ম করেছিলাম, তখন সত্যই কোন আত্মিক এসেছিল ?

উঃ—হ্যাঁ। তখন আমি এখানেই ছিলাম, তোমাদের জগতে।

২৩। বীরেনের পরীক্ষা এসেছে ওকে একটু সাহায্য করিস মা ?

উঃ—হ্যাঁ করব।

২৪। আচ্ছা দুর্গা কি আমায় দেখা দিতে পারে না ?

উঃ—হ্যাঁ, সে নিশ্চয় পারে।

২৫। তবে দুর্গাকে একবার বলে দেখ না মা ?

উঃ—সে কথা আমি কি করে বলব, আমি যে অন্য স্তরে। সেত এখন নিশ্চয়ই দেখা দিতে পারে। আমরা যদি অন্য লোকের সহিত কথা বলি শাস্তি দেয়।

২৬। সেখানে সাধু আছে ?

উঃ—হ্যাঁ, তোমাদেয় এই দুনিয়াটি ভাল।

২৭। আচ্ছা তোমরা আমাদের মনের কথা, কিংবা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে পার ?

উঃ—হ্যাঁ পারি, কিন্তু বলব না, বললে শাস্তি দেয়। আমরা সব বলতে পারি, তুমি কবে মরবে বলতে পারি কিন্তু বলব না।

২৮। আমাদের মনের খবর বলতে পার ?

উঃ—হ্যাঁ তা পারি। তবে আমাদের সময় বড় কম। তা ছাড়া শাস্তি দেবে বললে।

২৯। আজ অত আস্তে কথা বলছ কেন ?

উঃ—আমার শরীর ভাল নেই।

৩০। তোমাদেরও অসুখ করে না কি ?

উঃ—না।

৩১। তবে কিরূপে শরীর খারাপ হল ?

উঃ—আমার মনের সুখ নাই।

৩২। মনের সুখ নাই কেন ?

উঃ—আমি যেতে চাইছি মায়ের কাছে ওরা যেতে দেবে না। কত লোক চলে গেল।

৩৩। গান্ধীজী মারা গেছেন জান ?

উঃ—হ্যাঁ যেদিন মরে আমরা দেখতে গিয়াছিলাম।

৩৪। বহু আত্মিক কি দেখতে এসেছিল ?

উঃ—হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ আত্মিক দেখতে এসেছিল।

৩৫। কোথায় দেখতে গিয়াছিলে ?

উঃ—দিল্লীতে।

৩৬। কতক্ষণ ছিলে ?

উঃ—মিনিট দশ ছিলাম।

৩৭। কখন গিয়াছিলে, যখন গুলি মারে, না তারপর ?

উঃ—মরবার পর গিয়াছিলাম।

৩৮। কি দেখলে ?

উঃ—সে যাচ্ছে আমরা দেখলাম। রথে করে যাচ্ছে। তিন চার জন নিয়ে গেল। তখন তাঁর শরীর দিয়ে আলো বেরুচ্ছে।

৩৯। সুভাষের আত্মিক সেখানে ছিল ?

উঃ—না ছিল না। ওকে আমি দেখতে পাই না।

৪০। তিনি রথের মধ্যে কোথায় ছিলেন ?

উঃ—সে সিংহাসনে বসে যাচ্ছে।

৪১। রথে আর কে ছিল ?

উঃ—একজন চালাচ্ছে আর গান্ধীজীর পাশে একজন বসে আছে। আর দুইজন দারবানের মত লোক দাঁড়িয়েছিল।

৪২। তারপর কোথা গেল ?

উঃ—হু হু করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৪৩। তোমরা নমস্কার করেছিলে ?

উঃ—হ্যাঁ নমস্কার করলাম।

৪৪। তখন কি জয়ধ্বনি দিচ্ছিলে ?

উঃ—হ্যাঁ, রামচন্দ্রের জয়, গান্ধীজীকি জয়।

৪৫। আজ একটা ত আমাকে খুব সুন্দর নূতন খবর দিলি ?

উঃ—আমরা বলতে পারি সব। তবে বললেই শাস্তি করবে।

৪৬। এখানে আর কোন আত্মিক এসেছেন ?

উঃ—না আমি একলাই এসেছি। এখন আমাদের ছুটি কিনা তাই সঙ্গে আর কেহ আসে নাই। তা না হলে সঙ্গে লোক আসে।

৪৭। কখন ছুটি হয় ?

উঃ—পূজা পাঠ শেষ হয়ে গেলে ছুটি দেয়।

৪৮। ছুটির সময় ঘুমাও ?

উঃ—যার যা ইচ্ছা সে তাই করে; কেউ ঘুমায় কেউ বেড়ায়।

৪৯। যারা তোমাদের সঙ্গে আসে, তারা বোধ হয় শুনতে আসে যে, তোমরা কি বলছ না বলছ ?

উঃ—হ্যাঁ।

৫০। এখন ত আর কেউ আসেনি, সে জগতের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলেই যা না ?

উঃ—না তা হয় না। তারা সব বুঝতে পারে। মিথ্যা কথা বলবার যো নেই, বললেই ধরে ফেলবে।

৫১। তোরা তাহলে আমাদের সমস্ত খবর বলতে পারিস, আমাদের কি হবে না হবে ?

উঃ—আমরা চেষ্টাকরলে পারি। আমাদের সময় কুলায় না।

৫২। কতক্ষণ পূজা করতে হয় ?

উঃ—সকালে তিন চার ঘণ্টা, দুপুরে, রাত্রিতে।

৫৩। এখন ওখানে রাত্রি ?

উঃ—হ্যাঁ।

৫৪। সেখানে এখন কি রকম আলো আছে, আর সকাল বেলাই বা কি রকম থাকে ?

উঃ—দিনের আলো এক রকম, রাত্রের আলো এক রকম। সে কি করে বুঝাব বল।

৫৫। বুঝতে কেন পারবনি, যেমন এখানে সকালবেলা লাল হয়ে সূর্য্য ওঠে, আবার সন্ধ্যার সময় ডুবে যায় সেই রকম কি ?

উঃ—না। সে আলোটা একভাবেই থাকেএবং সন্ধ্যা হলেই সে আলোটা লাল হয়ে যায়, একটা অন্য রকম আলো হয়। আবার সকাল হলে লাল হয়ে উঠে।

৫৬। এরা বলছিল কি জানিস, যদি জানালাটা এক বার খুলে দিয়ে যাস তা হলে ওরা বুঝতে পারে ?

উঃ—আবার সেই কথা।

৫৭। না না, তোকে করতে বলছিনা আমার ষোল আনা বিশ্বাস আছে। (আত্মিক কোন কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল)।

৫৮। তোর কাকাকে ডেকেছিলাম, সে এসেছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যারা পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাসী তাদের কি করে বিশ্বাস করান যেতে পারে ? সে বলল অত্যাচার করলে।

উঃ—হুঁ।

৫৯। অত্যাচার করলেত তোদের দণ্ড হয় ?
উঃ—হ্যাঁ, অত্যাচায় করলে দণ্ড হয়।

৬০। সে এসে খুব কাঁদল ; তোদের ওখানেও হাসি কান্না হয় ?
উঃ—হ্যাঁ হাসি কান্না সব হয়, তবে নিজে নিজে। কেউ কার সঙ্গে কথা কয় না, কার দুঃখে কাঁদেও না।

৬১। সেখানে তোদের রাজার কাছে রোজ হাজরি দিতে হয় ?
উঃ—হ্যাঁ।

৬২। কখন ?
উঃ—সকালে।

৬৩। আচ্ছা সেই রাজাকে কিরকম দেখতে ?
উঃ—এখানে যেমন রাজাদের দেখতে সেইরকম।

৬৪। বীরেন তোকে জিজ্ঞাসা করছে ও কোন ডিভিসনে পাস করবে ?
উঃ—ভাল করবিরে ভাল করবি। অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন।

৬৫। তোকে আমি এতক্ষণ ধরে তুই বলে ডাকলাম বলে, রাগ করিস নি ত ?
উঃ—না না।

৬৬। কিছু খাবি মা ?
উঃ—কি খাব।

৬৭। রসগোল্লা কিংবা কোন মিষ্টি ?
উঃ—না।

৬৮। আমার মেয়ে চিত্রার বিবাহ হয়ে গেছে জানিস ?
উঃ—হাঁ। (২।৩ মিনিট চুপ থাকিবার পর) আত্মিক বলিল সে কাঁদছে, রোজই কাঁদে, আজ তবে অনেক বেশী কাঁদছে। (এই কান্নাটি একেবারে সত্য ঘটনা পরে পত্রের দ্বারা জানিয়াছিলাম।)

৬৯। তোরা তা হলে সব খবর দিতে পারিস ?
উঃ—হ্যাঁ তা পারি, তবে দিলে শাস্তি দেয়, নিচেয় নামিয়ে দেয়।

৭০। দিদি সে দিন বলে গেল আমার মা কোন একজায়গায় জন্মগ্রহণ করেছে। তাঁকে কত জিজ্ঞাসা করলাম কিছুতেই বলল না। তুই কিছু জানিস ?
উঃ—না। আমার সঙ্গে দিদিমার দেখা হয় নাই।

৭১। মাকে ত একবার দেখতে ইচ্ছা করে, একবার দেখে আসতাম ?
উঃ—এখানে এলে কে মা, আর কেই বাবা। কেউ আর কার নয়। মাও ত দিদিমার সঙ্গে কথা বলতে পায় না। তবে মা দেখতে পাচ্ছে যে, দিদিমা চলে যাচ্ছে।

৭২। শিবশঙ্কর ফুল তোরা পূজায় পাস ?
উঃ—হ্যাঁ পাই, তবে খালি পূজার সময়।

৭৩। তুই বললি তোদের শরীর নেই তবে তোরা কি রকম দেখতে ?
উঃ—আমাদের হাত পা কিছুই নেই। তবে আমরা ইচ্ছা করলে শরীর ধরতে পারি। এবং সব কিছু বুঝতে পারছি।

৭৪। তোরা কতটুকু আকারে ?
উঃ—এই একটা রসগোল্লার মত।

৭৫। শিবানীর ভিতর যখন সেঁদিয়েছিলি তখন কত বড় ছিলি ?
উঃ—ছোট একটা রসমুণ্ডির মত।

৭৬। ওর কোন খানে বসে আছিস ?
উঃ—ওর ডান পাশে বুকের কাছে।

৭৭। (অতঃপর চক্রপতি মিডিয়মের বুকে হাত দিয়ে দেখায়)
এইখানটা ?
উঃ—না।
তবে, এইখানটা ?
উঃ—হ্যাঁ।

৭৮। তোরা যখন ভিতরে আসিস তখন আমি যতক্ষণ না যেতে বলি ততক্ষণ যাস না কেন ?
উঃ—তুমি ডেকেছ আর চলে গেলে সেটা তোমার অপমান করা হয়।

৭৯। আমরা যদি এজগতে প্রাণ ভরে একসাল তপস্যা করি, তোদের সূক্ষ্ম জগতে কতদিন ভগবানের সাধনা করলে এর সমান হতে লাগে ?
উঃ—একশত বৎসর।

৮০। তোদের যে আমার কতখানি দেখবার ইচ্ছা তুই কি করে বুঝবি ?
উঃ—তখন তুমি আমায় গালাগালি করেছিলে কেন ? (কাশীতে)

৮১। তোকে মিথ্যবাদী প্রভৃতি বলা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আর তাছাড়া আমি জানবই বা কি করে যে তুই চলে যাবি ?
উঃ—সেটা কি আমার ইচ্ছামত হয় ?

৮২। না না তাকি আর বলছি ?
উঃ—সেই সময় এখানে বললেই ত দেখা দিতাম। কাশীতে বললে তাই। দুরকম কথা বল্‌লে আমাদের শাস্তি হয়। কাশীতে দেখা দেব বলেছিলাম, আর আমি এখানে দেখা দিতে পারতাম না।

৮৩। তবে দুর্গাকে একটু বল না ?
উঃ—আমি কি করে দুর্গার সঙ্গে কথা বলব, সে থাকে অন্য যায়গায়।

আচ্ছা আজ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, মিডিয়মের পায়ের দিক্ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বীরেন তোকে প্রণাম করছে। আত্মিক হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে (মিডিয়ম) এবং কাঁদিয়া ফেলে।

৮৪। কেঁদে আর কি হবে ? ওতো সুখেই আছে ?
উঃ—হ্যাঁ।

৮৫। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছি, তুই যেন শীঘ্র সপ্তম স্তরে যেতে পারিস।
উঃ—হ্যাঁ।

৮৬। সেখানে গেলে পরে তোকে ডাক্‌ব, তোকে ডাক্‌লে আসবি ত ?
উঃ—হ্যাঁ।

৮৭। সেখানকার সম্বন্ধে বলবি ত ?
উঃ—কি করে বলব। আচ্ছা এবার তুই যা মা, তোকে একটা চুমু খেয়ে নিই। চক্রপতি মিডিয়মের দাড়ি ধরে চুমু খাইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক চলিয়া যায়।

লেখক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট নাগপুর (সিয়াঙ্গে)
ইং ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ
শেষ ৯টা
মিডিয়ম শিবানী দেবী

১। কে তুমি ?
উঃ—অস্পষ্ট কি বল্লে।

২। তুমি কি ভোঁদো, না দিদি, কে তুমি? কোন উত্তর দেয় না। (তখন চক্রপতি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, হে পরম পিতা পরমেশ্বর আত্মিককে কথা বলিবার শক্তি দিন)

৩। তুমি কি নিনু (চক্রপতির কন্যা, ভাল নাম অনুভা) ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪। তোমাকেই ত চক্রে ডেকেছি, তোমার কি বড় কষ্ট হচ্ছে ?
উঃ—হ্যাঁ।

৫। মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন তুমি কথা বলিতে পার না, তখন তোমাকে আমি 'নারায়ণ' বলতে বলি, তুমি কি মনে মনে বলেছিলে ?
উঃ—হ্যাঁ।

৬। মৃত্যুর পর আমাদের বাটীতে এসেছিলে কি ?
উঃ—বাড়ীতে দুদিন পরে এসেছিলাম।

৭। পূর্ণিমা স্বপ্ন দেখেছিল যে, তুমি তার মাথার নিকট এসে শুলে, সত্যিই কি মাথার নিকট শুয়েছিলে ?
উঃ—দিদির মাথার নিকট শুই নাই।

৮। তুমি এখন আলোয় না অন্ধকারে ?
উঃ—অন্ধকারে।

৯। মৃত্যুর পর তোমাকে কেহ কি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ?
উঃ—দুজন নিয়ে যায়।

। তারা কি আমাদের কোন আত্মীয় ?
উঃ—তারা আত্মীয় নয়।

১১। পায়ের যন্ত্রণা এখন আছে ?
উঃ—পায়ের যন্ত্রণা আর নাই।

১২। তুমি এখন চলতে পার ?
উঃ—হ্যাঁ চলতে পারি।

১৩। তোমার মৃত্যুর পর চিত্রার বড় ভয় হয়েছিল, তুমি কি চিত্রার বাড়ী গিয়েছিলে ?
উঃ—চিত্রার বাড়ী যাই নাই।

১৪। তর্পণের সময় যে জল তোমাকে দিই, তাকি তুমি পেয়েছিলে ?
উঃ—তর্পণের জল পেয়েছি।

১৫। তোমাকে যদি ডাকি তুমি আবার আসবে ?
উঃ—হ্যাঁ, আবার ডাকলে আসব।

১৬। তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, নয় ?
উঃ—হ্যাঁ, বড় কষ্ট হচ্ছে। (তারপর কাঁদিতে লাগিল)।

তখন আমি (চক্রপতি) বলিলাম, আর কাঁদিস না, এই ত বাবার সঙ্গে কথা কইলি। যাও এখন চলে যাও। তৎক্ষণাৎ নিনুর আত্মিক চলিয়া যায়। আওয়াজ একটু কষ্টজনক নাকি সুরে হয়। স্বচ্ছন্দ ভাব আদৌ ছিল না। মিডিয়মের শরীরে প্রবেশ করিবার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে আসে। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে। আমার দক্ষিণ পার্শ্বের চেয়ারে বসিয়া পড়ে, পরক্ষণেই মিডিয়ম বেহুঁশ হয়। শেষে মিডিয়ম এই কথাগুলি বলিয়াছিল।

লেখক চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ		সময় ও মিডিয়ম
২০ নং মামা রোড,		আরম্ভ সন্ধ্যা ৮টা
ধরমপেট, নাগপুর		শেষ ,, ৮-৪৫ মিঃ
ইং ১৯-১১-৪৮		মিডিয়ম—শিবানী দেবী
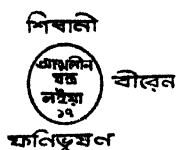
একটি দুষ্ট আত্মিকের আবির্ভাব।

১। কে আপনি? নিরুত্তর।

একটি দুষ্ট আত্মিকের অত্যাচার দেখুন। (তজ্জন্য সাহসের আবশ্যক করে)। আত্মিক আসিয়া মিডিয়মকে অত্যধিক কষ্ট দেয়। সে মিডিয়মের ঘাড় ধরিয়া বাঁকাইয়া দিয়াছিল। মিডিয়মের হাত পা পাথরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল। ভগবানের নাম লইবার পর একটু হাত পা শিথিল হয়। পুনরায় নাম জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্ববৎ শক্ত হইয়া যায়। অনেকে অনুমান করিল ফিট্ হইয়াছে। চক্রপতি গম্ভীরভাবে ভগবানের দোহাই দিয়া, আত্মিককে চলিয়া যাইতে বলিতেই, মিডিয়াম তৎক্ষণাৎ দুই সেকেণ্ডের মধ্যে প্রকৃতিস্থা হইয়া যায়। ইহাতে মনে হয় ফিট্ নয়, কোন দুষ্ট আত্মিকের ব্যবহার। নচেৎ দুই সেকেণ্ডের মধ্যে শরীরের শক্তভাব শিথিল হইত না।

লেখক সঃ চক্রপতি	চক্রপতি
শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
মহাদেব প্রসাদ বাসন
ব্যাপারীর দ্বিতলে
কোতয়ালি বাজার
জবলপুর
ইং ৯-৯-৪৪

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৮-৪০ মিঃ
শেষ „ ৯-১০ মিঃ
মিডিয়ম শেঠ গোবিন্দ প্রসাদ

হিন্দীতে কথা হয়।

১। আপ কোন্ হ্যায় ?
উঃ—নামমে ক্যায়া হোগা। ক্যায়া মেরি তগলিব দূর কর সেক্‌তা হ্যায় ?

২। আপ্ কোন্ স্তরমে গিয়া ?
উঃ—ম্যায় আভি তৃতীয় স্তরমে হ্যায়। পরিণাম ভোগ রহা হুঁ।

৩। ম্যায় প্রার্থনা করেঙ্গে আপকো তকলিব দূর করনে কে লিয়ে ?
উঃ—আপ আপনা লিয়ে কুছ কর লিজ্জিয়ে। (ব্যঙ্গসুরে)

৪। এ জগৎমে আপকা কৈ রেস্তেদার হ্যায় ?
উঃ—নেহি। পিতা নেহি, মা নেহি, স্ত্রী নেহি, পুত্র নেহি, কৈ নেহি। (ক্রোধের সুরে)

৫। চক্রপতি হাত যোড় করকে কহা কৃপা করকে আপকো নাম বাৎলাইয়ে ? তব আঁখি লাল করকে চক্রপতিকো দেখনে লাগা। আত্মিক কহনে লাগা, কাহে তক্‌লিব দেতা হ্যায় ? টেবিলের উপর কাগজ ছিল তাহাতে আত্মিক নাম লিখিয়া দিলেন। তাহাতে বুঝা গেল না আত্মিক হিন্দু কি মুসলমান। তৎপরে নমস্কার দিয়া আত্মিককে চলিয়া যাইতে বলা হয়। তৎক্ষণাৎ চলিয়া যান।

লেখক চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ		সময় ও মিডিয়ম
২০ নং মামা রোড	বীরেন্দ্র	আরম্ভ সন্ধ্যা ৮-৫ মিঃ
ধরমপেট, নাগপুর	শিবানী (১৯) ফণিভূষণ	শেষ „ ৯-১৫ মিঃ
ইং ২৪-১০-৪৯		মিডিয়ম শিবানী দেবী

১। কে আপনি ? দাসমহাশয় ?
উঃ—ইসারায় হ্যাঁ বলিলেন।

২। আমরা পরলোক সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করিতে চাই ?
উঃ—কর (ইসারায়)।

৩। আপনার কষ্ট হচ্ছে ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪। মৃত্যুর পর কি আপনি অন্ধকারে গিয়াছিলেন ?
উঃ—না।

৫। মৃত্যুর পর আপনাকে কজন নিতে এসেছিলেন ?
উঃ—পাঁচজন।

৬। আপনার অস্থি কোথায় দেওয়া হয়েছিল ?
উঃ—কাশীতে।

৭। কে কে অস্থি দিতে গিয়াছিল ?
উঃ—মনোমোহন ও তুমি।

৮। মনোমোহন কাশীতে ভয় পাইয়াছিল, আপনি কি কাশীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

৯। পারুলকে (মেয়েটি আত্মিকের নাতনি বি, এ, পাস) ইটারসি স্টেশনে দেখা দিয়েছিলেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

(সকলের প্রণাম। হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদকরণ। আত্মিক কাঁদিয়া ফেলিলেন)।

১০। তর্পণের সময় জল দিয়েছিলাম, পেয়েছিলেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

১১। শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

১২। মোহিনী যে আলাদা শ্রাদ্ধ করেছে, নিশ্চয়ই সেটা ভাল করে নাই ; আপনার কি মত ?
উঃ—ভাল করে নাই।

১৩। কালকে আপনাকে ডাকব, আসবেন ত ?
উঃ—হ্যাঁ আসব।

১৪। আপনার কিছু খাবার ইচ্ছা আছে ?
উঃ—না।

১৫। মনোমোহনের প্রতি আপনার কোন আদেশ আছে ?
উঃ—না।

১৬। মৃত্যুর সময় গীতা পাঠ শুনেছিলেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

১৭। গীতা পাঠ কে করেছিল ?
উঃ—(বীরেনকে হাত দিয়া দেখাইলেন)।

১৮। দিদির ('আত্মিক' চক্রপতির ভগ্নীপতি) সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?
উঃ—হ্যাঁ।

১৯। মৃত্যুর সময় দিদি এসেছিলেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

২০। কালকে আবার ডাক্‌ব, আসবেন ত ?
উঃ—হ্যাঁ।

২১। আপনার মূর্ত্তি দেখাতে পারেন ?
উঃ—না।

২২। আবার কবে আসৃবেন ?

উঃ—যবে ডাকবে।

অতঃপর প্রণাম করিয়া আত্মিককে বিদায় দেওয়া হয়।

লেখক সঃ চক্রপতি
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড,
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ২৫-১০-৪৯

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮-৫ মিঃ
শেষ „ ৮-৪০ মিঃ
মিডিয়ম শিবানী দেবী

১। কে আপনি ?

উঃ —সুধীর। (চক্রপতির অভিবাদন) তুই কেন ডাকিস ?

(সকলের প্রণামকরণ। হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদকরণ)

২। আপনি আতা খেতে ভাল বাসতেন না ?

উঃ—হ্যাঁ। কেন তোরা জ্বালাতন করিস ?

৩। একটু আতা খান না ?

উঃ—শিবানী ত আমায় আতা দিয়ে এসেছে।

৪। আমড়া এনেছি একটু খান না ?

উঃ—(আতা খাওয়া হয়, খাওয়া হয়ে গেলে বললেন) আর খাব না।

৫। আপনাকে গুটিকত প্রশ্ন করব, উত্তর দেবেন ?

উঃ—দেব।

৬। দাস মহাশয় পরলোক গমন করেছেন আপনি জানেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

৭। তাঁর মৃত্যুর সময় এসেছিলেন ?

উঃ—হ্যাঁ, এসেছিলাম।

৮। কয়জন বিদেহী তাঁকে নিতে আসেন ?
উঃ—পাঁচজন এসেছিলেন।

৯। কে কে তাঁরা ?
উঃ—আমাদের যে বিষ্ণু রাজা আছেন তাঁর দূতেরা।

১০ আপনার সঙ্গে দাসমহাশয়ের দেখা হয়েছিল ?
উঃ—হ্যাঁ, একটুখানির জন্য দেখা হয়েছিল।

১১। দাসমহাশয়ের শবদাহের সময় উপস্থিত ছিলেন ?
উঃ—না, তাঁর শবদাহের সময় উপস্থিত ছিলাম না।

১২। বিদেহী দূতগণ শবদাহ পর্যন্ত কি তথায় ছিলেন ?
উঃ—না, নিয়ে চলে গিয়েছিল।

১৩। কোথায় ?
উঃ—বিচার করতে।

১৪। দাসমহাশয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল ?
উঃ—না।

১৫। এখন আপনি কোন স্তরে ?
উঃ—সপ্তমেই আছি।

১৬। বেশ আনন্দে আছেন ত ?
উঃ—হ্যাঁ, বেশ আনন্দেই আছি।

১৭। এখন মধ্যে মধ্যে দাসমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় ?
উঃ—না, দেখা হয় না।

১৮। আমাদের সকলকে আপনার দেখতে ইচ্ছা হয় ?
উঃ—না।

১৯। আপনাদের সব থাকবার স্থান আছে ?
উঃ—হ্যাঁ, এই ঘরের মতই আছে। পূজা করতে যাচ্ছি, ডাকলি কেন ?

২০। তর্পণের সময় আমি কি করেছিলাম ?

উঃ—তাঁকে (দাসমহাশয়কে) জল দিয়েছিলি, আর কি করবি। তাঁর আত্মার ত কিছু খারাপ হয় নাই।

২১। বামুন দিদিকে নিয়ে আপনাকে আনবার জন্য চক্র করি, তিনি মিডিয়ম হয়েছেন দেখান। কিন্তু আপনার ভাষায় মনে হয় আপনি আসেন না, মিডিয়ম ঢং করছে। এ কি সত্য ?

উঃ—মিডিয়ম হয় নাই, আমি বামুন দিদির উপর আসি নাই। আমাকে এই ত ডেকেছিস্ এতদিন পরে।

২২। কাশীতে যখন ডেকেছিলাম এসেছিলেন বামুন দিদির উপর ?

উঃ—সামন্য ক্ষণের জন্য।

২৩। দাসমহাশয়ের শ্রাদ্ধের সময় এসেছিলেন ?

উঃ—আসিনি।

২৪। মোহিনী পৃথকভাবে শ্রাদ্ধাদি করায় মনে হয় ঠিক হয় নাই ?

উঃ—নিশ্চয়ই।

২৫। এক সঙ্গে দুই ভায়ে শ্রাদ্ধাদি না করায় আপনারা দুঃখিত হয়েছিলেন কি ?

উঃ—দুঃখিত হই নাই।

২৬। কতদিনে আপনার জন্ম হবে বলতে পারেন ?

উঃ—জন্ম বলা যায় না।

২৭। মায়ের কি খবর বলুন না ?

উঃ—সে সব কথা জানাবার হুকুম নাই।

২৮। ইহলোক থেকে পরলোকে গেলে শিশু অবস্থা হয় কিনা ? যেমন এখানে জন্মালে শিশু অবস্থা হয় ?

উঃ—হ্যাঁ প্রাপ্ত হয়। তবে ছয় মাস পর্য্যন্ত।

২৯। মা কোথায় জন্ম নিয়েছেন বল না দিদি ?

উঃ—বলবার যো নেই। মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিস নি।

৩০। বলই না দিদি ?

উঃ—বাজে প্রার্থনা করিস নি।

৩১। এখানে এসে মায়ের কি নাম হয়েছে ?

উঃ—সেও বলবার হুকুম নেই। তুই তার নাম করে তর্পণ করলে মরে যাবে।

৩২। তোমরও মা, আমারও মা, তুমি জানছ, আর আমার জানবার জন্য প্রাণ কত আকুল হয় ?

উঃ—মায়ের সঙ্গে আমার আর কি পরিচয় আছে ?

৩৩। মা এখনও বেঁচে আছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩৪। কত বৎসরের হয়েছে ?

উঃ—সাত বৎসরের।

৩৫। আমার সন্দেহ ছিল নিনু হয়ত মা, এখানে জন্মেছে ?

উঃ—না।

৩৬। নিনুর সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না।

৩৭। আচ্ছা বাবা কোথায় ?

উঃ—বাবা আমার চেয়ে উঁচুতে চলে গেছে।

৩৮। ভোঁদো কোথায় ?

উঃ—পঞ্চম স্তরে।

৩৯। দুর্গা কোথায় ?

উঃ—জন্ম নিয়েছে। কেন তোরা আমায় ডাকিস ? কেন মায়ার মধ্যে ডাকিস ?

৪০। কি জান দিদি! বিজয়ার প্রণাম করবার জন্য ডেকেছিলাম।

উঃ—কেন এমনি করলে হত না! না, আমায় আর ডাকিস না।

৪১। তুমি ত পুজা করতে যাচ্ছ বল্‌লে, ফুল এনেছ?

উঃ—না।

৪২। এখানকার একটা ফুল নিয়ে যাবে?

উঃ—তোদের ফুল আমার কোন কাজে লাগবে না। আমায় আর ডাকিস না।

তৎপরে প্রণাম করিয়া আত্মিককে বিদায় দেওয়া হয়।

লেখক সঃ চক্রপতি — চক্রপতি
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। — শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১৪-৩-৫০

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৯-৪৫ মিঃ
শেষ „ ১০-৩০ „
মিডিয়ম ভবানী দেবী
তৎপরে শিবানী দেবী

প্রথম ভবানী মিডিয়ম হয় কিন্তু মুখে বলিতে পারে না। তৎপরে ভবানীকে চক্র হইতে বাদ দিয়া তিনজনে চক্র করা হয় তাহাতে শিবানী মিডিয়ম হয়।

১। আপনি কে?

উঃ—সুধীর।

(চক্রপতি প্রণাম করিলে আত্মিক আশীর্ব্বাদ করেন।)

২। সন্তোষের কি ব্যারাম হয়েছে দিদি?

উঃ—সন্তোষ চিন্তা করে, চিন্তা না গেলে ভাল হবে না, কিছু অসুখ নাই।

৩। কিছু মিষ্টি খান, (বাড়ী থেকে বলিল রসগোল্লা নাই) আম খাবেন ?

উঃ—খাব ; কেন ডাকিস ?

৪। মেজদাদার খবর জানেন ?

উঃ—সে মারা গেছে, বড় কষ্টেমরেছে, তার সেবা হয় নাই।

৫। এখন আপনি কোন স্তরে ?

উঃ—সপ্তম স্তরে।

৬। দাসমহাশয়ের সহিত দেখা হয় ?

উঃ—না, দেখা হয় না।

৭। মা কোন জাতিতে জন্মেছেন ?

উঃ—ব্রাহ্মণ জাতে জন্মেছে।

৮। কোথায় জন্মেছেন ?

উঃ—তা আমি বলব না।

৯। হিন্দুস্থানীর ঘরে না বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছেন ?

উঃ—বাঙ্গালীর ঘরে জন্মেছেন।

১০। আমাদের দেশেই জন্মেছেন ?

উঃ—হ্যাঁ, দেশেই। অত জিজ্ঞাসা করিস কেন ? ওই ত তোর দোষ।

১১। আমাদের গ্রামের নিকটে না দূরে ?

উঃ—আমাদের বোলবার যো নাই।

১২। দাসমহাশয়ের কাল বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, জানেন ?

উঃ—তা আমি জানি, মনোমোহন কলকাতায় গেছে ত। দাসমহাশয় জন্মে গেছে তা তুই জানিস ?

১৩। দাসমহাশয় কত দিনের হইয়াছে ?

উঃ—দু'মাস হল জন্মিয়াছে।

১৪। দু'মাসের, গর্ভে না বাহিরে ?

উঃ—বাহিরে।

১৫। ছেলেটার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত পা কিরূপ হইয়াছে ?
উঃ—ভাল হইয়াছে, রং ফর্সা হইয়াছে। মনে করিসনি যেন তোদের ঘরে জন্মিয়াছে।

১৬। বল না দিদি মা যে জন্মেছে, মায়ের বাবার নাম কি ?
উঃ—মায়ের বাবার নাম বলবার যো নেই।

১৭। দিদি তুমি আমটা প্রসাদ করে দাও, সন্তোষ খেয়ে ভাল হবে তো ?
উঃ—সন্তোষের ভক্তি থাকলে ত,আম-টাম ভাল লাগে না।
(আমরাই না হয় খাব আপনি প্রসাদ করে দিন)

১৮। আমটা মিষ্টি কি দিদি ?
উঃ—মিষ্টি কিন্তু ভাল লাগে না।

১৯। খেজুরে গুড় হলে, ভাল হত না দিদি ?
উঃ—হুঁ, (সামান্য হাসিল) কেন ডাকিস ?

২০। আপনার পূজা ত হয়ে গেছে ?
উঃ—হ্যাঁ।

২১। মা আমাদের গ্রাম থেকে কত দূরে জন্মেছেন ?
উঃ—বেশী দূরে নয়। অত করে জিজ্ঞাসা করিস কেন ? সে ত রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী। তুই যাবি কি করে ; তোকে কি তারা ঢুক্‌তে দেবে ?

২২। মুখার্জ্জীদের না চাটুজ্জেদের না অন্য কোন বাড়ীতে জন্মেছে বল না দিদি ?
উঃ—বললে আমাকে শাস্তি দেবে। তুই বুঝবি কি ; মনে করেছিস গিয়ে দেখা করবি ?

২৩। দাসমহাশয় যে জন্মেছেন তার পা ভাঙ্গা ?
উঃ—তোরা মনে কচ্ছিস যে এখানে জন্মেছে। না রে ভাল হয়ে জন্মেছে।

২৪। মা যে জন্মেছে, তারা কয় ভাই কয় বোন ?
উঃ—পাঁচ ছেলের পর একটি মেয়ে।

২৫। তার বাবার নাম কি বলুন না ?
উঃ—না বলবার যো নাই। কেন অমন করে জিজ্ঞাসা করিস ?

২৬। মায়ের যে বাবা তার বয়স কত ?
উঃ—বললুম জিজ্ঞাসা করিস নি, ওই:তো তোর দোষ।

২৭। সন্তোষ প্রণাম করিলে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—'সন্তোষ চিন্তা দূর কর, চিন্তা দূর কর।

২৮। মদন যখন প্রণাম করিল ; আত্মক মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল ও দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল, কেন আমাকে ডাকিস ?

২৯। মেজদার সঙ্গে দেখা হয় দিদি ?
উঃ—না, দেখা হয় না।

৩০। নামটা কি বলে দাও না, সে তোমারও মা, আমারও মা !
উঃ—সে আমার মা নয়। (ক্রোধের সুর)

৩১। তুমি আমার দিদি হও আর মায়ের খবরটা বলে দিচ্ছ না ?
উঃ—কেন আমাকে ডাকিস ? ডাকিস কেন ?

৩২। ভবানী ওরকম ভাবে বসে আছে, ওর উপর কোন আত্মিক এসেছে নাকি ?
উঃ—না, ভবানীর ফিট্ হয়েছে।

৩৩। এখন মেজদা পরলোকে কেমন আছেন ?
উঃ—আমি তাকে সেই সময় দেখেছি, আর দেখি•নাই। বড় কষ্টে মরেছে, সেবা হয় নাই। (হাসপাতালে মারা যান নিকটে কোন আত্মীয় ছিল না)।

৩৪। পুরীতে আমি যাকে 'মা' বলে শবদাহ করেছিলাম, তাঁর খবর কিছু বলতে পারেন?

উঃ—ওখানে কেউ কারুর সঙ্গে পরিচিত নই। আমি বলতে পারব না।

৩৫। মনোমোহনের ছেলের ডান পাটা যে বাঁকা হয়েছে তা কি চিকিৎসা করলে ভাল হবে?

উঃ—যেখানে জন্মাত আর মরত তারা যাবার সময় পা বাঁকা করে দিয়েছে, ও পা ঠিক করা শক্ত।

৩৬। দুর্গা কি জন্মে গেছে?

উঃ—হ্যাঁ, দুর্গা জন্মে গেছে।

৩৭। তুমি মায়ের বয়স একবার বল ৭ বৎসর, একবার ৪ বৎসর বল, তোমাদের হিসাবের কি ঠিক নাই?

উঃ—হ্যাঁ হিসাব ঠিক আছে। আমাকে একশবারই রাগাস কেন? তুই খুঁজবি এই মা কোথায় আর মা কোথায়। ওখানে দেখছিস্ কে দুজন দাঁড়িয়ে আছে। আমায় মারবে বলে। (যদি কিছু বলি) ঐ দেখ তোর পিছনে দুজন দাঁড়িয়ে আছে। (চক্রপতি পিছন ফিরিয়া দেখিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না)।

৩৮। কই দেখতে পাচ্ছি না ত?

(চক্রপতি বলিলেন স্থূল চোখ দিয়া সূক্ষ্ম জিনিস দেখা যায় না)।

৩৯। ওঁরা যে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা স্ত্রী আত্মিক না পুরুষ আত্মিক?

উঃ—না স্ত্রী আত্মিক।

৪০। দিদি একটা শ্যামা সঙ্গীত শুনবেন?

উঃ—হ্যাঁ।

(প্রথম গানটি "হাতে কালি মা মুখে কালি"। দ্বিতীয় গানটি "কে পরাল মা মুণ্ডমালা"। এই গান দুইটি শুনাইবার পর, চক্রপতি আত্মিককে লক্ষ্য করিয়া নমস্কার করিলেন)।

৪১। একটি কথা বলব দিদি রাগ করবে না ত ?
উঃ—কি কথা বল না।

৪২। তুমি একবার জব্বলপুর থেকে এসে বল চিত্রার মেয়ে কেমন আছে ? (কিছুক্ষণ স্থির থাকিবার পর)।
উঃ—সিপ্রা ভাল আছে। তৎপরে সকলে নমস্কার করিতে লাগিল ; তখন আত্মিক বলিলেন নমস্কার করিস কেন, থাক্ থাক্ বলিয়া চোখে জল আসিল। তৎপশ্চাৎ আত্মিককে বিদায় দেওয়া হইল।

লেখক সঃ চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

শ্যামা সঙ্গীত দুটি নিম্নে দিতেছি।

H. M. V. No 27265 (কাজি নজরুল)।

হাতে কালি মুখে কালি
আমার কালিমাখা মুখ দেখে মা,
পাড়ার লোকে হাসে খালি
মোর লেখাপড়া হল না মা
আমি "ম" দেখতেই দেখি শ্যামা
আমি 'ক' দেখলেই কালি বলে নাচি দিয়ে করতালি।
কাল আঁখ দেখে মা ধারাপাতে
ধারার নামে আখি পাতে
আমার বর্ণ পরিচয় হ'ল না মা
তোর বর্ণ বিনা কালী।
জানি ছিস বোনের পাতায়, খাবার জলে আকাশ-বাতায়
আমি সে লেখাতো পড়তে পারি
মূর্খ বলে দিকনা গালি
লোকে মূর্খ বলে দিক না গালি।

H. M. V. No 7302 (কাজি নজরুল)।

কে পরাল মুণ্ডমালা আমার শ্যামা মায়ের গলে
সহস্র দল জীবন কমল দোলে
দোলেরে যার চরণ তলে।
কে বলে মোর মাকে কালো
মায়ের হাসি দিনের আলো
মায়ের আমার গায়ের জ্যোতি
গগন, পবন, জলে, স্থলে।
শিবের বুকে চরণ যাহার কেশব যারে পায় না ধ্যানে
শব নিয়ে এসে রয় শ্মশানে
কে জানে কোন অভিমানে
কীর্ত্তিরে মা হয় আবরী
সেই মা নাকি দিগম্বরী,
তারে অসুরে কয় ভয়ঙ্করী
ভক্ত তাই অভয়া বলে।

স্থান ও তারিখ	রাণীদেবী	সময় ও মিডিয়ম
বসন্তকুমার দাঁয়ের বাড়ী হরিপদ দাঁ রোড পোঃ—পুরুলিয়া, পুরুলিয়া ইং ৭-১-৫১	সনৎ দাঁ ২২ অভয় চট্টো ফনিভূষণ	আরম্ভ সন্ধ্যা ৭-৩৫ মিঃ শেষ „ ৮-৫৫ মিঃ মিডিয়ম সনৎকুমার দাঁ (সাকচি কোর্টের উকিল জামসেদপুর ইনি একজন ভাল গায়ক ইনিই চক্রে গান করেন।)

১। আপনি কে?
উঃ—অলক।

২। কতদিন পূর্ব্বে মারা যান?
উঃ—অনেক দিন।

৩। কতক্ষণ এসেছেন ?
উঃ—এই এলাম।

৪। বাড়ী কোথায় ?
উঃ—জানি না।

৫। আপনি কি জাতি ছিলেন, ব্রাহ্মণ কি ?
উঃ—জানি না।

৬। কিসে মারা যান ?
উঃ—পড়ে মারা যাই।

৭। কোথা থেকে পড়ে যান, বাড়ী থেকে ?
উঃ—অনেক উঁচু থেকে।

৮। মৃত্যুকালে কত বয়স ছিল ?
উঃ—৩০ বৎসর।

৯। কোথাকার লোক আপনি ?
উঃ—অঁ—অঁ

১০। বলতে কষ্ট হচ্ছে কি ?
উঃ—হ্যাঁ।

১১। লিখে বলবেন কি ?
উঃ—ভুলে গেছি।

১২। কোন্ স্তরে কোথায় আছেন ?
উঃ—অন্ধকারে, অসহায়।

১৩। আলো জ্বালাব কি ?
উঃ—অঁ—অঁ, না-না।

১৪। বসন্তবাবু কোথায় ? (ইহাকেই চক্রে আহ্বান করা হয়)
উঃ—জানি না।

১৫। আপনি কেন এ চক্রে এলেন বলুন তো ?
উঃ—গান শুনে।

১৬। বাড়ী কোথায় মনে নাই ?

উঃ—(অনেকক্ষণ পরে) চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া জেলা।

১৭। ছেলে আছে কি ?

উঃ—না।

১৮। বিবাহ হয়েছিল ?

উঃ—না।

১৯। কি করে পড়ে গেলেন ?

উঃ—জল তোলবার সময়।

২০। চাকরি করতেন কি ?

উঃ—না। বাগান—কুয়াতে পড়ে মারা যাই। তৎপরে চক্রপতি নমস্কার দেন। আত্মিকও প্রতি-নমস্কার দিবার জন্য হাত তুলিবার চেষ্টা করেন, সামান্য উঠে। অল্প সময়ের মধ্যে মিডিয়মের জ্ঞান ফিরিয়া আসে। আত্মিক মিডিয়মের মধ্যে আসিবার কালে কষ্ট হইয়াছিল।

লেখক
শ্রীআনন্দকুমার দাঁ।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
বসন্তকুমার দাঁয়ের বাড়ী
হরিপদ দাঁ রোড
পোঃ—পুরুলিয়া, পুরুলিয়া
ইং ৮-১-৫১

ফণিভূষণ
মদন তেওয়ারী ২৩ রানীদেবী
অভয় চট্টো

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮-২৪ মিঃ
শেষ „ ১০-২০ মিঃ
মিডিয়ম মদনগোপাল তেওয়ারী

(মুখে বলিতে পারেন না লিখিয়া দেখান)

প্রথম আত্মিককে নমস্কার জানান হয়।

১। আপনার নাম কি ?

উঃ—রামপ্রসাদ।

২। বাড়ী কোথায় ?

উঃ—পুরী।

৩। আপনি কোন্ জাতি ?

উঃ—বাঙ্গালি।

৪। কত দিন পূর্বে মারা যান ?

উঃ—১৩ বৎসর।

৫। কিসে মারা যান ?

উঃ—যোগে।

৬। এখন আপনি কোন স্তরে ?

উঃ—স্ব লোকে।

৭। সেখানে কিরূপ আছেন ?

উঃ—উদ্বেগ শূন্য। বিশ্রাম অনুভব করিতেছি। তৎপরে নমস্কার দিয়া বিদায় দেওয়া হয়। আত্মিককে বিদায় দিলে অল্পক্ষণ মধ্যে জ্ঞান ফিরিয়া আসে। তখন মিডিয়ম আপনার নাম বলিতে সক্ষম হন। উচ্চ স্তরের আত্মিক আসায়, মিডিয়মের আবেশকালে কোন কষ্ট হয় না।

লেখক
শ্রীআনন্দ কুমার দাঁ।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ২২-১১-৫১

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৯টা
শেষ ,, ১০-১০
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। আপনি কে ?

উঃ—তোর দিদি।

২। আপনাকে প্রণাম করছি ?

উঃ—থাক্ থাক্। তুই খালি ডাকিস কেন বল্ ত। তোকে বারণ করি না।

৩। মনোমোহনের তর্পণের জল পেয়েছিলে কি ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪। আর কে কে জল দিয়াছিল ?
উঃ—তুই।

৫। আর কেহ জল দিয়াছিল ?
উঃ—আর কে দেবে। (মুখ মুচকাইল)

৬। ভোঁদো এখন কোন্ স্তরে আছে ?
উঃ—জানি না।

৭। দিদি আপনি কোন্ স্তরে ?
উঃ—অষ্টম স্তরে।

৮। অষ্টম স্তরের নাম কি ?
উঃ—ও একটা দ্বীপ। তুই খালি খালি ও কথা জিজ্ঞাসা করিস কেন বল ত ?

৯। পরলোকবাসী আত্মিকদের আহ্বান করবার সহজ উপায় কি ?
উঃ—ঠিকভাবে ডাকলেই হয়। এসব কথা জিজ্ঞাসা করিস কেন ?

১০। তুমি দিদি হও সেই জন্যই তো তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এতে অপরাধ কি ?
উঃ—আমি আর তোর বোন নেই।

১১। ইহলোকে তো তুমি আমার দিদি ছিলে ?
উঃ—আর তোর দিদি নই।

১২। তোমাদের ওখান থেকে পৃথিবীটা কেমন দেখায়, উজ্জ্বল তারার মত দেখায় কি ?
উঃ—একটা বলের মত দেখায়।

১৩। একটু সন্দেশ খাবে দিদি ?
উঃ—খেতে ইচ্ছে নেই।

১৪। মনোমোহন তোমার জন্য একটু সন্দেশ পাঠইয়াছে ?

উঃ—তবে দে। এতে একটা আতাও আছে; "আমি আতা ত খেয়েছি"। কে দিয়েছে ? "কেন ছোট বৌ (মদনের মা) দিয়েছে"। টেবিলের উপর ডিসটি দেওয়া হইল। মুখ নাড়িতে নাড়িতে (খাবার ভঙ্গিতে) বলিলেন "এ—ত নূতন গুড়ের সন্দেশ নয়। আর আমি খাব না; কি সন্দেশ খাওয়ালি"। সরিয়ে দিই ?

উঃ—হ্যাঁ। এসব বিরক্ত করিস কেন ?

১৫। আচ্ছা দিদি আমাদের এখানে যেমন দেবদেবীর পূজা হয়, তোমাদের সেখানে এরূপ কিছু আছে কি ?

উঃ—আমরাই ত দেবদেবী (মর্ম্মার্থ—পরলোকে নিজ নিজ আত্মার পূজা হয়)।

১৬। তোমরা ওখানে কেমন জায়গায় থাক ?

উঃ—একটা নাট মন্দিরের মত আছে, সেখানে সব আমরা থাকি।

১৭। সেখানে আলো আছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৮। আচ্ছা দিদি আমরা এখানে একজনের কথা, একজনের কাছে লাগান ভাঙ্গান করি, তোমাদের ওখানে এ রকম কিছু আছে কি ?

উঃ—কার কথা কার কাছে বলবার জো নেই, সাথে সাথে সব থাকে। তোকে কত বলব।

১৯। আপনার সঙ্গে কে কে এসেছে ?

উঃ—দুই জন।

২০। তারা কোথায় ?

উঃ—তোর সামনে দেখ না।

২১। আমার সামনে না পিছনে ?

উঃ—সামনে। (বাঁ দিকে মিডিয়ম হাত দিয়া দেখাইল)।

২২। দাসমহাশয় জন্মেছেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

২৩। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না।

২৪। মা কোথায় জন্মেছেন ?

উঃ—ঐ তো নয়।

২৫। ৫ ভায়ের এক বোন হয়ে জন্মেছেন না দিদি ?

উঃ—হ্যাঁ। ভাল জায়গায় জন্মেছেন! ব্রাহ্মণের বাড়ীতে।

২৬। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ?

উঃ—হ্যাঁ।

২৭। আমাদের যাদববাটীর বাড়ী থেকে কত দূরে ?

উঃ—বেশী দূরে নয়।

তবু কত দূরে ?

উঃ—ঐ তো তোর দোষ। বলবার জো নেই। কি সন্দেশ খাওয়ালি ; (মুখ মুচ্‌কাইলেন, বিষয়ান্তর করিবার উদ্দেশে)।

২৮। এবার তোমায় ডেকে গুড়ের সন্দেশ খাওয়াব ?

উঃ—আমায় আর ডাকিস না! আমি বললুম বলে। তোরা অমনই দিলেই পাব।

২৯। (বারীণ প্রণাম করিল) কে প্রণাম করছে বলত দিদি ?

উঃ—কে—আর নয়, না কে (মিডিয়ম মাথা ঘুরাইয়া বীরেনের দিকে দেখিল এবং বলিল) বারীণ। কত বড়টা হয়েছিস।

৩০। অরবিন্দের প্রণাম। "এই ত অর। ও কে? ছোট বৌ কেশবের মা, ওর অমন অবস্থা কবে হল? আমায় কেন আনিস, এসব জঞ্জালে কেন আনিস? (সকলে প্রণাম করিতে আসে) যা বাবা, কেন সব প্রণাম করা।"

৩১। আচ্ছা দিদি এখানে যেমন গ্রীষ্ম, বর্ষা হয়, আপনাদের সেখানে তেমন কিছু আছে কি?

উঃ—তোর অত জানবার কি দরকার। সেখানে গ্রীষ্ম, বর্ষা বলে কিছুই নেই। (এমন সময় কেশবের মা প্রণাম করিতে যায়) কি ছোট বৌ, তুমি পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

৩২। ওখানে ঈর্ষা ভাব আছে?

উঃ—ঈর্ষা করলে নেমে যাব। নেমে যাও করবে।

৩৩। ভোঁদোর সঙ্গে দেখা হয়?

উঃ--না।

৩৪। নিম্ন স্তরে গিয়া ত আপনারা উপদেশ দিতে পারেন?

উঃ—আমরা কেন উপদেশ দিব; যে যার গুরু আছে।

৩৫। তোমাদের গুরু কি মেয়েছেলে?

উঃ—হ্যাঁ, মেয়েছেলে গুরু। তোদের যেমন পাঠশালা নয়, আমাদেরও তেমন।

৩৬। আপনারা নিদ্রা যান?

উঃ—নিজের নিজের ইচ্ছার উপর।

৩৭। কাপড় পরার মত আপনাদের কিছু আছে কি?

উঃ—তোরা দেখবি কাপড় পরার মত; কিন্তু কাপড় পরা নয়।

৩৮। অনুভা যখন মারা যায়, অবোল অবস্থায় আমি তাকে নারায়ণ নাম করতে বলেছিলাম। তার আত্মিক এসে বললে নারায়ণ নাম মনে মনে করেছিল ?
উঃ—হ্যাঁ, মৃত্যুকালেও কান ঠিক থাকে।

৩৯। আপনার মৃত্যুকালে কে নিতে এসেছিল ?
উঃ – নাম ভুলে গেছি, অন্য আর একজন এসেছিল সকলে তাঁকে ওখানে গুরুদেব বলত।

৪০। মহাত্মা গান্ধী যখন মারা যান তখন কত আত্মিক দেখতে এসেছিল ?
উঃ—বহু এসেছিল।

৪১। আপনিও গিয়াছিলেন কি ?
উঃ—আমরাও গিয়াছিলাম।

৪২। কি করে মহাত্মাজীর আত্মিককে নিয়ে গেল ?
উঃ—তাঁকে রথে করে নিয়ে গেল। (দুই জন আত্মিকের একই কথা)।

৪৩। রথে আর কেহ ছিলেন ?
উঃ—রথে একজন রাজা ছিল, রথে আরও দুই জন ছিল। তারা বাজনা করতে করতে নিয়ে গেল।

৪৪। আপনারা কি করলেন ?
উঃ—আমাদের জোড় হাত করতে বললে।

৪৫। মহাত্মাজী কোথায় গেলেন বলতে পারেন ?
উঃ—তার পর কোথায় গেলেন জানিনা।

৪৬। সুভাষবাবু কোথায় আছেন বলতে পারেন ?
উঃ—আমি জানি না।

৪৭। আপনি মিডিয়মের শরীরের কোথায় বসে আছেন ?
উঃ—বুকে, ডান দিকে। (চক্রপতি হাত দিয়ে দেখাইল, আত্মিক বলিল আরও নিচে)।

৪৮। মনোমোহনের ছেলে দীবেন্দ্রনাথের পা হবে কি না ?
উঃ—ঐ তো তোর দোষ। বারীনকেও বলেছিলাম কিছু করতে হবে না, এখন ত বেশ মোটা হয়েছে। ওকেও কিছু করতে হবে না। তবে পা সোজা হবে না।

৪৯। মেজদাদা কোথায় ?
উঃ—কি করে জানব। মৃত্যুকালে তার সঙ্গে দেখা হয় নি ; সে আমাকে মরবার সময় ডাকেনি। সে (দাস মহাশয়) আমাকে ডেকেছে, মরবার সময় তাই আমি এসেছিলাম। ভোঁদো আমাকে ডেকেছিল, আমি এসেছিলাম। ডাকলেই আসতে হবে।

৫০। দিদি তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, শরীর ধরতে পার ?
উঃ—আমি কি নিম্নস্তরে যে শরীর ধরতে পারব ?

চক্রপতি মিডিয়মের পায়ে হাত দিয়া দেখিতেছিল যে, মিডিয়মের পা কতখানি ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে ; আত্মিক বলিল "পায়ে কেন হাত দিচ্ছিস্" ? তখন চক্রপতি বলিল শিবানীর পা কতখানি ঠাণ্ডা হইয়াছে দেখছি।

আচ্ছা দিদি আমি ছেলেবেলায় তোমার মাই খেয়েছি আর তুমি আমাকে ওখানকার কথা কিছু বলতে চাইছ না ? "হ্যাঁ তুই মাই খেয়েছিলি, তোর এখনও মনে আছে যে রে"।

৫১। দিদি আর তুই একটি প্রশ্ন করব ?
উঃ—আর কেন বকাচ্ছিস ? ঐ ত তোর দোষ।

৫২। যমালয় বলে কিছু আছে কি ?
উঃ—যমের বাড়ী মানে সেখানে খালি মারে আর কি। তবে কি সেখানে গুয়ে ডোবাবে।

৫৩। যম বলে কেহ আছে কি ?
উঃ—হবে ওদেরই মধ্যে একজন। ওখানে কি গেছি আমি ?

৫৪। আচ্ছা দিদি তোমার সঙ্গে আজ এখানে যারা এসেছেন তারা কত বছর ওখানে আছেন?

উঃ—কেহ ১০০ বছর, কেহ ২০০ বছর; ওদের আর জন্ম হবে না মনে হয়।

৫৫। ওখানে ৫০০, ৭০০ বছর কেহ আছেন নাকি?

উঃ—হ্যাঁ। আর দেরী করিস না, সেখানে গেলে জিজ্ঞাসা করবে কোথায় ছিলে এতক্ষণ, কি করছিলে?

আচ্ছা যাও দিদি, প্রণাম করছি। সেকেণ্ডের মধ্যে আত্মিক চলিয়া গেল। তৎপরে মিডিয়মের সংজ্ঞা ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিল।

লেখক সঃ চক্রপতি	চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ		সময় ও মিডিয়ম
বসন্তকুমার দাঁয়ের বৈঠকখানা হরিপদ দাঁ রোড, পুরুলিয়া ইং ২৬-১-৫২	ফনিভূষণ ৬ জয়ন্ত দা ২৫ রাণীদেবী মদন তেওয়ারী	আরম্ভ সন্ধ্যা ৭টা শেষ ,, ৭-৪৫ মিঃ মিডিয়ম—জয়ন্ত দাঁ

আত্মিক প্রবেশ করিবার সময়, মিডিয়ম এরূপ অস্থির হন যে, চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন মিডিয়মকে সাবধানে ধরিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দেওয়া হয়।

১। আপনি কে?

উঃ—বসন্ত। (লেখকের পিতা)

২। আপনি কাল এসেছিলেন?

উঃ—হ্যাঁ।

৩। কাহার ভিতর এলেন না কেন?

উঃ—অপরিষ্কার।

৪। কে অপরিষ্কার ছিল ?

উঃ—ডাক্তার।

৫। আপনি কিরূপ অবস্থায় আছেন ?

উঃ—অন্ধকারে।

৬। ইন্‌সিওরেন্সের কাগজ পাওয়া যাচ্ছিল না, কোথায় ছিল ?

উঃ—ফাইলে, অফিসে।

৭। কাগজগুলো আনলে কে ?

উঃ—আমি।

৮। রাখলেন কোথায় ?

উঃ—টেবিলে। (সত্যই বৈঠকখানার টেবিলের উপর পাওয়া যায়)।

৯। রাণীকে আপনি ডেকেছিলেন মৃত্যু সময়ে ?

উঃ—না।

১০। চিনুর বিবাহে আপনি সুখী কি ?

উঃ—সুখী।

১১। আপনার প্রিয় স্তোত্রটি আমি পাঠ করলাম শুনেছেন কি ?

উঃ—হ্যাঁ।

১২। আপনাকে এখন কি করতে হয় ?

উঃ—জপ করতে হয়।

১৩। আলো বাইরে আনব ?

উঃ—না-না। (আলো বাহিরে আনিতে আপত্তি জানায়)। মিডিয়ম বড়ই চঞ্চল হয়, অস্থিরতা প্রকাশ করার জন্য আত্মিককে শীঘ্র বিদায় দেওয়া হয়।

১৪। এ সংসারের জন্য আপনার মন খারাপ হয় কি ?
উঃ—না।

বিদায় দেওয়ার পূর্ব্বে চক্রপতি আত্মিককে নমস্কার করিলে, তিনিও মিডিয়মের সাহায্যে হাত তুলিলেন। তৎপরে মিডিয়মকে প্রকৃতিস্থ করা হয়।

অদ্যকার চক্র দেখিবার জন্য বহু দর্শক ছিলেন। পুরুলিয়া J. K. কলেজের কয়েকজন প্রফেসর, ডাক্তার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

লেখক	চক্রপতি
শ্রীআনন্দকুমার দাঁ।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১৩-১০-৫৩

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৭-৪০ মিঃ
শেষ ,, ৮-৩০ মিঃ
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। আলো জ্বালবো ? আপনি কে বলুন ? আপনি কে ?
উঃ—কেন ডাকিস।

২। কে ? যেন দিদির মত গলা পাচ্ছি।
উঃ—হ্যাঁ, সুধীর। কেন ডাকিস ঠিক পুজোর সময়।

৩। আলো জ্বালব দিদি ?
উঃ—হ্যাঁ, জ্বাল।

৪। আচ্ছা দিদি আপনি এখন কোন স্তরে আছেন ?
উঃ—অষ্টম স্তরে।

৫। সেখানটা খুব আলো ?
উঃ—হ্যাঁ।

৬। গুরু আছেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

৭। একটা নূতন কথা শুন দিদি, ইরার বিয়ে হয়ে গেছে জান ?
উঃ—হ্যাঁ।

৮। আশীর্ব্বাদ করেছ ?
উঃ—হ্যাঁ।

৯। আচ্ছা জামাই কোথা বল ত ?
উঃ—এই ত তোমার পাশে বসে আছে।

১০। জামাই (সনাতন) প্রণাম করিল। আত্মিক মিডিয়মের সাহায্যে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

১১। দিদি জান, বড়দিদি মারা গেছেন।···মিডিয়মের চক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। আত্মক বলিলেন, কেন ডাকিস।

১২। বড়দিদি মারা গেছেন জান ?
উঃ—হ্যাঁ।

১৩। বড়দিদির সঙ্গে দেখা হয় ?
উঃ—না।

১৪। আচ্ছা দিদি আমার ডবোর আশ্রম বাড়ীতে রাত্রি প্রায় ১১টা ১২টার সময় কে যেন খুট্ খাট্ শব্দ করছিল। আমার মনে হল কোন আত্মিক এসে এই সব করছেন। কেহ কি এসেছিলেন ? তুমি জান দিদি ?
উঃ—আমি গিয়েছিলাম।

১৫। তুমি আমাকে দেখতে গিয়েছিলে ?
উঃ—হ্যাঁ। দিদি মারা গেছে তোকে তা বল্‌তে গিয়েছিলুম। তুই ত জান্‌তিস্ না।

১৬। মেজদাদার সঙ্গে দেখা হয় ?
উঃ—না। অত কথা তোর কেন বল্‌ত।

১৭। তাতে কি হয়েছে ?
উঃ—না ওসব বল্‌ব না।

১৮। মেজদা কোন স্তরে আছেন ?
উঃ—বলতে পারি না। কেন ডাকিস বল্‌তো।

১৯। মা, কত বড় হয়েছে দিদি ?
উঃ—আবার।
"তাতে কি হয়েছে" ?
উঃ—না।

২০। সেবারে ত কত কথা বলে গেলেন ?
উঃ—আমি বলব না। তুই খালি জিজ্ঞাসা করিস কেন বল তো, জন্মালেই বা তোর কি ?

২১। বল না দিদি ?
উঃ—না, বলবার জো নেই ?

২২। হ্যাঁ, তোমার আবার বলবার জো নেই ?
উঃ—বলবার জো নেই ভাই, বলব না।

২৩। মা কত বড়টা হয়েছে দিদি ?
উঃ—(নীরব)···

২৪। কি বলছি দিদি ?
উঃ—একশোবারি তোর ওই কথা। তাহলে আমি এখুনি চলে যাব।—কেন জিজ্ঞাসা করিস বল তো ?

২৫। দিদি আমি একটা পরলোক সম্বন্ধে বই লিখছি, তাতে আমি লিখতে চাই যে, মা গত জন্মে এই ছিলেন আর এই পরজন্মে, এই হয়েছেন। তাতে তুমি যদি না কিছু বল তো কি করে হবে ?
উঃ—না কিছু বলব না।

২৬। আমার ডবোর আশ্রম বাড়ীটি কেমন হয়েছে ?
উঃ—বেশ ভাল।

২৭। আমি একা থাকি, আশ্রমটি বেশ নিরালা নয় দিদি ?

উঃ—হ্যাঁ। তুই দেখতে পেয়েছিলি আমাকে ? (চক্রপতি) এ চোক্ষে কি আর পরলোকবাসী, বিশেষতঃ উচ্চস্তরের আত্মিককে দেখবার সে শক্তি আছে, তা হলে ত আপদ চুকে যেত।

২৮। আচ্ছা শুন, সেই গভীর রাত্রে যখন আমি জিজ্ঞাসা করি আপনি কে ? তখন খুট্ খাট্‌ও নেই একেবারে নীরব, কোন উত্তর পেলাম না।

উঃ—আমি তো বল্‌লুম।

২৯। আমি শুনতে পাইনি। এই স্থূল কানে কি আর আপনাদের কথা শুনা যায়। অন্য লোক হলে ভয় খেয়ে যেত, আমি ছিলাম তাই রক্ষে !

উঃ—আমি তো ভয় দেখাইনি।

৩০। আচ্ছা দিদি মা কতদূর লেখাপড়া শিখেছে ?

উঃ—তোর অত দরকার কেন বল্ তো ?

৩১। সঙ্গে কেহ আছে নাকি ?

উঃ—আছে।

৩২। বড়দিদিকে কে নিয়ে গেল ?

উঃ—লোকে। (মিডিয়মের চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল) তার খুব শাস্তি হয়েছে।

৩৩। আচ্ছা তর্পণের জল বড়দিদি পেয়েছে ?

উঃ—উঁ-হুঁ। তার আত্মার কিছু করে দিস।

৩৪। কি করব ? গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসব ?

উঃ—আমরা সবাই তর্পণের জল খাচ্ছি, সে খেতে পাচ্ছে না।

৩৫। কেন পায় না দিদি ?

উঃ—খাবার জো নেই।

৩৬। কিছু বাধা আছে নিশ্চয়ই ?
উঃ—হ্যাঁ

৩৭। নিম্নস্তরের আত্মারা খেতে পারে না বুঝি ?
উঃ—না।

৩৮। আচ্ছা দিদি কোন্ স্তর থেকে জল পায় ?
উঃ—পঞ্চম স্তর থেকে।

৩৯। মনোমোহন তর্পণ করেছে জল পেয়েছেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪০। মোহিনী তর্পণ করেছে ?
উঃ—না।

৪১। আর কে করেছে ?
উঃ—তুই।

৪২। দাসমহাশয় জন্মে গেছেন, আমরা তর্পণ করবার দিনে যে জল দিই তাতে কি হয় ?
উঃ—শুনেছি তৃপ্তি পায়।

৪৩। ভোঁদো কোথায় ?
উঃ—কি জানি।

৪৪। দেখা হয় ?
উঃ—না।

৪৫। অনাথ কোথায় ?
উঃ—জানি না।

৪৬। তার সঙ্গে দেখা হয় ? তোমরা তো নিম্নস্তরের আত্মিককে দেখতে পাও ?
উঃ—তোর অত দরকার কেন ?

৪৭। আচ্ছা দিদি গয়ায় পিণ্ডি দিলে চলবে ?

উঃ—গয়ায় দিলে হবে না।

মনোমোহন জিজ্ঞাসা করিল, তবে কোথায় দিলে হবে ?

উঃ—প্রেতশীলায়।

৪৮। সেজদার উঠতে বসতে তো কাঁপুনি আসছে, এবার ত সেজদার নম্বর ?

উঃ—হ্যাঁ।

৪৯। আচ্ছা দিদি আগে সেজদা মরবে না আমি মরব ?

উঃ—কেন ডাকিস ? তোর কাজ নেই ?

৫০। দিদি আমি একটা বই লিখছি ; তাতে কিছু মসলার দরকার। তাতে কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে হবে ?

উঃ—কি সাহায্য করব বল ?

ভূমিকাতে আমি লিখব, সেই মায়ের ভূত ছাড়ানোর কথা, সেই যে, গাছের ডাল ভাঙ্গার কথা, মনে আছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

(আত্মিক চক্রপতিকে রাগতভাবে প্রতিবাদ করিল, 'ভূত কিরা' ?)

ভূত মানে আর কি পরলোকবাসী।

উঃ—হ্যাঁ। তুমিও তো একদিন ভূত বল্‌তে আজই না হয় পরলোকবাসী হয়েছ।

৫১। আমার বই লেখার সাহায্য করবে তো ?

উঃ—কি করবো বল না।

৫২। কিছু না, আমি যখন বই লিখ্‌ব তখন তোমাকে আমার মাথার মধ্যে ঢুকতে হবে, ঢুকে আমার লেখার যোগান্ দিতে হবে।

উঃ—আচ্ছা ঢুকবো।

৫৩। হাতে হাত দিয়েছি শপথ করে বলো ?

উঃ—হ্যাঁ রে।

৫৪। দিদি একটু সন্দেশ খাবে ?

উঃ—না।

একটু খাও না ?

উঃ—না।

একটুখানি খাও ?

উঃ—না।

আবার না, একটু খাও ?

উঃ—না।

ইরা নিয়ে আসছে, না খেলে মনে আবার দুঃখ করবে ?

উঃ—না।

৫৫। পদ্মার গান শুনবে ?

উঃ—হ্যাঁ। (পদ্মা গান ধরিল "মুক্ত কর মা মুক্তকেশী"।)

৫৬। গান শুন্‌লে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৫৭। নাও একটু সন্দেশ আর জল খাও ?

উঃ—জল খাব না। আত্মিক ঘ্রাণশক্তি দ্বারা সন্দেশ খাইতে লাগিল, মিডিয়মের মুখ নড়িতে লাগিল, সন্দেশ খাইতে খাইতে মুখ মচ্‌কাইল। বলিলেন কি মিষ্টি, ভাল লাগে না। জানিস তো আমি নূতন গুড়ের সন্দেশ খেতে ভালবাসি।

(চক্রপতি—আর একদিন খাওয়াবো, এখন তো আর নূতন গুড় নেই)।

৫৮। ইরা, পদ্মা, শুভ্রা প্রণাম করিল। আত্মিক সকলকে আশীর্ব্বাদ করিল। পরে বলিল,—ডাকিস নি তুই! কেন ডাকিস ?

৫৯। মনোমোহন বলিল মা আমি প্রণাম করছি।

উঃ—আবার মা! মিডিয়ম সাহায্যে মনোমোহনের সমস্ত মস্তকে এবং মুখে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিল।

৬০। পদ্মার গান কেমন লাগল?

উঃ—পদ্মার গান আমি প্রায়ই শুনি।

৬১। মদনের মা এবং মদন প্রণাম করিল। আত্মিক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

৬২। দিদি মদন এবার ম্যাট্রিক পড়ছে, পাশ করবে ত?

উঃ—হুঁ।

৬৩। পাশ কর্‌লে তোমাকে ডাকব?

উঃ—না। আমার কত পূজোর ক্ষতি হল বল্ তো।

৬৪। পূজা করতে যাচ্ছিলেন না কি?

উঃ—ঐ দেখ না ফুলের সাজি। কই কই? ঐ তো।

চক্রপতি—এ চোখে কি আর দেখ্‌তো পাবো।

প্রদীপের প্রণাম;—আশীর্ব্বাদ।

৬৫। আচ্ছা দিদি শিবশঙ্কর ফুল নিয়ে এসেছ?

উঃ—না।

৬৬। তবে কি ফুল নিয়ে এসেছ?

উঃ—তোর দেখে কি হবে?

৬৭। আচ্ছা দিদি তুমি যেখানে থাক, সেটা কি বাড়ীর মত?

উঃ—উঁ-হুঁ।

তবে কি মন্দিরের মত?

উঃ—সে বলে কি হবে। তুই কি বুঝবি।

৬৮। মনোমোহন বলিল, মা মামার আর আমার 'বদরিকাশ্রম' যাবার ইচ্ছা আছে; সেখানে তোমার আর বাবার ফটো টাঙ্গিয়ে আস্‌বো?

উঃ—হ্যাঁ। (আনন্দের সহিত)

৬৯। আমাদের রাস্তায় যেন কোন বিপদ না হয়, তুমি আমাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যেও।

উঃ—হ্যাঁ।

(শেষে চক্রপতি প্রণাম করিলে, মিডিয়ম হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিল।)

আচ্ছা দিদি এখন যান। তৎপরে মিডিয়মের সংজ্ঞা আনা হয়।

লেখক সহকারী চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১৪-১০-৫৩

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৯-৪৫ নিঃ
শেষ ,, ১০-৫১ ,,
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। কে? কে আপনি বলুন?

উঃ—ভোঁদো।

২। আজ এত দেরি করে এলি যে?

উঃ—এই তো ডাক্‌লে।

৩। আলো জ্বালব?

উঃ—হ্যাঁ।

৪। কেমন আছিস?

উঃ—ভাল।

৫। এখন কোন্ স্তরে আছিস?

উঃ—পঞ্চম স্তরে?

৬। তর্পণের জল পেয়েছিলি?

উঃ—হ্যাঁ।

৭। কে তর্পণ করে জল দিয়েছে বল ত ?

উঃ—তুমি।

৮। আর কে দিয়েছে ?

উঃ—মনোমোহন।

৯। মনোমোহন কদিন পরে জল দিয়েছে বল তো ?

উঃ—৩।৪ দিন পরে।

১০। আর আমি ?

উঃ—তুমি ত রোজই জল দিতে।

১১। মধ্যে মধ্যে ২।১ বার তো ফাঁক পড়েছে ?

উঃ—না। মিছে কথা কেন বল্‌ছ।

১২। দিদি কাল চক্রে এসেছিল জানিস ?

উঃ—না।

১৩। দিদির সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না।

১৪। মেজদার সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না। কি করে দেখা হবে—আমি কোথায়। আমি দেখিইনি মেজমামাকে।

১৫। ইরার বিয়ে হয়ে গেছে জানিস ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৬। দেখতে এসেছিলি নাকি ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৭। কবে এসেছিলি ?

উঃ—একদিন এসেছিলাম বীরেনকে দেখতে।

১৮। বীরেন কোথায় ?

উঃ—কেশবের কাছে।

১৯। বীরেনের নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে শুনছি ?

উঃ—সে কথা আমি কি করে জানব।

২০। দিদিমার কিছু খবর রাখিস ?

উঃ—না।

২১। কেন ?

ভ০—(নিরুত্তর)।

২২। তোর দিদিমা কত বড়টা হয়েছে রে ? বল্ না ?

উঃ—না। তোমার কেবল ঐ সব কথা।

২৩। কোথায় জন্মেছে বল্ না ?

উঃ—উঁ-হুঁ। আমি বল্‌লে এখুনি শাস্তি করবে।

২৪। কেন, শাস্তি করবে কেন ?

উঃ—জিজ্ঞাসা কর ; ঐ যে !

২৫। ওরা কি করবে আমি থাক্‌তে ?

উঃ—বলবার জো নেই মামা।

২৬। বলবার জো নেই কেন ?

উঃ—জিজ্ঞাসা কর, ঐ ত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

২৭। কৈ তারা ?

উঃ—ঐ দেখ না।

২৮। তোর মাসি মারা গেছে জানিস ?

উঃ—হুঁ। জানি তো কি হবে।

২৯। তার খুব কষ্ট হচ্ছে নারে ?

উঃ—ও সব জানি না।

৩০। তার সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না।

৩১। দিদি ত বলে গেল যে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। তার আত্মার শান্তির জন্য কিছু করতে বল্‌লেন। দিদি মানে তোর "মা" রে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩২। তুই কি মনে করছিস আমরা তোদের খবর কিছু রাখি না, সব খবর রাখি। আমাদের খবর কিছু তোরা রাখিস ?
উঃ—হ্যাঁ। রাখলে কি হবে। কিছু বল্‌লে শাস্তি হবে।

৩৩। আগে তো এসে কত কথা বলতিস, এখন আবার কি হল ?
উঃ—আজকাল ওসব কথায় থাকতে দেয় না।

৩৪। কেন ?
উঃ—নিরুত্তর। পরে বলিল, আমি ত কত উঁচুতে উঠে গিয়েছিলুম।

৩৫। কত উঁচুতে ?
উঃ—সপ্তম স্তরে। আবার পঞ্চম স্তরে নামিয়ে দিয়েছে !

৩৬। আবার কেন নামিয়ে দিল ?
উঃ—আমি এক জায়গায় গিয়েছিলুম।

৩৭। আবার কোথায় গিয়েছিলি ?
উঃ—বল্‌বুনি।

৩৮। চক্রে গিয়েছিলি ?
উঃ—হ্যাঁ।

৩৯। কে ডেকেছিল ? বীরেন ?
উঃ—না। আমি এমনি গিয়েছিলুম।

৪০। তা বলে নামিয়ে দিল ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪১। সপ্তম স্তর কি রকম রে ?
উঃ—পঞ্চমের চেয়েও ভাল।

৪২। পঞ্চম স্তরটা কি রকম ?
উঃ—ভাল, তবে সপ্তমের মত নয়।

৪৩। সপ্তম স্তরে থাকবার জন্যে ঘরদোর কিছু আছে না কি ? মানে থাকবার মত কিছু আছে তো ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪৪। আচ্ছা পরলোকটা কি রকম রে ?
উঃ—নিরুত্তর।

৪৫। সেখানে কি সব হয় ?
উঃ—সেখানে সব কিছুই হয়।

৪৬। তবুও কি রকম ?
উঃ—তোমাদের এখানকার মত বিচার হচ্ছে, শাস্তি দিচ্ছে।

৪৭। আচ্ছা এখানকার মত সেখানে নদনদী আছে ?
উঃ—উঁ হুঁ।

৪৮। আচ্ছা ভোঁদো সেখানকার ঘরবাড়ী সব কি রকম রে ?
উঃ—কি করে বল্‌ব তোমাদের ঘরে। রাজবাড়ী দেখেছ ?
হ্যাঁ দেখেছি।
—ঐ রকম একটা। সেখানে সব আলাদা করে রেখেছে। ঐ দেখ মামা মারতে আসছে, আমি বল্‌বু নি।

৪৯। মারতে আসছে কেন ?
উঃ—আমি বলে দিচ্ছি বলে। (চক্রপতি প্রহরীদের লক্ষ্য করিয়া একটু ধম্‌কাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন)

৫০। এবারে মারতে আস্‌ছে ?
উঃ—না এখন আর আসছে না। তোমার কি বলতে হয় বল না, আমি আর থাকব না।

৫১। অনাথের খবর কিছু জানিস ?
উঃ—ওসব কেন জিজ্ঞাসা করছ মামা ?

৫২। আচ্ছা থাক সে কথা, তোদের রাজ্য এখান থেকে কতদূরে রে ?
উঃ—আর শুনে কায নেই।

৫৩। কেন? আমি বলছি তোদের রাজ্য সূর্য্যমণ্ডলের চেয়ে উঁচুতে না নিচুতে,না চন্দ্রমণ্ডলের চেয়ে উঁচুতে না নিচুতে?
উঃ—তোমার আর শুনে কাজ নেই।

৫৪। প্রহরী খিঁচুচ্ছে নাকি?
উঃ—হ্যাঁ। আমাকে মারতে আসছে।

৫৫। মারতে আসছে? কই মারুক ত দেখি। কোথায় তারা, কই?
উঃ—ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে।

৫৬। ক'জন এসেছে? দু'জন বুঝি?
উঃ—হ্যাঁ।

৫৭। ওরা কি করে? ওদের কি কোন কাজকর্ম্ম নেই?
উঃ—ওরাই ত শাস্তি করে।

৫৮। মিডিয়ম ভয়ে চেঁচাইয়া উঠিল। আঁঃ—আঁঃ—আঃ বলবু নি, ওখানকার কথা, কিছু বলবু নি।

(চক্রপতি মিডিয়মের মাথায় হাত দিয়া, এক স্তোত্র পাঠ করিলেন)।

৫৯। আর ভয় দেখাচ্ছে? মারতে আসছে?
উঃ—না এখন আর কিছু বল্‌ছে না।

৬০। জামাইকে দেখেছিস্‌?
উঃ—হুঁ।

৬১। জামাই প্রণাম করিল;—আশীর্ব্বাদ করিল। (ইত্যবসরে মিডিয়মের চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল)।

৬২। প্রহরাদের বড় বেশী বেশী অত্যাচার নয়?
উঃ—দেখ না আমি কিছু করিনি তবে কেন ওরা আমাকে অমন করে। আমি তো কিছু বলিনি ওখানকার কথা।

৬৩। ওরা এখন চলে গেছে ?

উঃ—না।

৬৪। মায়ের কথা কিছু বল্ না ?

উঃ—না।

৬৫। মায়ের কথা কিছু জানিস ?

উঃ—না।

৬৬। কত বড়টা হয়েছে রে ? বল্ না ?

উঃ—উঁ-হু।

৬৭। আমি কিন্তু অনেক কথাই জানি মায়ের সম্বন্ধে। আর যদি একটু বলিস তাহা হইলে আরও ভাল হয়। তারা পাঁচ ভাই, এক বোন, ব্রাহ্মণের বাড়ীতে জন্মেছে, এবং মা প্রায় দশ বৎসরের মত হয়েছে। ঠিক কিনা। একি সত্যি ?

উঃ—হ্যাঁ। আমি কতদূর চলে গিয়েছিলুম। ওদের না বলে বীরেনকে দেখতে গিয়েছিলুম, বলেই তো।

৬৮। ভগবানের নাম নে আবার উঠে যাবি।

উঃ—হ্যাঁ।

৬৯। সেখানে গীতা পাঠ হয় ?

উঃ—উঁ-হুঁ।

৭০। আমি ত আমার ডবোর আশ্রম বাড়ীতে গীতাপাঠ করি, সেখানে শুনতে যাস না কেন ?

উঃ—আসতে দেবে না। এখন তো চুরি করে এসেছি। ঐ দেখ মারতে আসছে।

৭১। কৈ ?

উঃ—ঐ দেখ না, ঐ দেখ না।

৭২। ২।১ টা পরলোকের সম্বন্ধে কথা বলতে দেবে না বুঝি ?

উঃ—না। কিছু বল্‌লেই মারবে।

৭৩। আমি থাকতেও মারবে? এখন মারছে?

উঃ—না।

৭৪। ভগবানের নাম নিয়ত নিস্, আবার উঠে যাবি?

উঃ—হুঁ।

৭৫। ফুরসুৎ মত আমার ওখানেও যাস, গিয়ে গীতা শুনিস?

উঃ—সেখানে গীতা শোনায় না! শুধু বলে পূজো কর্।

৭৬। বীরেনকে মায়ায় পড়ে দেখতে গিয়েছিলি?

উঃ—ঐ জন্যই তো নামিয়ে দিয়েছে।

৭৭। তোর গুরু খুব কড়া না? সেখান থেকে চলে যাওয়া যায় না?

উঃ—সেখান থেকে তো উঠে গিয়েছিলুম। বাবাকে দেখতে, আর বীরেনকে দেখতে গিয়েছিলুম, কাহাকেও না বলে, ও জন্যেই তো।

৭৮। দিদি এখন অষ্টম স্তরে আছেন জানিস্?

উঃ—কি করে জানব।

(চরণ দেবী চক্রপতিকে বাবার (দাসমহাশয়ের) কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিল)।

৭৯। দাসমহাশয় কি জাতে জন্মেছে রে?

উঃ—ছোট বৌ জিজ্ঞাসা করছে বুঝি?

৮০। তুই তো জানিস সব?

উঃ—সে আমি জানি। কিন্তু···(বলব না)

৮১। সে জন্মেছে তো?

উঃ—হ্যাঁ।

৮২। আমরা তাহলে তোদের চেয়ে স্বাধীন আছি বল?

উঃ—হ্যাঁ।

৮৩। আমরা তো ঢের মজায় আছি?

উঃ—হ্যাঁ।

৮৪। আমাদের চেয়েও তোদের ঢের কষ্ট বল্ ?
উঃ—হ্যাঁ।

৮৫। একটু কিছু করেছ তো ব্যাস্ অমনি পিছু লেগেছে ?
উঃ—হ্যাঁ।

৮৬। যা, আর তোকে কষ্ট দেব না ; বিদায় দিই ?
উঃ—হ্যাঁ।

৮৭। যা যখন এসেছিস তখন এখানকার ২।১ টা ফুল নিয়ে যা ?
উঃ—না-না ও আমার চাই না।

৮৮। এ ফুলে কাজ চলে না বুঝি ? তোদের পূজোয় শিবশঙ্কর ফুল লাগে না ?
উঃ—আর শিবশঙ্কর !

৮৯। কেন ?
উঃ—আর দেবে !

৯০। পূজো করিস তো ?
উ:—হ্যাঁ।

৯১। তবে কেন দেবে না ?
উঃ—না।

৯২। কেন ?
উঃ—অন্যায় করেছি।

৯৩। তবে কি দিয়ে পূজো করিস্ ?
উঃ—ঐ দেয় যেগুলো বাতিল।

৯৪। সেগুলো কি ফুল ?
উঃ—অত নাম বলব না মামা।

আচ্ছা এবার যা তোর কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে। আত্মিক চলিয়া যায়, কিছুক্ষণ পরে মিডিয়ম প্রকৃতিস্থা হয়।

লেখক সহকারী চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১৭-৪-৫৫

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৯টা
শেষ—৯-৪৫ মিঃ
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। কে আপনি ?

উঃ—সুধীর।

চক্রপতি ও সহ-চক্রপতি আত্মিককে প্রণাম করিলে, মিডিয়ম দক্ষিণ হস্ত উত্তলিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে ঘরের দরজা খোলা হইলে, বাহিরের দর্শকগণ নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকিল।

২। দিদি পূজা হয়ে গেছে তো ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩। ঐ জন্যই ত রাত্রি ৯টা চক্র করিলাম ; কতক্ষণ হল ?

উঃ—এই কতক্ষণ।

৪। তা হলে এই সময় ডেকে অন্যায় করিনি তো ?

উঃ—উঁ-হুঁ।

৫। দিদি আমরা বসবার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছিলে নাকি ?

উঃ—হ্যাঁ।

৬। মদন ম্যাট্রিক পাস করেছে জান ?

উঃ—হ্যাঁ।

৭। আচ্ছা কোন্ ডিভিসনে পাশ করেছে বল ত ?

উঃ—ফার্স্ট ডিভিসনে।

৮। আমরা বদরিকাশ্রম যাচ্ছি জান ?

উঃ—হ্যাঁ।

৯। রাস্তায় আমাদের যাতে কোন বাধাবিঘ্ন না হয়, তার জন্য লক্ষ্য রেখ।

উঃ—হ্যাঁ—রাখব।

১০। আমরা সেখানে তোমার ফটো নিয়ে যাব। আর কার কার ফটো নিয়ে যাব বল তো?
উঃ—তোর যা ইচ্ছা।

১১। সেখানে তোমাকে চক্রে ডাকবো, আসবে তো?
উঃ—হ্যাঁ, আসবো।

১২। দেখো, এস কিন্তু।
উঃ—কেন তুই ডাকলে আমি আসিনি?

১৩। আস্‌বে না কেন। আস্‌বেই তো!
উঃ—তবে।

১৪। আমার আশ্রমে তারপর আর গিয়াছিলে?
উঃ—আমি রোজই যাই।

(তারপর সকলে প্রণাম করিল) মদন প্রণাম করিলে আত্মিক বলিলেন; "মদন কত বড়টা হয়েছিস রে!"

১৫। তুমি ত রোজই দেখ, তবে এ কথা বল্‌ছ কেন?
উঃ—এমন করে দেখিনি।

১৬। আচ্ছা দিদি তোমরা কা'রো ভিতর ঢুকলে আমাদের স্থূল শরীরটা দেখতে পাও, না আমাদের সূক্ষ্ম শরীরটা দেখতে পাও?
উঃ—কারো ভেতর সেঁধুলে সব দেখতে পাই।

১৭। কারো ভেতর না সেঁধুলে?
উঃ—কেবল ভেতরটা।

১৮। দিদি আমি পরলোক সম্বন্ধে যে, বইটা লিখছি তার ভূমিকাটা লেখা হয়েছে জান?
উঃ—হ্যাঁ।

১৯। পড়ে শোনাব ?

উঃ—হ্যাঁ শোনা।

চক্রপতি শ্রীফণিভূষণ দেব মহাশয় পরলোক সম্বন্ধে যে বইটা লিখছেন তার ভূমিকাটা প্রথম হইতে আত্মিককে পড়াইয়া শুনাইতে লাগিলেন।

আত্মিক বলিতেছেন :—তুই লিখ্‌তে লিখ্‌তে পড়িস আমি শুনেছি।

"তাহ'লে এখান থেকে পড়ি শোন, বেশী বড় নয়, এক পাতা মাত্র।" চক্রপতি আবার পড়িতে লাগিলেন।

২০। ঠিক হচ্ছে তো ?

উঃ—হ্যাঁ। তুই দেখেছিলি ?

২১। বাবার কাছে শুনেছি তো ?

উঃ—তাই বল।

চক্রপতি আবার পড়িতে লাগিলেন।

২২। ভুলটুল হচ্ছে না তো ?

উঃ—না, তুই বল্ না আমি শুনি।

ভূমিকা পড়া শেষ হইল।

২৩। ঠিক লেখা হয়েছে ?

উঃ—হুঁ।

২৪। ভুল হয়নি তো ?

উঃ—না, কিছু ভুল হয়নি। তোরও যেমন শোনা, আমারও তেমনি শোনা। আমরা কি দেখেছি ?

২৫। আচ্ছা দিদি 'দ্বিবেন' (মনোমোহনের ৫ম পুত্র) কি ভাল হবে না ?

উঃ—হ্যাঁ হবে।

২৬। চলতে পারবে ?

উঃ—পারবে।

২৭। তবে চলতে শিখতে একটু বয়স নেবে, না দিদি ?
উঃ—হ্যাঁ।

২৮। কি ১২।১৪ বছর বয়সে চলতে শিখবে ?
উঃ—না, ২।১ বছরের মধ্যেই চলবে।

২৯। কথা বলতে শিখবে ?
উঃ—হ্যাঁ।

৩০। দিদি এখন তুমি কোন্ স্তরে আছ ?
উঃ—অষ্টম স্তরে।

৩১। ভোঁদোর সঙ্গে দেখা হয় ?
উঃ—No reply.

৩২। জন্মে গেছে নাকি ?
উঃ—কি জানি। ওসব কথা জিজ্ঞেস করতে মানা করেছি না তোকে।

৩৩। আচ্ছা দিদি 'মা' এখন কত বড়টা হয়েছে ?
উঃ—কি হবে জেনে ?

৩৪। আমাদের জানতেও ইচ্ছা করে।
উঃ—তোর শুনেই বা কি হবে ?

৩৫। আমি তো, আর কিছু জিজ্ঞেস করিনি, মায়ের বয়সটা জিজ্ঞেস করছি।
উঃ—তুই শুনেই বা কি করবি ?

৩৬। তুমি বললে বইয়ের মধ্যে মায়ের সম্বন্ধে একটু লিখতে পারতাম। মায়ের বয়স কত হয়েছে বল না দিদি ?
উঃ—উঁ-হুঁ।

৩৭। যাক্, হ্যাঁ দিদি আমি মেজদাকে তিনদিন ধরে চক্রে ডাকলাম কিন্তু এলো না। মেজদার ব্যাপার কি বলত ?
উঃ—সে নেই। জন্মে গেছে।

৩৮। এত শীঘ্র জন্মে গেছে ?

উঃ—হুঁ।

৩৯। মুনীন্দ্র সরকার জন্মে গেছে ?

উঃ—অত জিজ্ঞেস করার তোর দরকার কি ? (মুনীন্দ্র, আত্মিকের জামাতা)।

৪০। অনাথের ব্যাপার কি ?

উঃ—কি হবে তোর ? অত জিজ্ঞেস করার তোর দরকার কি ? ওসব কথা তোকে জিজ্ঞেস করতে মানা করেছি না। (অনাথ, আত্মিকের জামাতা)।

৪১। বিবেক ভাল আছে তো ?

উঃ—হ্যাঁ, ভাল আছে।

৪২। তুমি দিদি ওখানে মধ্যে মধ্যে গিয়ে, ওর উপর একটু লক্ষ্য রেখ।

উঃ—আমি গেলে ভয় পাবে। আমি যেয়ে তো ভয় দেখাব না।

৪৩। গিয়ে দেখা দেবে কেন ? অলক্ষ্যে থেকে একটু নজর রাখবে।

উঃ—হ্যাঁ।

৪৪। বিবেক আমার শিবটা পূজো করছে তো ?

উঃ—হ্যাঁ।

৪৫। আচ্ছা দিদি বদরিকাশ্রম যেতে যেতে কে কে ক্লান্ত হয়ে পড়বে ?

উঃ—আরে কাকেও ক্লান্ত হতে দেব না। আমি সঙ্গে থাকব।

৪৬। আমরা বিপদে পড়লে কি করলে তুমি আসবে ?

উঃ—তোরা আমাকে মনে করবি।

৪৭। তোমায় মনে মনে ডাক্‌লেই তুমি আসবে তো ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪৮। তুমি যে আসবে তার কি চিহ্ন তুমি দেবে ?
উঃ—কিছু চিহ্ন দিলে তোরা ভয় পাবি। আমি তোদের সঙ্গে থাকব, তোদের বল আসবে।

৪৯। তোমার ফটো নিয়ে যাব তো ?
উঃ—হ্যাঁ।

৫০। আচ্ছা কার কার ফটো নিয়ে যাব ?
উঃ—যার ইচ্ছে তার নিয়ে যাবি।

৫১। তবুও কার কার নিয়ে যাব ? এই যেমন তোমার, দাস মহাশয়ের, মনোমোহনের শ্বশুরের ইত্যাদি, ইত্যাদি।
উঃ—আমি জানি না। যার ইচ্ছে তার নিয়ে যাবি।

৫২। হ্যাঁ, দিদি আমরা সেখানে গিয়ে কোথায় শ্রাদ্ধ করব ? দেবপ্রয়াগে না ব্রহ্মকোপালে ?
উঃ—দেবপ্রয়াগে তো কর্‌তেই হয়, ব্রহ্মকোপালে না কর্‌লেও চলে।

৫৩। তাহলে ব্রহ্মকোপালে করবো না ?
উঃ—এটায় কর আর না কর।

৫৪। দেবপ্রয়াগে তাহলে করতেই হয় ?
উঃ—হ্যাঁ।

৫৫। ন্যাড়া হতে হবে নাকি ?
উঃ—সে ইচ্ছা।

৫৬। আচ্ছা দিদি, মদনের পেট্‌টা বার বার কন্‌ কন্‌ করে কেন বলতো ? (মিডিয়ম মদনের দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রায় ২।৩ মিঃ রহিল তারপর বলিল)
উঃ—তুই তো ভাল হয়ে গেছিস রে ! তুই বড় খুঁতখুঁতে। তোর মন অত খুঁতখুঁতে কেন ?

৫৭। মদনের প্রশ্ন ঃ—ভাল হয়ে গেছে তো পেট কন্‌কন্ করে কেন ?

উঃ—তোর পিসীমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে খেয়ে নিস্। (এই বলিয়া মিডিয়ম হাত উঠাইয়া মদনের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিল) এবং বলিল যা ভাল হয়ে গেছিস।

৫৮। চক্রপতির প্রশ্ন ঃ—তোমার ছোট বউ বলছে, আসছে বছর ছোট বউ ওর মামী, আমাদের সাথে বদরিকাশ্রম যেতে পারবে কি না ?

উঃ—কেন যেতে পারবে না ?

৫৯। ছেলেপিলে রেখে যাবে কিন্তু ?

উঃ—হ্যাঁ, কোন ভয় নেই।

৬০। কিছু খাবে নাকি ?

উঃ—আমি খেয়েছি।

৬১। কে খাইয়েছে ?

উঃ—মনোমোহন।

৬২। কবে সংক্রান্তিতে ?

উঃ—হুঁ।

৬৩। কিছু মিষ্টি খাবে ?

উঃ—কি মিষ্টি খাওয়াবি ?

৬৪। রসগোল্লা।

উঃ—না, আমি খাব না।

৬৫। খেজুরে গুড় আছে খাবে নাকি ?

উঃ—দূর দূর।

৬৬। মদন বল্‌লে ঃ—তবে ঠাকুমা একটা গান শুন্থন ?
উঃ—হ্যাঁরে মদন তুই যে বড় রসিক হয়েছিস। আমি তোর ঠাকুর মা। মদনের উত্তর, ঠাকুমা নাতো কি? (মদনের কথায় মিডিয়ম কাঁদিতে লাগিল) চক্রপতি আত্মিককে সান্ত্বনা দিয়া গান শুনিতে বলিল।

রেকর্ডে,—কমলা ঝরিয়ার কীর্ত্তন।

"এস শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম"।

৬৭। হ্যাঁ দিদি তুমি আমার দাড়ি দেখেছ ?
উঃ—তুই আবার ভেক্ সেজেছিস্ কেন ?

৬৮। দাড়িতে হাত দিয়ে দেখ না একবার ?
উঃ—কি দেখবো হাত দিয়ে, বল না।

৬৯। দিদি আমি তোমার মাই খেয়েছি, আর আজ আমার পাকাপাকা দাড়ি, হায় রে কি তুনিয়ার নিয়ম।
উঃ—মিডিয়ম একটু হাসিল এবং বলিল হুঁ।

(মনোমোহনের প্রবেশ)

মনোমোহন বলিল, "মা" আত্মিক বলিল কেন "বাবা"। আমরা বদরিনাথ যাচ্ছি রাস্তায় কোন বিপদ হবে না তো ?
উঃ—কিছু ভয় নেই।

৭০। তোমার ফটো নিয়ে যাচ্ছি মা ?
উঃ—হ্যাঁ।

৭১। মদন প্রশ্ন করিল ঃ—ঠাকুমা আমি পাশ করবো তো ?
উঃ—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

৭২। মনোমোহন—মা তুমি পদ্মার গান শুনেছ ?
উঃ—আমি পদ্মার গান রোজই শুনি, কৈ আজ তো পদ্মা গান শোনালে না।

৭৩। মা আমি জল দিয়েছিলাম পেয়েছ?

উঃ—হ্যাঁ।

মনোমোহনের ও ফণিভূষণের প্রণাম এবং মিডিয়মের হাত উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ। পদ্মা প্রণাম করিল,—থাক পদ্মা।

৭৪। পদ্মা কত বড়টা হয়েছে দেখছ মা?

উঃ—হ্যাঁ!, দেখতে পেয়েছি; মদনটা কত বড় হয়েছে রে।

ইরার প্রণাম,—থাক্ থাক্ ইরা। ইরাই বা কি কম হয়েছে।

৭৫। মা, ইরার ছেলে হবে?

উঃ—হ্যাঁ হবে।

৭৬। আমার নাতি হলে তোমাকে ডেকে দেখাব? No reply. আত্মিক কাঁদিতে লাগিল।

৭৭। মা বদরীনাথে তোমাকে ডাকবো, আস্‌বে তো?

উঃ—আস্‌বো।

৭৮। হ্যাঁ, দিদি তোমার তাহলে আমার দাড়ি রাখা ভাল লাগেনি, তাই আমাকে ভোল সেজেছ বললে?

উঃ—আমি "ভোল বলিনি ত, ভেক্ বলেছি।"

৭৯। দিদি দাড়িতে হাত দিয়ে, ছোট ভায়ের একটু চুমু খাওনা?

উঃ—তখন মিডিয়ম সাহায্যে দাড়িতে হাত দিল।

৮০। দিদি এখন বিদায় দিই কি বল?

উঃ—আর কি করব বল না। ওখানে সব দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কেন।

দিদি প্রণাম, দুবার তো প্রণাম করলি, আর কেন।

এবার যান। তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মিডিয়ম প্রকৃতিস্থা হইল।

লেখক সঃ চক্রপতি
শ্রীমদন মোহন দাস।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ২৯-৫-৫৫

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৯-৩৭ মিঃ
শেষ—১০-৩৮
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

অদ্য তারিখে প্রথমে চক্রে বসা হইল ৮-৪০ মিঃ, চক্রে বসিলেন ফণিভূষণ, চরণ দেবী, ইরাবালা, মদনমোহন। ৪৫ মিঃ পর্য্যন্ত চক্রে বসিয়াও কোন আত্মিক আসিলেন না। শেষে চক্রপতির আদেশে চক্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় দ্বিতীয়বার চক্র করা হয়, ইরা-বালাকে বাদ দিয়া, শিবানী দেবীকে লইয়া। রাত্রি ৯-৩৭ মিনিটে আরম্ভ হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মিক আসিলে আলো জ্বালান হইল। চক্রপতির প্রশ্ন, ঃ—

১। কে দিদি নাকি ?
উঃ—হুঁ।

চক্রপতি আত্মিককে প্রণাম করিলেন। এবং আত্মিক আশীর্ব্বাদ করিল।

২। আমরা বদরিকাশ্রম থেকে ফিরে এসেছি জান তো ?
উঃ—হুঁ।

৩। আমাদের প্রথম চক্রে তুমি এলে না কেন ?
উঃ—এসেছিলাম।

৪। তবে কারোর মধ্যে ঢুকলে না কেন ?
উঃ—জায়গা পেলাম না।

৫। মদনের মায়ের মধ্যেও না ?
উঃ—না।

৬। এখনও কি মনে মনে কিছু (রাগ) আছে না কি ?
উঃ—না-না। কি থাকবে কি ?

৭। তবে ঢুকলে না যে বড় ?

উঃ—এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিস কেন ? জায়গা দিলে কৈ ? (আত্মিক একটু রাগ ভাব দেখাইল)।

৮। যাক্, হ্যাঁ দিদি বদরিকাশ্রমের তুর্গম পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে তো ?

উঃ—হ্যাঁ।

৯। কোন্ কোন্ জায়গায় ছিলে ?

উঃ—সব জায়গায় ছিলাম।

১০। হ্যাঁ, দিদি বদরির পথে যেতে যেতে যখন শিবানী পাথরের উপর পড়ে গিয়েছিল, তখন তুমি ছিলে ?

উঃ—হ্যাঁ ছিলাম। আমি তো ওকে ধরে নিয়েছিলাম। (আশ্চর্য্য) কোন চোট লাগে না, এমন কি চশমাটি পর্য্যন্ত ভাঙ্গে না) মনমোহনকেও ত ধরেছিলাম, ওর ঘোড়া পিছলে গিয়েছিল, আমি ধরে ফেল্লাম। (সত্যই পিছলে গিয়েছিল) তুই বল্লি বদরিনাথে ডাক্‌বি, কৈ ডাক্‌লি না তো ?

১১। সেখানে বলে ঠাণ্ডায় হাত-পা সব কেঁপে যাচ্ছে, তার উপর চক্র করতে ভাল লাগে ?—No reply.

১২। তুমি বুঝি চক্রে আসবার জন্যে অপেক্ষা করছিলে ?

উঃ—হুঁ, ভাবছিলাম তোদের ঘরে বলি 'ভয় নাই।' আমি আছি। (সত্যি দিদি তোমার স্নেহ আমি কি ভুলতে পারব)

মনোমোহনের প্রশ্ন ঃ—

১৩। মা, তোমার ফটো যখন বদরিনাথের মন্দির মধ্যে লাগান হয় তখন তুমি ছিলে ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৪। কেদারে যখন লাগাই ?

উঃ—হ্যাঁ, হু' জায়গাতেই ছিলাম।

১৫। আচ্ছা মা কেদারের কোথায় লাগিয়েছি বলতো ?

উঃ—কেদারের গায়ে। ফটো লাগাতে লাগাতে তুই কেঁদে ফেললি। আমি তোকে কাঁদতে মানা করলাম।

১৬। চক্রপতির প্রশ্ন ঃ—কেদারে আমাদের ঠাকুর দর্শন করতে কোন অসুবিধা হয়নি। (আত্মিক কিছুক্ষণ থামিয়া বলিতে লাগিলেন)।

উঃ—বদরিনাথের মন্দিরে ঢুকতে দেয় না। পাণ্ডা ফটো নিয়ে গেল বলে তাই। পাণ্ডা যেই ফটো নিয়ে গেল, আমি অমনি ঢুকে পড়েছি। না হলে আমি যেতে পারতাম না। (কি আশ্চর্য্য আত্মিকরাও মন্দিরে ঢুকতে পারে না)।

১৭। ফটো না নিয়ে গেলে ঢুকতে পারতে না ?

উঃ—উঁ হুঁ। ফটো নিয়ে গেল বলে ঢুকতে পারলাম।

১৮। বদরিকাশ্রমের পথে তুমি আমাদের সঙ্গে কি ভাবে থাকতে ?

উঃ—তোদের ভিতরে ঢুকিনি। বাইরে বাইরে ছিলাম।

১৯। আচ্ছা দিদি আমি যেতে যেতে পড়েছিলাম কি ?

উঃ—না।

২০। তুমি বেশীর ভাগ কার কাছে থাকতে ?

উঃ—আমি বেশীরভাগ থাকতাম মনোমোহনের কাছে। তোর ত অত কষ্ট হয়নি।

২১। হ্যাঁ, মনোমোহনের বেশী কষ্ট হয়েছে, তাইতো ওকে ঘোড়া করতে বল্‌লাম ?

উঃ—না হলেও যেতে পারতো। তুই ভয় দেখালি তাই। বল্লি 'তুই পারবি নি'।

২২। মনোমোহনের প্রশ্ন ঃ—মা তুমি মানা করলে না কেন ?

উঃ—আমি বলছি তোরা শুনতে পাসনি।

২৩। এ কানে কি আর শুনতে পাওয়া যাবে মা ?

উঃ—তবে কি করব বল বাবা।

২৪। চক্রপতির প্রশ্ন ঃ—যাক্ আমরা দেবপ্রয়াগে শ্রাদ্ধ করেছি জান ?

উঃ—হুঁ।

২৫। কোন্ জায়গায় বলতো ?

উঃ—একটা গর্তের মত গুহার মধ্যে।

২৬। তুমি উপস্থিত ছিলে ?

উঃ—হ্যাঁ।

২৭। আর কে কে উপস্থিত ছিল ?

উঃ—তোর অত জিজ্ঞেস করার দরকার কি ? ঐ তো তোর দোষ।

২৮। বাবা এসেছিলেন ?

উঃ—কেন ওসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিস্। বাবা এসে কি আমার সঙ্গে কথা বলবে।

২৯। আহা আমি কি বলছি বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তবে এসেছিল কিনা আমাদের ও ত জানতে ইচ্ছা করে ?

উঃ—ওসব জিজ্ঞেস করিসনি। সব এসেছিল।

৩০। নেড়া হয়েছিলাম জান ?

উঃ—আর থাক্। (বিদ্রূপ)

৩১। তবে তুমি সব জান বল ?

উঃ—হুঁ।

৩২। হ্যাঁ, দিদি আমাদের একটা তর্ক হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, তোমার পায়ের গোছ মোটা ছিল না রোগা ছিল। আমি বলছি কি তোমার পায়ের গোছ আমাদের মতই রোগা ছিল ?

উঃ—মিথ্যে কথা। আমার রোগা ছিল না। আমার মোটা ছিল। আমার মেয়েদের মতই ছিল।

৩৩। তোমার সব মেয়েদের কি পায়ের গোছ মোটা ?

উঃ—সব মেয়েদেরই আমার মত ছিল।

৩৪। কেন ভবানীর ?

উঃ—উঁ-হুঁ-হুঁ।

৩৫। কেন পুঁটীর ?

উঃ—সব আমার মত। হ্যাঁরে ওসব বাজে কথা কেন বল্‌ছিস।

৩৬। যাক্‌গে, বল্‌ছিলাম কি মদনকে যে ওষুধ খেতে বলে গিয়েছিলে, সেই ওষুধ খেয়ে মদন ভাল আছে ?

উঃ—থাক্ (বিদ্রূপ) সে আমি জানি নি ? মদনকে আমি রোজই দেখে যাই। মদনের মনকে বাঁধবার জন্য আমি চেষ্টা করি।

৩৭। আচ্ছা দিদি বদরির পথে, মনোমোহন আর জানকীতে ঝগড়া হয় তখন তুমি ছিলে ?

উঃ—তখন আমি ছিনু নি। তুই মনে মনে ডাকছিলি না আমাকে ; আমি আবার এসে ঠাণ্ডা করে দিনু। (সত্যই আমি দিদিকে চিন্তা করেছিলাম)।

৩৮। বিবেক ডবোর আশ্রমে ভাল আছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩৯। সে বি, এ, পাস করবে? দেখ না দিদি একবার খবরটা নিয়ে এসো না?

উঃ—কি করে দেখবো খবরটা বেরুইনি যে।

৪০। পাশ কর্‌বে তো?

উঃ—হ্যাঁ পাশ করবে। (পাশ করে)

৪১। দিদি মদন তোমাকে গড় করে?

উঃ—হ্যাঁ গড় করে। আজকাল করে।

৪২। কখন করে?

উঃ—সকালবেলা যখন বাইরে যায়। আগে করতো নি। (কাঁদিয়া ফেলিল)

৪৩। আচ্ছা দিদি মদনের মা, আর শিবানী তোমাকে রোজ পূজা করে তুমি নাও?

উঃ—হ্যাঁ পূজো তো নেবো। কিন্তু রোজ খেতে দেয় না।

৪৪। কিছু খাবে দিদি?

উঃ—সব সময় খেতে নেই।

৪৫। তাতে কি হয়েছে? একটু খাও না?

উঃ—কি খাব।

৪৬। ভালো ন্যাংড়া আর বোম্বাই আম আছে। No reply.

৪৭। (তারপর আত্মিককে আম এবং ক্ষীরমোহন মিষ্টি দেওয়া হইল) জল দেব?

উঃ—জল খেয়েছি; এত আম?

৪৮। আরে এই কটা তো আম, খেয়ে নাও না? (আত্মিক খাইতে লাগিল) মুখের কাছে ধরব নাকি?

উঃ—না না মুখের কাছেই ত রয়েছে।

পদ্মার গান।

মনোমোহনের প্রশ্ন ঃ—

৪৯। আমগুলো ভাল মা ?

উঃ—হুঁ।

৫০। মিষ্টিটা খাও না মা ? No reply.

৫১। ক্ষীরমোহনটা ভাল হয়েছে খাওনা মা ?

উঃ—না।

চক্রপতির প্রশ্ন ঃ—

৫২। খেয়েই ফেল না ?

উঃ— (হাস্‌লো) আচ্ছা।

৫৩। কেমন হয়েছে ?

উঃ—ভাল।

৫৪। আজ ক'জন সঙ্গে এসেছে ?

উঃ—দুজন।

৫৫। চক্রপতি মিডিয়মের পায়ে হাত দিয়া দেখিতেছিল যে, মিডিয়মের পা কতদূর ঠাণ্ডা হইল। পায়ে হাত দিতে আত্মিক বলিল "কি দেখ্‌ছিস্‌" ? দেখছিলুম কতটা ঠাণ্ডা হল।

(ইরার ও শুভ্রার গান শেষ হইয়া গেল)।

৫৬। দিদি কার গলা সবচেয়ে ভাল ?

উঃ—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'পদ্মার'।

৫৭। সনাতন (ইরার স্বামী) যে বাড়ী গেছে ভাল আছে তো মা ? (মনোমোহনের প্রশ্ন)

উঃ—হ্যাঁ-হ্যাঁ।

৫৮। তার মা ভাল আছে ?

উঃ—ভাল আছে, ভাল আছে।

৫৯। কতকগুলি সাংসারিক প্রশ্নের পর। চক্রপতির প্রশ্ন ঃ—
হ্যাঁ দিদি ইরা বলছিল কি, ও রোগা হবে কি করে?
উঃ—হাসলো ; ওর বাপের যে বড় সাধ মোটা হবে।
দিদি আমি একটা ওষুধ ঠিক করে রেখেছি।
উঃ—কি বল্ না ? ওষুধটা হচ্ছে কলার মধ্যে ছারপোকা মেরে ভোরে উঠে খেয়ে নিতে বলেছি। আত্মিক মুচ্‌কাইয়া হাঁসিল বলিলেন হুঁ হুঁ। তোর বাপের বড্ড শখ, তুই রোগা ছিলি বলে। আর মোটা হবিনি, ভয় নেই তোর বাবার শখ মিটেছে। তোকে মোটা করার জন্যে কি কি খাইয়েছে জানিস। পদ্মার প্রশ্ন ঃ—ঠাকুমা—আমি আর মোটা হব না ত ?
উঃ—আর মোটা হলে যে পেঁড়া হয়ে যাবি।

তৎপরে চক্রপতি, মনোমোহন হইতে সকলকার প্রণাম। আত্মিক সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সান্ত্বনা দিবার পর, আত্মিক বলিলেন, "কেন তোরা বলিস বৌ, ঠাকুমা, মায়ার জন্যে যে বড় কষ্ট হয়।"

৬০। মা, আমার সেই রোগটা ভাল হয়ে গেছে।
উঃ—হ্যাঁ সেরে গ্যাছে। ভয় নেই, কেন তোর আর মাথা ঘুরছে ?

৬১। দিদিও ১১ পাউণ্ড ওজনে কমে গেছে।
উঃ—তা হক্।

৬২। কিছু ভয় নেই তা হলে তো মা ?
উঃ—(কান্না) কিছু ভয় নেই। তোর কিছু ভয় নেই রে বাবা। তোর মন ভাল তোর সব ভাল বাবা। কোন ভয় নেই।

৬৩। পদ্মা বল্‌ছে—ঠাকুমা ডাক্তার বলেছে, আমার মাথায় ব্লাডপ্রেসার হয়েছে ?

উঃ—বলুক পাগল !

৬৪। চক্রপতি বলিতেছেন ঃ—মাথায় ব্লাডপ্রেসার, কেন মাথায় অর্শ হয়েছে বল্ না। আত্মিক হুঁ দিয়া হাসলো।

৬৫। দিদি দ্বিবেন চলতে শিখবে। এখন থেকে যা তড়াক্ তড়াক্ করে দাঁড়াচ্ছে !

উঃ—হ্যাঁ, (হাসলো) সব বলবে চলবে। কিছু ভয় নেই। আমি দেখে চলে যাই। আমায় ডাকিস্‌নি। (কান্না) মনোমোহন সান্ত্বনা দিতে লাগিল এবং মিডিয়মের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আত্মিক বলিতেছেন, যাক্ বাবা তুই ছেলে হয়েছিলি বলে (আবার কান্না)।

(এবারে দুজনেই কাঁদিতে লাগিল)।

চক্রপতি ঃ—নাও, এখন মা বেটায় কাঁদ বসে বসে। সকলকার পক্ষে, বিশেষ করে আত্মিকের পক্ষে 'মায়া' অত্যন্ত খারাপ করে। সান্ত্বনা দিবার পর চুপ করিল।

৬৬। হ্যাঁ দিদি, মনোমোহন আর শিবানী, বামুন দিয়ে ১০৮ করে বিল্বপত্র দিয়ে কেদারনাথের পূজা করেছে, ঠিক হয়েছে তো ?

উঃ—বাবা, নিজে পূজা করতে হয়। বামুন দিলে ঐ রকমই হয়।

৬৭। মনোমোহনের প্রশ্নঃ—কেদারে যেতে বড্ড কষ্ট হয়েছে মা।

উঃ—আরো বুঝতে পারতিস। আমি তো তোর মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করেছিনু, তুই নিতে পারলিনি যে। যেই বুকটা একটু কন্ কন্ করে অমনি হ্যা হ্যা করে হাঁপাতে লাগ্‌লি। আমাকে ঢুকতে দিলি কৈ।

৬৮। চক্রপতির প্রশ্ন ঃ—শিবানী যখন পড়ে গিয়েছিল তখন তুমি শিবানীর কাছে ছিলে ?

উঃ—আমি ওর কাছে ছিলাম না। মনোমোহনের কাছে ছিলাম।

৬৯। আর শিবানীর কাছে ছিলে না ?

উঃ—ওর শরীর খারাপ বলে ওর কাছে এক এক বার ছিলাম।

৭০। আমি কেমন চলেছি বলো তো ?

উঃ—কে ফণী, বেশ চলেছিস্। মনোমোহন তুই যেতে পারতিসনি আমার ভয় হত।

৭১। মনোমোহনের আবার আমাশয় হল ?

উঃ—আমাশা হ'লে কি হবে। আমি ঔষধ খাইয়ে দিয়েছিনু। তোরা ভাবলি তোদের ঔষধে ভাল হল, নয় !

৭২। আচ্ছা দিদি পাতাল গঙ্গায় শিবানী যেদিন স্বপ্ন দেখে সেদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে নাকি ?

উঃ—হ্যাঁ, দেখলাম মনোমোহন আর শিবানী পাশাপাশি শুয়ে আছে, আর শিবানী কাঁদ্‌ছে, বল্‌লাম ভয় নেই তোর। (চ-চ কেন, যাচ্ছি)

৭৩। ওরা বুঝি এখনও দাঁড়িয়ে আছে ?

উঃ—ঐ তো বল্‌ছে চ-চ।

৭৪। তুমি কতদূর পর্য্যন্ত ছিলে আমাদের সঙ্গে ?

উঃ—আমি তোদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে গেছি।

৭৫। মনোমোহনের প্রশ্ন,—হ্যাঁ মা যখন ঝড়টা হয় তখন তুমি ছিলে ?

উঃ—হুঁ, তখন তো তুই ডাকছিলি আমাকে।

৭৬। আমার টুপিটা উড়ে গেল ?

উঃ—হ্যাঁ, আমি তো টুপিটা ধরে ফেললাম। তুই মনে করছিলি কি। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম।

৭৭। সেখানে তো একজনের ৬০০৲ টাকা চুরিই হয়ে গেল আমার তো ভয় হচ্ছিল ?

উঃ—সে তোদের ভয় কি। কানা করে দেব না।

৭৮। চক্রপতি :—দিদি এবার বিদায় দেব ?

উঃ—আর কি কথা কইবো। আর ডাকিস্‌নি আমাকে (কান্না)

৭৯। মদনের মা বল্‌ছে, আসছে বছর ওরা বদরিকাশ্রম যাবে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে তো ?

উঃ—হ্যাঁ।

৮০। যেতে বারণ নেই তো তোমার ?

উঃ—কে বারণ করছে। আমি বলি কি ধৈর্য্য ধর। না হয় ২।৩ বছর পরেই যাবে ? (তাই যাবে তাতে কি হয়েছে)।

৮১। তোমাকে মনে কর্‌লেই তুমি আসবে তো ?

উঃ—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুই ডাকলে আমি আসিনি। ডাক্‌লেই আসবো। এই মদন যখন সকালে উঠে ডাকে আমি ছুটে চলে আসি।

৮২। অরর প্রশ্ন,—ঠাকুরমা আপনাকে আর কে কে প্রণাম করে ?

উঃ—তোর বাবা রোজই ডাকেরে। তোর বাবা রোজই ডাকে। সে কোন দিনই বাদ যায় না।

৮৩। দিদি, বিদায় দে'ব ?

উঃ—হ্যাঁ।

৮৪। দিদি আমার ওখানে বুঝ্‌লে তো ?

উঃ—হ্যাঁ।

৮৫। কি বুঝলে ?

উঃ—সাহায্য করতে হবে আর কি।

৮৬। কখন ?

উঃ—যখন লিখবি। তোকে আমি কবে বলেছি করব না। (কান্না) আমায় ডাকলে ৭ দিন সাম্‌লাতে যায় (কান্না)।

তৎপরে বিদায় দিয়া মিডিয়মকে প্রকৃতিস্থা করা হয়। তাহাতে কিছু সময় লাগে।

লেখক সহ-চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১৯-৬-৫৫
রবিবার
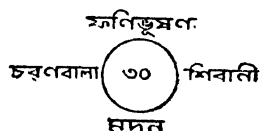
সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৯টা
শেষ ,, ৯-৩৩ মিঃ
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

গতকল্য (১৮-৬-৫৫) চক্র করা হয় কিন্তু প্রায় ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট বসিয়াও কোন ফল হয় নাই। যে আত্মিক্‌কে ডাকিবার উদ্দেশ্যে চক্র করা হয় তিনি তো আসিলেনই না, উপরন্তু অন্য কোন আত্মিক পর্য্যন্ত আসিলেন না।

১। কে আপনি ?

উঃ—সুধীর।

২। কে দিদি ?

উঃ—হুঁ।

(আলো জ্বালান হইল)

৩। আচ্ছা দিদি কাল তুমি এলেনা কেন ?

উঃ— No reply.

৪। কিগো দিদি ?

উঃ—কেন ডাকিস আমাকে ? তুই কি বলেছিলি ?

৫। তুমি কাল আসনি তাহলে ?

উঃ—কেন আসবো না।

৬। এসেছিলে তাহলে ?

উঃ—হ্যাঁ ; আমাকে কত শাস্তি করেছিল জানিস্ ? তোদের জন্যে কি আমি নিচে নেমে যাব ?

৭। না না তা কেন যাবে। মনোমোহন বললে তাই একবার ডাকলাম। সামান্য ২।১টা প্রশ্ন করে ছেড়ে দেব।

উঃ—আমাকে বাজে কথা জিজ্ঞেস করবিনি কিন্তু।

৮। না না বাজে কথা জিজ্ঞেস করবো না। ২।১টা কথা জিজ্ঞাসা করে ছেড়ে দেব।

হ্যাঁ দিদি, মদনের আবার পেটটা কন্ কন্ করছে কেন বলদিকিনি, বলে কিছু খেলেই কন্ কন্ করে, আর তোমাকে ডাকলেই ভাল হয়ে যায়।

উঃ—ওর মনটাই ঐ রকম। ওতো ভাল হয়ে গেছে।

৯। তোমরা ত পেটের মধ্যে ঢুকতে পার, একবার ঢুকে দেখ না ?

উঃ—ও কিছু হয়নি।

১০। যাক দিদি সনাতনের কথা কিছু জিজ্ঞেস করবো ?

উঃ—হ্যাঁ কর।

১১। জান দিদি, একটা টেলিগ্রাম এসেছিল, সেটা কে করেছিল ?

উঃ—ওর দাদা।

১২। অসুখ বিসুখ করেছে নাকি ?
উঃ—হ্যাঁ।

১৩। কি হয়েছে কি ?
উঃ—জ্বর হয়েছে আবার কি।

১৪। এখন ভাল হয়ে গেছে ?
উঃ—না।

১৫। মারাত্মক কিছু হয়েছে নাকি ?
উঃ—জ্বর আর মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, আর বাবা বাবা বলছে।

১৬। হ্যাঁ দিদি সনাতন কি কলকাতায় কোন চাকরী-বাকরী খুঁজছিল নাকি ?
উঃ—না-না !

১৭। আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো ?
উঃ—কি ?

১৮। বিবেক তো B. A. পাস হয়ে গেছে, M. Aতে ভর্ত্তি হতে পারবে ?
উঃ—আবার ওসব কথা।

১৯। পদ্মার বিয়ের জন্যে একটা পাত্র দেখা হয়েছে, সেটার সম্বন্ধে তোমার কি মত বল। ছেলেটা B. A. পাস। দেখতে ফরসা ; আর ঐ বিয়ের ব্যাপারে চিতুর চিঠিটা পড়ে তোমাকে শুনিয়ে দিই।
উঃ—ঐতো, বললাম তোকে আমাকে ও সব কথা আদৌ জিজ্ঞেস করিস্‌নি। ওর বাবার ইচ্ছে থাকলে তো। আমি কি করবো সে। এখানে আর ডাকিসনি।

২০। বিবেক কেমন আছে বল ?
উঃ—ভাল।

২১। আমার শিবটা পূজা করছে ?
উঃ—হ্যাঁ।

২২। আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব দিদি ?
উঃ—কি বলনা।

২৩। আহাহা তবুও তোমার মতটা বলতে দোষ কি। (চক্রপতি জামার পকেট হইতে পত্রটি বাহির করিতে লাগিলেন। তখন আত্মিক বলিতেছেন—আমাকে আর ডাকিসনি তোরা।

২৪। শোন, চক্রপতি চিঠি পড়িতে লাগিলেন (তখন মিডিয়মের হাত, পা, এবং ঠোঁট ভীষণ কাঁপিতে লাগিল)

২৫। আবার কি হল ?
উঃ—বেশী দেরী করিস নি। আমায় ছেড়েদে, কতলোক এসেছে দেখতে পাচ্ছিস্ ?

২৬। কত জন ?
উঃ—৭।৮ জন, আমাকে বেশী দেরী করিস নি, আমাকে নামিয়ে দেবে।

২৭। নামিয়ে দেবে ?
উঃ—হ্যাঁ, দেখনা বল্‌ছে—চ।

২৮। ওদের আর একটু সবুর সইছে না। নাও শোন (আবার পড়িতে লাগিলেন)
উঃ—ওসব কথা আমাকে কেন বলছিস। তোকে বল্‌লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিস নি কিছু। খালি খালি এমন করে ডাকিস্ নি।

২৯। তোমাকে ডাকিছু একটা কথা কইবার জন্য ; আর পরলোকের এমন কি কানুন যে ইহলোকের লোকের সঙ্গে কোন কথা বল্‌লে তাকে নিম্ন স্তরে নামিয়ে দেবে ?
উঃ—কোন কথা জিজ্ঞেস করিস নি আমাকে।

৩০। কাল তোমাকে ঐজন্যই আসতে দেয় না বুঝি ?

উঃ—আমি কাল ৩ বার ৪ বার এসেছি। ডাকলেই আসতে হয়। আমাকে ঢুক্‌তে দেয় নি।

৩১। যাক্‌ আজ চক্রের কাছে নিনু এসেছিল নাকি ?

উঃ—না না কেও আসেনি ওরা।

৩২। যারা তোমার সঙ্গে এসেছে তারা কোথায় এখন ?

উঃ—তোর পাশে তো দাঁড়িয়ে আছে। তোকে বলছে ঠ্যাঙ্গাবো !

৩৩। আমাকে ঠ্যাঙ্গাবো বলছে ?

উঃ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

৩৪। ওদের স্পর্দ্ধা তো কম নয়। তবে দাঁড়াও দেখি ওরা কত বেড়েছে। (মন্ত্র কবচ দিয়া শরীরটাকে রক্ষা করিয়া) একটা স্তব পাঠ করি শোন। (চক্রপতি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন)।

৩৫। দিদি ওদের একবার আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌তে বল। পরলোকের সঙ্গে আমাদের ইহলোকের কিসের সম্বন্ধ। পরলোকের লোক বলে বড় হয়ে হয়ে গেছে।

উঃ—আত্মিক বলছেন—ওরা বলছে আমি কি করব বল।

৩৬। ওরা একবার গায়ে হাত দিয়া দেখুক না। দিদি ওদের বল আমি যার স্তব পাঠ করলাম, তিনি ভয়ের ও ভয়। ওরা কি ভয় দেখায় আমাকে ?

উঃ—ওরা কারা জানিস ?

৩৭। কারা ওরা ?

উঃ—ওরা আমাদের ঘরে সব দেখাশুনা করে।

(তবে আর একটা স্তব শুন। চক্রপতি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে একটা স্তব পাঠ করিলেন। এবং আত্মিককে গড় করিতে বলিলেন। তখন মিডিয়ম দুই হাত ধীরে ধীরে জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন এবং প্রণাম করিবার পর হাত দুইটি পড়িয়া গেল)।

৩৮। কি দিদি এখন ওরা মারবে মারবে বলছে ?

উঃ—না। চক্রপতি বলিলেন, দিদি এবার নাও দেখি, কেমন করে ওরা তোমাকে নামিয়ে দেয়। ইহলোকের লোকের সঙ্গে একটু কথা কয়েছে, তো কি এমন দোষ হয়েছে, যাতে একজনকে শাসন বা শাস্তি করতে হবে। খুব কানুন যা হক্।

দিদি একটা প্রণাম করছি ;—আশীর্ব্বাদ।

(মনোমোহন বলিল) মা আমি প্রণাম করছি ?

তোরা আর 'মা'টা বলিস্ নি। (আশীর্ব্বাদ)

৩৯। হ্যাঁ আত্মিকের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁদের আমি জোড় হাত করে ভগবানের দোহাই দিয়ে বল্‌ছি যে, তাঁরা যেন এই আত্মিকের (অর্থাৎ দিদির) উপর কোন অত্যাচার পীড়ন না করেন। এই তাঁদের কাছে আমার শেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা।

৪০। হ্যাঁ দিদি ওঁদের বাংলায়,হিন্দিতে, ইংরাজিতে কি সে বললে বুঝবেন ?

উঃ—বাংলায় বুঝবে।

বাংলায় বললাম বুঝলে তো ?

উঃ—হ্যাঁ। (তবে এসো দিদি) বিদায়।

একটি আশ্চর্য ঘটনা। আত্মিককে বিদায় দিবার পরে মিডিয়ম সুস্থ হইয়া বলিলেন যে, চক্রে বসিয়া তিনি আত্মিককে ঠিক মত স্মরণ করিতে পারেন নাই। অর্দ্ধ আবেশ অবস্থায় মিডিয়ম তাহার চারিদিকে বাঘ, ভালুক, সাপ, ইত্যাদি হিংস্র জন্তুদের দেখিতে পায় এবং তার কিছুক্ষণ পরে আত্মিককে দেখিতে পান এবং তার পরক্ষণেই মিডিয়ম সম্পূর্ণভাবে বেহুঁস্ হন।

লেখক সহ-চক্রপতি	চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ		সময় ও মিডিয়ম
২০নং মামা রোড	ফণিভূষণ	আরম্ভ রাত্রি ১০-৩০ মিঃ
ধরমপেট, নাগপুর	মদন (৩১) শিবানী	শেষ „ ১১-১ „
ইং ৮-১০-৫৫		মিডিয়ম—শিবানী দেবী
শনিবার		

১। কে আপনি?

উঃ—সুধীর।

২। দিদি আমি একটা গড় করছি?

উঃ—থাক্। তুই আবার ডাকলি কেন?

৩। মনোমোহনের তর্পণের জল পেয়েছিলেন?

উঃ—হ্যাঁ।

৪। আমার জল?

উঃ—হ্যাঁ। আবার ডাকলি কেন? তোর কথার থাকে না কেন?

৫। আমার ডাকবার কোন দরকার ছিল না দিদি, হয়েছে কি তোমার নাতনি ইরা, নাকছাবির হীরাটা যার দাম ৫৫০৲ টাকা সেটি হারাইয়াছে। দুদিন ধরে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে

পাওয়া যাচ্ছে না। সোনা হীরে কি হারাতে আছে, তাই আপনাকে ডেকেছি। সেটা কোথায় আছে বলে দিন ?

উঃ—তোদের সব বল্‌তে হবে !

৬। হ্যাঁ, বলে দিন না ?

উঃ—(মিডিয়ম এদিক ওদিক একবার ঘাড় ফিরাইল) শেষে বলিলেন ভাঁড়ার ঘরে রয়েছে।

৭। অতবড় ভাঁড়ার ঘরের কোন্‌খান্‌টাতে আছে ?

উঃ—নলের কাছটা খুঁজতে বল।

তৎক্ষণাৎ ভাঁড়ার ঘরের নলের কাছে টর্চ্চ ফেলিলেই হীরাটি পাওয়া গেল)।

৮। মিডিয়ম অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করা হইল এত কাঁপছেন কেন ?

উঃ—দেখনা কি করছে।

৯। কি কর্‌ছে ?

উঃ—দেখ্‌না মারবো মারবো করছে।

১০। বটে,—থাম। চক্রপতি মিডিয়মের গাগে হাত দিয়া একটি কবচ পাঠ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়মের কাঁপা থেমে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কিছু বলছে ?

উঃ—না। দেখ্‌না ঘর ভর্ত্তি এসেছে। দেখ্‌না দাঁড়িয়ে আছে।

১১। দিদি, আমি একটি প্রশ্ন করছি, আমার বই লিখতে গিয়ে একটু আট্‌কেছে।

উঃ—কি বল।

১২। পরলোকবাসী আত্মিক যখন জন্ম নেয়, তখন গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গেই কি গর্ভে আশ্রয় লয়? অথবা কিছুদিন বা কয়েক মাস পরে গর্ভে আশ্রয় লয়?

উঃ—সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রয় লয়।

১৩। আমাদের মৃত্যুর পর পরলোকে যাই; তেমনি পরলোকবাসী আত্মিকের মৃত্যু হইলে,ইহলোকে গর্ভে আশ্রয় লয়, এইটিই কি ঠিক?

উঃ—হ্যাঁ। মনে কর আমি যদি জন্মাই আমি ঠিক সেই সময়েই আশ্রয় নেব। কিছুদিন পরে কি আর আশ্রয় নেব?

১৪। যে সমস্ত আত্মিক আপনার সঙ্গে এসেছেন তাঁরা কিছু বল্‌ছেন?

উঃ—না। তারা দাঁড়িয়ে আছে।

১৫। এই আত্মিকগুলি সঙ্গে আসে কেন?

উঃ—তোরা কি জান্‌বি। যখন এখানে আসবি তখন বুঝতে পার্‌বি।

১৬। দিদি একটা গান শুন্‌বে? খুব ভাল গান। নূতন রেকর্ড আনা হয়েছে।

উঃ—তবে শোনা।

১৭। আপনার সঙ্গে আর আর যাঁরা এসেছেন তাঁদের ঘরেও আমি গান শুন্‌তে অনুরোধ কর্‌ছি।—

(গান আরম্ভ হইল)

গানটি এই :—'যদি ডাকার মত' (বাউল) শ্রীমতী উত্তরা দেবা! রেকর্ড নং G E 7918 Columbia.

চক্রপতি প্রশ্ন করিলেন গানটি কেমন?

উঃ—ভাল।

১৮। তবে আর একটি শুনুন ?
উঃ - শোনা।

রেকর্ডের উল্টো পিঠটা দেওয়া হইল। গানটি এই "হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে"। উত্তরা দেবী।

১৯। আপনার সঙ্গে যে সমস্ত আত্মিক এসেছেন তাঁদের আমি নমস্কার দিচ্ছি। আপনি বলে দিন।
উঃ—হ্যাঁ। (মিডিয়ম একটু মাথা ঘুরাইল)।

২০। আপনি বল্‌লেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

২১। লেখকের পেটে কয়েক দিন থেকে একপ্রকার বেদনা আরম্ভ হয়। লেখক আত্মিকের পৌত্র। লেখক অতি আস্তে আস্তে চক্রপতিকে বলিলেন, আমার যখন পেটটা কন্‌কন্‌ করে, তখন আমি ঠাকুরমাকে ডাকি, ঠাকুমা শুন্‌তে পান ? লেখক এই কথা চক্রপতিকে বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক জবাব দিলেন।
উঃ—হ্যাঁ পাই। তোর মন আর ভাল হবে না।

২২। লেখক বলিল, ঠাকুমা আমার পেটে হাত বুলাইয়া দিন।
উঃ—হাত বুলিয়ে কি করবো ! (মিডিয়ম অজ্ঞান অবস্থায় ডান হাতটি লেখকের পেটে বুলাইয়া দিলেন। তারপর আত্মিককে বিদায় দেওয়া হইল।

লেখক সঃ চক্রপতি	চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস M. A.	শ্রীফণিভূষণ দেব।।

স্থান ও তারিখ
২০ নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ১৫-১০-৫৫
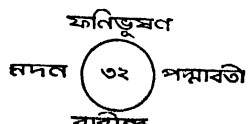
সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃ
মিডিয়ম কেহ হয় নাই।

একটি দীপশিখার আলোকের মত আবির্ভাব।

অদ্যকার চক্রে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মিককে আহ্বান করা হয়। কিছুক্ষণ পরে একটি দীপশিখার মত আলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঘুরিতে থাকে। (এই শিখাটির আকার ঠিক () এইরূপ আকারে দেখা দিয়াছিল)। এবং সেই আলো যেদিকে চক্রপতি বসিয়াছিলেন সেই দিকে যায়। কিন্তু সেই আলোকে চক্রপতিকে দেখা যায় নাই। পরন্তু ইহা ১টি শ্রীকৃষ্ণের ছবির পাশ দিয়া গেলে, তাহাতে প্রতিফলিত হয়। সেই আলোকের তীব্রতা নাই, একটা স্নিগ্ধতা আছে, দেখা গেল। সেই আলোটিকে ৩ জন দেখেন; লেখক এবং আরও ২ জন যাহারা চক্রে বসিয়া ছিল। চক্রপতি তন্ময় ভাবে থাকায় দেখেন না। লেখক যখন এই আলোর কথা বলিলেন, তখন চক্রপতি চক্র বন্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন।

লেখক সঃ চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।
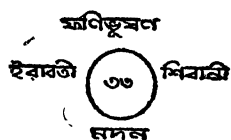
সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮-৪৫
শেষ ,, ৯-২৬ মিঃ
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

(নিম্ন স্তরের আত্মিকগণ কত কষ্ট পান)।

যাহারা ইহজীবনে ভগবৎ চিন্তা না করিয়া, কেবল অর্থ অর্থ করিয়া বিষয়াসক্ত ও ব্যসনাসক্ত, তাঁদের পারলৌকিক জীবন কত দুঃখের।

১। কে আপনি ?

উঃ—'প···ঞ্চা'···। (ভীষণ চীৎকার করিয়া) এবং মিডিয়ম অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিল।

২। পঞ্চা কে ?

উঃ—(জোর গলায়) আঁমাকে···চিন্‌তে পাঁচ্ছেন না। আমি···যে···পঞ্চা সেন। (চীৎকার সহকারে মুখ ভ্যাংচাইয়া)

৩। মুখ·ভেঙ্গচাচ্ছেন্ কেন ? স্থির হয়ে বসুন। তারপর বলিলেন আলো জ্বালবো ?

উঃ—(নাঁকি সুরে) নাঁ—না—।

৪। কোন্ স্তরে আছেন ?

উঃ—স্তর···নয়, কারাগারে। (পরিত্রাহি শব্দে)

৫। এই কারাগার কি খুব ভীষণ ?

উঃ—হ্যাঁ···।

৬। আপনার বাড়ী কোথায় ছিল ?

উঃ—সন্ধিপুরে ছিলঁ (হুগলি জেলায়) এখন কারাগারে (চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

৭। ধীরে ধীরে উত্তর দিন, অত চিৎকার করছেন কেন?
উঃ—ধীরে…বল্‌তে পাচ্ছি নাঁ…।

৮। স্থির হয়ে বস্‌তে পাচ্ছেন না?
উঃ—নাঁ…বস্‌তে পাচ্ছি নাঁ…।

৯। ভগবানের নাম কর্‌তে পারেন না?
উঃ—নাঁ…পারি নাঁ, নাঁ পারি নাঁ…।

১০। চক্রপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, না?
উঃ—হ্যাঁ হচ্ছে…।

১১। কি রোগে মারা গিয়েছিলেন?
উঃ—ম্যানেন্‌জাইটিঁসে।

১২। কত বছর হল মারা গিয়েছেন?
উঃ—দু বছর হলোঁ।

১৩। আপনার সঙ্গে কতজন এসেছেন?
উঃ—অনেঁক এসেছে।

১৪। আপনার কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে?
উঃ—হ্যাঁ।

১৫। আপনি কি দোষে এত কষ্ট পাচ্ছেন?
উঃ—কি করে জানবোঁ, হুঃ হুঃ।

১৬। খুব শাস্তি কচ্ছে নাকি?
উঃ—হ্যাঁ।

১৭। খুব মারে নাকি?
উঃ—হ্যাঁ।

১৮। কি দিয়ে মারে?
উঃ—গদা দিয়ে মারেঁ। (খুব জোরে চিৎকার করিয়া উঠিল।)

১৯। আপনি কি আলোতে আছেন, না অন্ধকারে?
উঃ—অন্ধকা…রেঁ।

২০। আচ্ছা আপনারা এক একটা আলাদা আলাদা ঘরে থাকেন, না—অন্য রকম কিছু ?
উঃ—নাঁঃ—ঘর নয়···মস্ত অন্ধকাঁর জায়গায়···। (টেনে টেনে বলিল)

২১। সেখানে আপনার মত কত আছে ?
উঃ—অনেক। (মিডিয়ম হাত পা খেঁচিতে লাগিল)

২২। স্থির হয়ে বসুন না ?
উঃ—পারছি নাঁ।
(চক্রপতি একটি মন্ত্র পাঠ করিলেন। তারপর আত্মিক কিছুক্ষণ স্থির রহিলেন। খেঁচুনি বন্ধ হইল)

২৩। (গম্ভীর স্বরে জোর গলায় প্রশ্ন করিলেন)—আপনি এলেন কেন ? কে ডাকলে আপনাকে ?
উঃ—বৌদিদি ডাকলে যেঁ। (মিডিয়ম আত্মিকের গ্রাম-সম্পর্কে বৌদিদি হন)।

২৪। (আবার মিডিয়ম বাঁকিতে লাগিলেন)।—ধীর ভাবে বসুন না ?
উঃ—পাচ্ছি নাঁ।

২৫। কষ্ট হচ্ছে ?
উঃ—হ্যাঁ···ওরে বাঁপ রে। (চক্রপতি আবার একটি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথমটি শুনা গেল, "অ উ ম্ ব্রহ্ম"। আত্মিক স্থির হইলেন।)

২৬। আরও কত বছর এ রকম কষ্ট পাবেন ? আপনি কি অনুমান করেন ?
উঃ—জানি নাঁ।

২৭। কেন ?
উঃ—তা কি বল্‌বে তাঁরা ; বলে নাঁ।

২৮। খুব মারে না-কি ?

উঃ—হ্যাঁ…।

২৯। কি দিয়ে মারে ?

উঃ—গ…দা দিয়ে মারে, বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন।

৩০। আচ্ছা আপনাদের শরীর তো নাই, তবে কোথায় মারে ?

উঃ—হুঁ—হুঁ, শরীর আছে বৈঁ কি।

৩১। কি রকম শরীর ?

উঃ—ভীষণ।

৩২। শরীর দেখাতে পারবেন ?

উঃ—হ্যাঁ। বলিয়া, ফের 'না' বলিয়াই, ও—রে বাপরেঁ বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

৩৩। কি হ'লো ?

উঃ—মার্‌বে—মার্‌বে বল্‌ছে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ও—রে বাপ্‌রেঁ। (সে এক অদ্ভুত পরিত্রাহি শব্দ)

চক্রপতি তখন আত্মিকের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, আর আপনার দেরী করিব না, বা প্রশ্ন করিব না। নমস্কার, যান্‌ বিদায় দিলাম।

লেখক সঃ চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস M. A.

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ২৬-৯-৫৬

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৯-১৬ মিঃ
শেষ ,, ১০-১৫ ,,
মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। কে আপনি ?

উঃ—সুধীর।

আলো জ্বালান হইল এবং চক্রপতি আত্মিককে প্রণাম করিলেন। আত্মিক হাত উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

২। হ্যাঁ দিদি, পরশু আমরা চক্রে বসেছিলাম তুমি এসেছিলে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩। তবে তুমি কারো ভিতর প্রবেশ করলে না কেন ?

উঃ—ওরা নিতে পারে না।

৪। মদনের মায়ের যেন আবেশ হবার মত হয়েছিল ?

উঃ—ওদের নেবার শক্তি নেই। ওদের ভেতরে ঢুকলে বা ঢোকবার চেষ্টা করলে ছেড়ে দেয়। চিন্তাধারা অন্য রকম হলে কি করে ঢুকবো ?

৫। বই লেখ্‌বার সময় তুমি আমাকে সাহায্য কর ?

উঃ—তুই ডাক্‌লেই যাই।

৬। বড় দিদি কোন স্তরে আছেন ?

উঃ—তোকে তো বলেছি তার খুব শাস্তি হচ্ছে।

(চক্রপতি,—হবে না, বিষয় বিষয় করে ৮২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভেবেছে।)

৭। বড় দিদি তর্পণের জল পাচ্ছে ?

উঃ—পেয়েছে।

৮। আপনার সঙ্গে কতজন আত্মিক এসেছেন ?

উঃ—অনেক এসেছে।

৯। তাঁদের আমার নমস্কার দিন।
উঃ—(মিডিয়ম বা আত্মিক চুপ ছিল)

১০। বলেছেন ?
উঃ—বলেছি।

১১। যে সমস্ত আত্মিক আপনার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা কি আপনারই স্তরের ?
উঃ—হ্যাঁ।

১২। তাঁরা কার আদেশে আপনার সঙ্গে আসেন ?
উঃ—গুরুর আদেশে।

১৩। কেন আসেন ?
উঃ—ওখানকার কথা বলতে দেবে না।

১৪। এ জগতে পরলোক সম্বন্ধে অনেকেই অবিশ্বাসী, তাদের বিশ্বাস করান যায় কি করে ?
উঃ—অত্যাচার করলেই বিশ্বাস হত।

১৫। আপনার একটা হস্তাক্ষর আমাকে দিয়ে যান, আমার বইয়েতে দেব।
উঃ—কেন তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ?

১৬। আমার জন্যে তো নয়, আমার বিশ্বাস আছে, অন্যের জন্যে।
উঃ—খবরদার, অন্যের জন্যে যা তা প্রশ্ন করতে ডাকবি না।

১৭। (চক্র ঃ ভীষণ ধমক দিয়া)। আপনি বৃথা রাগ করছেন কেন ? আমি নিজের সন্দেহের ভাব নিয়ে তো বলিনি ?
উঃ—কেন তুই আগে অবিশ্বাসের কথা বলেছিস ?

১৮। আহা আমার নিজের কোন অবিশ্বাস নেই। অন্যের জন্যে। আপনার ইহলোকের স্বাক্ষর ও পরলোকের তুটো যে একই—এটা আমি বইয়েতে দেখাতে চাই।
উঃ—কি বললি আগে তুই ?

১৯। ঠিকই বলেছি, আপনি অন্য ভাবে নিয়েছেন।
উঃ—যাঃ, লিখবোনি। ইয়ার্কি পেয়েছিস? ও রকম যা তা প্রশ্ন করবিনি।

২০। আচ্ছা ও কথা যাক্। আমার অন্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন?
উঃ—কিছু বলবোনি, যাঃ। (এই ক্রোধের ভাব দেখিয়া দর্শকগণের ভয়ের উদ্রেক হইল)।

২১। দিদি রাগ করছো কেন? গোটা কত প্রশ্নের উত্তর দাও না?
উঃ—বলেছি বলবোনি কিছু, যাঃ। তুই কি জন্যে ডাকলি? যা তা বলছিস কেন?

২২। দিদি এ বৎসর তর্পণের জল পেয়েছ?
উঃ—বলিনি তোকে? বার বার বলতে হবে নাকি?

২৩। পেয়েছ তাহলে?
উঃ—হ্যাঁ।

২৪। ভোঁদো কি এখন পরলোকে আছে?
উঃ—আছে।

২৫। তার উন্নতি হয়েছে?
উঃ—না।

২৬। তার পতন হয়েছিল জেনেছিলাম।
উঃ—সে তো তোদেরই জন্যে। ডাক্‌লেই মায়া হয়, তাই আস্‌তে হয়। আর মায়াতেই পতন।

চক্রপতি বলিলেন,—সে তো বীরেনের কাছে গিয়েছিল। তাইতো নামিয়ে দিয়েছে। আমাদের দোষ কি!

২৭। আত্মিকরা কি কোন লাইটের রূপ ধারণ করতে পারেন?
উঃ—হ্যাঁ।

২৮। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মিককে আমরা একদিন ডাকি, সেদিন চক্রের অনেকেই একটি লাইট্ (প্রদীপের শিষের মত) ঘরের মধ্যে ঘুরতে দেখে। সে লাইট্‌টি কার?

উঃ—(মিডিয়ম বা আত্মিক একটু মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলেন) সে আমি এসেছিলাম। আমি আলো দেখিয়ে চলে গেলুম। ওদের ঘরে জানিয়ে গেলুম।

২৯। দীবেনের পিছনে কোন দুষ্ট আত্মিক লেগে আছে কি?

উঃ—সেটা তোর দরকার কি? আরে যা আছে, আছে। আগের চাইতে অনেক ভাল হয়েছে কি না?

৩০। ইরার, পূর্ণিমার, দুজনেরই পুত্র হয়েছে আপনি জানেন?

উঃ—হ্যাঁ।

৩১। মদন I. A. পাশ করেছে জানেন?

উঃ—হ্যাঁ। তোদের আগেই জানি।

৩২। মদন B. A. পাশ কর্‌বে?

উঃ—হ্যাঁ।

৩৩। হ্যাঁ দিদি শাস্ত্রে আছে, আমাদের এক বছর, আর আপনাদের এক দিন; সেটা কি সত্য?

উঃ—হ্যাঁ।

৩৪। আপনি এখন কোন স্তরে আছেন?

উঃ—সেই অষ্টম স্তরেই।

৩৫। সেখানে কাজ কি কেবল ভগবৎ চিন্তন?

উঃ—হ্যাঁ। আমরা ওই নিয়েই থাকি।

৩৬। তোমাদের সেখানে সূর্য্য ওঠে? দিন রাত হয়?

উঃ—না। আমাদের দিন রাত নেই।

৩৭। সেখান থেকে পৃথিবীটা কি রকম দেখায় ?

উঃ—ওটা আমরা কিছুই দেখ্‌তে পাই না। হাওয়ার মত দেখায়। একটা কি যেন ঘোলাটে।

৩৮। নক্ষত্রের মত জ্যোতি দেখায় কি না ?

উঃ—না।

৩৯। বড় দিদি কি অন্ধকারেই আছেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

৪০। গত বছর বদরিকাশ্রম যাবার সময়, (বাড়ী থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠবার সময়) শিবানী কি বলেছিল ? (মিডিয়ম গভীর চিন্তার ভাবে থাকিয়া বলিল) আমাকে ? কই মনে হচ্ছে না তো। আমি ছিলাম বটে, কৈ কিছু তো বল্‌লে না। শুধু ছোট বৌ কাঁদছিল। তাকে বল্‌লে কেঁদো না, আর রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে প্রদীপকে বলেছে বদমাইসি করো না। কৈ আর তো কিছু বলেনি।

৪১। আপনার মৃত্যুর সময় অর্থাৎ উৎক্রান্তির সময়, কিরূপ অবস্থা হয়েছিল ?

উঃ—আমার ? (মাথা নাড়িয়া বলিলেন) সেটা তোদের ঘরে বলে কি হবে ?

৪২। কেবল একটি প্রশ্ন, আত্মিক কোন্‌খান দিয়ে বের হয় ?

উঃ—মুখ দিয়ে বেরোয়, চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে, মাথার তেলো দিয়ে, যেখান দিয়ে তোরা বাহ্যে করিস সেখান দিয়ে—কত রকম দিয়ে বেরোয়। আমি কোথা দিয়ে বেরিয়েছিলাম জানিস্‌ ?

৪৩। হ্যাঁ দিদি বলুন না ?

উঃ—চোখ দিয়ে।

৪৪। দিদি কোন্‌খান দিয়ে বেরুলে ভাল ?

উঃ—নিচের দিকে ভাল নয়। মাথার যে কোন স্থান দিয়ে বেরুলেই সদ্গতি হয়।

৪৫। (মনোমোহন) বাবার কোনখান দিয়ে বেরিয়ে ছিল জান মা ?

উঃ—হ্যাঁ, মুখ দিয়ে। আমি তখন উপস্থিত ছিলুম তো।

৪৬। দিদি মৃত্যুর পর কোথায় গেলেন ?

উঃ—আমি বলিনি, কেদারে ছিলাম। (কাশীতে)

৪৭। হ্যাঁ দিদি, আপনার মৃত্যুর পর বা উৎক্রান্তির পর কিরূপ অবস্থা হল ? একটু বলুন না ?

উঃ—আমি বেরিয়ে পড়ে কি রকম ছিনু জানিস,—কচি ছেলের মত। তারপর দেখি, মস্ত বড় হয়ে গেছি।

৪৮। হ্যাঁ দিদি, তখন কোন আবরণ শরীরে ছিল কি ?

উঃ—প্রথমে দেখি কাপড় নেই। তারপর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি কাপড় পরে আছি।

৪৯। তুমি তারপর তোমার মৃত শরীরটা দেখ্‌তে লাগলে ?

উঃ—আমি, না বল্‌বোনি, না আমি আর বলবোনি। (চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তখন মনে হ'ল যেন কতকগুলি আত্মিক তাঁকে বলবার গতিরোধ করছে, এই কথাটার উত্তর দিতে।)

(চক্রপতি মিডিয়মের মাথায় হাত দিয়া কি করিলেন তারপর মিডিয়ম শান্ত হইয়া বসিলেন)।

৫০। আপনার সঙ্গে যে আত্মিকরা এসেছেন তাঁরাকি অত্যাচার করছিলেন ?

উঃ—হ্যাঁ, তোরা আর ডাকিস্ নি বাবু। কেন, তোদের কি বিশ্বাস হয় না ?

৫১। এখন আর কিছু করছেন ওঁরা ?

উঃ—

৫২। দিদি একটু রাবড়ি খাবেন ? এনে রেখেছি ? (কোন জবাব দিলেন না)

৫৩। কিগো দিদি, বলনা ?

উঃ—তোরা তো বলনা বলনা করছিস। আর ওরা তো শাসাচ্ছে। তোরা যা তা করিস নি।

৫৪। হ্যাঁ দিদি, সুকুমার কোথায় ?

উঃ—কে ও ?

৫৫। বাড়ীর একটা চাকর। সে এখন কোথায়, কি করছে, বেঁচে আছে কিনা, আসবে কিনা, তার মার কাছে গেছে কি না ? (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আত্মিক উত্তর দিতেছেন)।

উঃ—হ্যাঁ সে এখন বেঁচে আছে। সে একটা সন্ন্যাসীর কাছে আছে। এবং ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; সে তার মাকে ভুলেই গেছে।

৫৬। মনোমোহন,—মা আমার সব জিনিসে অরুচি হয়ে গেছে কেন, বলুন তো ?

উঃ—তুই রোজ চরণামৃত খাস বাবা।

পুনরায় রাবড়ি খাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

উঃ—কেন ওসব খাওয়া-খায়ির ব্যবস্থা করছিস ?

৫৭। আপনার সঙ্গে যে সমস্ত আত্মিক এসেছেন, তাঁদের অনুরোধ করছি তাঁরাও যেন খান। (দুই বাটি রাবড়ি দেওয়া হইল।)

৫৮। দিদি, তাঁদের খেতে বলেছেন ?
উঃ—হ্যাঁ ওরা খাচ্ছে। (খাবার মত মিডিয়মের মুখ নড়িতে লাগিল।)

৫৯। জল দেব ?
উঃ—না। আমরা ও জল খাই না।

৬০। হ্যাঁ দিদি আতা খাবে ?
উঃ—জানিস তো আমি কি ভালবাসি।

৬১। খেজুরে গুড়ের সন্দেশ ভালবাসতেন।
উঃ—হ্যাঁ—তবে !

৬২। মনোমোহন—আর সন্তান যাতে না হয় তার জন্য প্রশ্ন করিল। কারণ যারা হয়েছে, তারাই ভাল ভাবে মানুষ হয়ে উঠুক। আর না হওয়াই শ্রেয়।
উঃ—সে যদি কপালে থাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। (আত্মিক মুচ্‌কিয়া হাসিলেন।)

৬৩। মনোমোহন—হ্যাঁ মা, দাও না একটা ওষুধ ?
উঃ—বল্‌তে পারি। কি হবে শুনে। এত লোকের সামনে দেব না। শিবানীকে (মিডিয়ম) স্বপ্নে দিয়ে যাব এখন। ইরার জন্যে ওষুধ দিয়েছিনু তার ত পুত্র হয়েছে। ইরা কিসের ওষুধ জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও, আমার নিষেধ ছিল বলে, বলে নি।

৬৪। মা, দাদার অবস্থার বড় পরিহাস এসেছে জানেন ?
উঃ—জানি। আরও হবে।

৬৫। চক্রপতি—শুনেছি সে বাপের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। মনে দুঃখ দিয়েছে ?
উঃ—হ্যাঁ, তারই তো এই ফল ভোগ করছে। আমার সঙ্গেও সদ্‌ব্যবহার করেনি।

৬৬। মনোমোহন—মা, দাদাকে ক্ষমা করুন আপনারা !
উঃ—আমি কি করবো ? আমি করলেও কিছু হবে না।
কর্ম্মফল ভোগ করতেই হবে।

৬৭। মনোমোহন—দুলালের পড়ায় আমি যতটুকু পারি সাহায্য করছি।
উঃ—হ্যাঁ, ছেলে কি করেছে। তুই ছেলেটাকে দেখিস।

৬৮। দিদি একটা গান শুনবে ?
উঃ—আচ্ছা শোনা। আত্মিকের পৌত্রী 'পদ্মাকে' একটি গান গাহিতে বলা হইল। তখন আত্মিক বলিলেন,—পদ্মার কি হল, আর গান গাসনি কেন ?

৬৯। দিদি যেমন এর দোষ হয়েছে দাও কানটা মলে। (মিডিয়ম পদ্মার কাঁধে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন)—এই মেয়েটা, তুই অমন করছিস্ কেন ? মারবো তোকে ? তবে রে মেয়েটা, এই মেয়েটা, মারবো জোরে ? (মনোমোহন, বলিলেন—"না মা মেরো না") আত্মিক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—কিরে তোর মাথা ভাল হয়েছে ? পদ্মা বলিল, হ্যাঁ ঠাকুরমা।

পদ্মার গান শুরু হইল,—

গানটি এই :—

হরি বল্ না সবে ভাই, সে খেলা খেলাই,
যে খেলা খেলিলে জীবের জন্ম মৃত্যু নাই ;
সে খেলা খেলাই।
সংসার বিষয়ানলে, দিবা নিশি হিয়া জ্বলে,
ভেবে দেখ অন্তিম কালে বন্ধু কেহ নাই ;
সে খেলা খেলাই।

খেল না হরিনামের খেলা, চেয়ে দেখ ঐ যায় যে বেলা,
হরির নামে বাঁধ ভেলা, দিন তো বাকি নাই ;
সে খেলা খেলাই।
হরি মাতা, হরি পিতা, হরি জীবের মুক্তিদাতা,
হরি বিনে অন্য কথা, না বলিও ভাই ;
সে খেলা খেলাই।

গান শেষ হইবার পরে আত্মিক বলিলেন ;—আর দেরি করিসনি।

৭০। মনোমোহন—হ্যাঁ মা, সামনের বছর ভাবছি বৌকে নিয়ে আবার বদ্রি কেদার যাই।

আত্মিক উত্তর দিচ্ছেন—এই ছেলেপিলে রেখে, এত তাড়াতাড়ি কেন? যাবি এখন।

৭১। মা, বয়েস হয়ে যাবে, তখন কি আর যেতে পারবো?
উঃ—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুই কোন্ হেঁটে গেছিস্। ঘোড়ায় চেপে তো যাবি।

সকলের প্রণাম, তখন আত্মিক কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, থাক্ না বাবু। তোরা থাক। ঐ তো তোদের দোষ। মায়া আর বাড়াস্নি। মায়াতে আমাদের বড় কষ্ট পেতে হয়।

(মনোমোহনের জামাতার প্রণাম) তখন আত্মিক বিরক্তি ভাবে বলিলেন, ওরতো কিছুই বিশ্বাস নেই। যাঃ।

৭২। ওকে বিশ্বাস করবার একটা ব্যবস্থা করে দিন্ না?
উঃ—আমি করতে পারি, কিন্তু করব না, ভয় পাবে।

৭৩। মনোমোহন—মা ছোট বৌকে একটু শক্তি দাও না, যাতে ও তোমাকে নিতে পারে?
উঃ—দিলে কি হবে। বন্ধ করে দেয়। এখানে কারো শক্তি নেই।

৭৪। মা আমার তো দেহটা কাঁপছিল। আত্মিক বলছেন, তোর কাছে তো গেলুম ; তুই নিতে পারলি কৈ ?

৭৫। মদন (সঃ চক্রপতি) ঠাকুমা, তুমি তো আমার কাছে কখনই আস না ?

উঃ—আহা তুমি যা ডাক না ! তুমি একটি তেল কাত্তিক।

৭৬। অরবিন্দ—ঠাকুমা আমি সকালে প্রণাম করি তুমি পাও ?

উঃ—কর, আবার এক একদিন ভুলেও যাও।

৭৭। মনোমোহন—আমি তো রোজ প্রণাম করি।

উঃ—হ্যাঁ, তুই রোজ প্রণাম করিস !

৭৮। মদন—আমিও তো করি ঠাকুমা।

উঃ—হ্যাঁ, তুমি আজকাল কর।

৭৯। মনোমোহন—মা বারীন ম্যাট্রিক পাশ করবে ?

উঃ—হুঁ।

৮০। অরবিন্দ—ঠাকুরমা আমি ?

উঃ—হুঁ—তুমিও পাশ করবে ; শুধু শুয়ে থাকবি, তাহলেই পাশ করবি। আমি রোজ ভোর বেলায় ডেকে দিই তবুও উঠিস না।

৮১। বারীন—ঠাকুমা কটার সময় ডাকেন ?

উঃ—কটা টটা জানি না। তোদের ভোর বেলায় ডাকি। আমাদের ও সব নেই। (এই আত্মিক যেখানে থাকেন সেখানে সকাল সন্ধ্যা কিছুই নাই। মাত্র একটা প্রকাশ আছে) আর দেরী করিস নি।

(চক্রপতি বহুক্ষণ ক্ষুণ্নমনে বসিয়াছিলেন তারপর বলিলেন)।

৮২। যাবেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

চক্রপতি প্রণাম করিলেন। আত্মিক হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, থাক থাক। তুই মাথা গরম করে দিলি। আমি সব করতুম। সইও করতুম।

৮৩। পদ্মাবতী—ঠাকুমা, আমি সেতার শিখতে পারবো ?

উঃ—আবার ঠাকুমা ? সবই শিখ্‌ছিস। খালি লাফাস্।

৮৪। দিদি, সইটা করলে কোন ক্ষতি আছে ?

উঃ—না। তবে যা বলেছি তা করব। ছেলেমানুষি করিস না।

আচ্ছা দিদি, এবার আপনি যান্। নমস্কার। আত্মিক চলিয়া গেলেন। তারপরে পদ্মা প্রশ্ন করিল, কোন উত্তর নাই। চলিয়া গিয়াছেন।

লেখক সঃ চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব

স্থান ও তারিখ		সময় ও মিডিয়ম
২০নং মামা রোড		আরম্ভ রাত্রি ৯-৩২ মিঃ
ধরমপেট, নাগপুর		শেষ „ ১০-৬ „
ইং ৩০-১০-৫৬		মিডিয়াম—শিবানী দেবী

আত্মিক যখন মিডিয়মের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন চক্রপতি পরম পিতা পরমেশ্বর ভূতনাথকে স্মরণ করিয়া আত্মিককে বিনীত-ভাবে প্রশ্ন করিলেন।—

১। কে আপনি?

উঃ—সুধীর।

চক্রপতি আত্মিককে সশ্রদ্ধ নমস্কার কারলেন। আত্মিক বলিলেন, আবার ডাক্‌লি কেন?

আমি আপনাকে তো ঠিক ডাকিনি। ভোঁদোকে চিন্তা করে-ছিলাম। মিডিয়ম আপনাকে ডেকেছে মনে হয়?

উঃ—হ্যাঁ।

২। যে ওষুধটা আপনি শিবানীকে স্বপ্নে দিয়েছিলেন সেটা ঠিক? আপনিই দিয়াছিলেন কি?

উঃ—হ্যাঁ।

৩। তিন চার দিন ধরে প্রদীপ রায় চৌধুরী তার দাদুকে আন্‌বার জন্য চেষ্টা করেছে, তার দাদু চক্রে এসেছিলেন কি?

উঃ—হ্যাঁ।

৪। তিনি কারো ভিতর ঢুক্‌লেন না কেন?

উঃ—বোধহয় ঢোক্‌বার তিনি সুযোগ পাননি।

৫। প্রদীপের সাইটিকা হয়েছে, সেটা ভাল হবার কোন ব্যবস্থা করে দেবেন কি?

উঃ—তোরা বুঝি খালি ওই জন্যেই ডাকিস?

৬। আপনার সঙ্গে কতজন আত্মিক এসেছেন ?
উঃ—অনেক, ৫ জন।

৭। তাঁদের আমার নমস্কার দিন। নমস্কার দিলেন ?
উঃ—হুঁ।

৮। দিদি আতা একটু খাবেন ?
উঃ—তুই খালি খালি ডাকিস কেন ?

৯। দিদি আমি কি তোমাকে চিন্তা করেছি ?
উঃ—না। তুই বলেছিস তো। খালি খালি ডাকিস নি।

১০। তুমি যখন বক দিদি, আমার তখন বড্ড ভয় করে। এ জগতে যখন ছিলে তখনও করতো আর এখন তো করেই। আমি কি কর্‌ব বল ? এদের ইচ্ছে হ'ল, তাই ডাকা হ'ল।
উঃ—তোকে বলেছি খালি খালি ডাকিস নি। তোদের খালি এর ইচ্ছে ওর ইচ্ছে।—না দিদি এখন আর এক বছর ডাক্‌বো নি।

১১। গতকাল গান্ধী জয়ন্তীতে আমাদের হেথায় অনেক কিছু প্রোগ্রাম ছিল। আপনাদের ওখানে কি হল ? কিছু হয়েছিল কি ?
উঃ—হুঁ, হয়েছিল।

১২। তিনি কি অনেক উচ্চ স্তরে থাকেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

১৩। মধ্যে মধ্যে আপনাদের স্তরে আসেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

১৪। সেখানে কি রকম হল বল.না দিদি ?
উঃ—সবাই মিলে পুজো করতে লাগলো। কে, প্রদীপ কে ?

১৫। যে বদরিকাশ্রম যাবার সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিল।

উঃ—ও,—প্রদীপ বলতে আমি ভেবেছি আমাদের প্রদীপ বুঝি। তার আবার কি সাইটিকা হবে? সে তো বছর আষ্টেকের।

১৬। দেখ না ওই তো সাম্‌নে বসে আছে?

উঃ—দেখেছি। ওর বিশ্বাস আছে?

(প্রদীপ রায় চৌধুরী বলিল "আমার বিশ্বাস আছে।")।

ওষুধ মষুধ দোবনি। হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। যদি বিশ্বাস থাকে তো দেখ।

প্রদীপ মিডিয়মের কাছে গিয়া মাথা নত করিল, মিডিয়ম সেই অজ্ঞান অবস্থায় হাত উঠাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বলিলেন "তোর পা-টা দেখি নারে"। প্রদীপ পা টা উঠাইয়া দেখাইল, তখন মিডিয়ম পায়ে হাত বুলাইয়া একটি ফুঁ দিলেন, এবং বলিলেন, ভাল হয়ে গেছিস, যা।

১৭। মনোমোহন—মা বারিনের ও রবির গাময় ছুলি হয়েছে। তার কিছু একটা ঔষধপত্র দাও না?

উঃ—তোরা আমাকে ডাক্তার পেয়েছিস নাকি! বল্ দিকিনি। (এই সময় চক্রপত্তি মিডিয়মের কপালে চন্দন দিতেছিলেন)।

১৮। মনোমোহন—তুমি কি আমাদের কখনও ডাক্তার দেখিয়েছ? যা করেন বাবা তারকনাথ। তুমি ডাক্তার নাতো কি মা?

উঃ—হুঁ, সেই তো বলি। আর দেরী করিসনি কিন্তু। ওই চন্দনটা মাখাস ভাল হয়ে যাবে।

১৯। কোন্ চন্দনটা ? কপালের ?
উঃ—হুঁ, সেটা তো আমাকে মাখালি ; ওটা মাখাস, ভাল হয়ে যাবে।

২০। দিদি একটু আতা খাবে না ?
উঃ—কেন খাও খাও করিস সব ?

২১। খাও না দিদি। আর তোমার সঙ্গে যে সমস্ত আত্মিক এসেছেন তাঁদেরও খেতে বল। (সন্দেশ ও আতা পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হইল, মিডিয়ম মুখ নাড়িতে লাগিলেন)।

২২। মনোমোহন—মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?
উঃ—কি জিজ্ঞাসা কর্‌বি ? তোরা খালি খালি যা তা করিসনি।

২৩। মা আমার পুরানো কুষ্ঠিটা ছিঁড়ে গেছে। সেইজন্য একটি নূতন কুষ্ঠি তৈরী করেছি। তাতে ৬০ বছরে আমার একটি ফাঁড়া আছে, সেটা কাটবে না মা ?
উঃ—হ্যাঁ—কাট্‌বে।

২৪। মনোমোহন—হ্যাঁ মা, কি করলে কাটবে ?
উঃ—সেই সময় কাশীতে গিয়ে থাক্‌বি, আর শিব স্বস্ত্যয়ন কর্‌বি। মৃত্যুঞ্জয় শিবের স্বস্ত্যয়ন কর্‌বি।

২৫। মা, এক বছর সেখানে থাক্‌তে হবে কি ?
উঃ—হ্যাঁ, থাক্‌তে পারিস। (চক্রপতি—শিবানীকে সেখানে নিয়ে গিয়ে চক্রে তোমাকে ডাক্‌বো এবং তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌বো)।

২৬। আচ্ছা দিদি,—(প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্ব্বেই আত্মিক বলিলেন) আর দেরী করিস্ নি। শুন্‌বো কি, ওরা জ্বালাতন করছে যে।

২৭। মনোমোহন—মা, গয়াতে গিয়ে মাসির একটা পিণ্ডি দিয়ে আসবো? মা আর মাসি তো আলাদা নয়। তুমি যদি আদেশ কর তো আমি দিয়ে আসি?

উঃ—হ্যাঁ দিয়ে আয়। প্রেতশিলায় দিলেই ভাল হয়। ওঃ, তার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি তো।

২৮। মনোমোহন—হ্যাঁ মা, বামুন মাসি পরলোকে কেমন আছেন?

উঃ—কোন্ বামুন মাসি?

২৯। সেই যে গো মা তোমার মৃত্যুর সময় গীতা পড়ে শুনিয়েছিল?

উঃ—ও...তারও খুব কষ্ট হচ্ছে। তাকেও একটা পিণ্ডি দিস্। সেও কষ্ট পাচ্ছে। তাকে বিষ্ণু পাদপদ্মে দিস্।

৩০। তা হলে মাসিকে প্রেতশিলায়?

উঃ—হ্যাঁ, ও খালি বিষয় বিষয় করে মরেছে। তাই অত কষ্ট।

(চক্রপতি—ঠিক বলেছ দিদি, ঠিক বলেছ। তাকে আমি বলেও সাবধান করতে পারিনি। ৮২ বছর বয়স পর্য্যন্ত বিষয় চিন্তা, না পূজা পাঠ, না কিছু—হবে নি?)।

(আত্মিক বলিতে লাগিলেন) আমি বল্‌বোনি আর কিছু। আমি বলবোনি আর কিছু। (মিডিয়ম কাঁপিতে লাগিল, যেন কেহ আত্মিককে বলিতে বাধা দিতেছেন। চক্রপতি—মিডিয়মের হাত ধরিয়া কি করিলেন যেন, তাহাতে মিঃ স্থির হইয়া গেলেন)।

৩১। দিদি একটা গান শুনুন।—

রেকর্ড লাগান হইল। 'শ্যামা আমার নীরব কেন মা।' রেকর্ড নং N.27585. H.M.V. (গায়ক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ) (আত্মিক স্থির ভাবে বসিয়া গান শুনিলেন)।

৩২। মদনমোহন—ঠাকুমা একটা কথা বলি ?

উঃ—তোর আবার কি কথা আছে ?

৩৩। রাগ কর্‌বেন না বলুন তাহলে বলছি।

উঃ—বল্‌না।

৩৪। একটা আপনার সই দিন।

উঃ—আবার তুই ধরেছিস্‌ ! আমি সব বুঝি। যা বলেছি তা করবো। সই করবো না।

(চক্রপতি, সঃ চক্রপতি দ্বারা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন)।

৩৫। দিদি, তুমি আমাকে বই লেখাতে সাহায্য করবে বলেছিলে ?

উঃ—কেন আমি আসিনি ? সাহায্য করিনি ?

৩৬। হ্যাঁ, আপনি আসেন এবং কঠিন কঠিন বিষয়ের সমাধান হয় তা আমি বুঝতে পারি।

উঃ—তবে আমি যেচে আস্‌বো নাকি ?

৩৭। না-না আমি আশ্রমে ডাকি যখন, তখন আসেন।

উঃ—তবে আবার অবিশ্বাস করিস কেন ?

৩৮। বাঃ—আমি পরলোক সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ? দিদি তোমার কিন্তু একটা সই আমার কাছে আছে। সেই কাশীতে করেছিলে। মৃত্যুর পর যখন প্রথম ডাকি।

উঃ—সে জানি।

৩৯। সেটা দিদি বড্ড বড় সই ; তবে এখন ছোট করে চাই। হ্যাঁ দিদি, তোমার সইটা আমি বইতে ছাপতে চাই।

উঃ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর দিদির সই সব দেখবে, যত সব !

৪০। হ্যাঁ দিদি, যে সমস্ত আত্মিক আপনার সঙ্গে এসেছেন তাঁরা সকলে বেটাছেলে না মেয়েছেলে ?

উঃ—অত সব তোর জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই।

৪১। দিদি, আপনার সঙ্গে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের আমি নমস্কার দিচ্ছি। জানালেন ?

উঃ—হ্যাঁ। মিডিয়মের পায়ে হাত দিয়া আত্মিককে প্রণাম করিতে যাইলে, আত্মিক বলিলেন—থাক্ বাবা থাক্। ওইতো তোদের দোষ। মায়া বাড়ে।

সকলে আত্মিককে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

৪২। আচ্ছা দিদি এখন আসুন।—(আত্মিক তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে মিডিয়ম তাহার নিজের নাম বলিতে সক্ষম হইলেন)।

লেখক সঃ চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস M.A.

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
২০নং মামা রোড
ধরমপেট, নাগপুর
ইং ২৯-৬-৫৭

সময় ও মিডিয়াম
আরম্ভ রাত্রি ৯-৪০ মিঃ
শেষ ,, ১০-২২ ,,
মিডিয়াম—শিবানী দেবী

১। কে আপনি ?

উঃ—আমি।

২। আমি কে ?

উঃ—সুধীর।

৩। ও দিদি, প্রণাম করছি।

উঃ—থাক্, থাক্।

(আলো জ্বালান হইল)

৪। হ্যাঁ দিদি, বড়দিদিকে প্রেতশিলায় পিণ্ড দিবার পর, তাঁর কিছু উন্নতি হয়েছে ?

উঃ—সে জন্মে গেছে।

৫। মনোমোহন,—বামুন মাসির কি হল মা ?

উঃ—সেও জন্মে গেছে।

৬। মা, এবারে কাশী থেকে তোমার ঠাকুরগুলো নিয়ে এসেছি জান ?

উঃ—হ্যাঁ।

৭। হ্যাঁ মা, ঠাকুরগুলো তো দেওয়ালে সিমেণ্ট দিয়ে আঁটা ছিল, খুলে দিলে কে ?

উঃ—আমি। ছোট বৌয়ের বড্ড ইচ্ছা ছিল, তাই খুলে দিয়েছি।

৮। মা, ছোট বৌয়ের কোন ইষ্টদেবতা নেই, এইটিই তো ওর ইষ্টদেবতা ?

উঃ—হ্যাঁ। আমার শরীর ভাল নেই।

৯। চক্রপতি—আপনার শরীর খারাপ ?

উঃ—হ্যাঁ।

১০। কি, কোন রকম ব্যারাম হয়েছে নাকি ? যেমন জ্বর-টর্ ?

উঃ—হ্যাঁ, অন্য কিছু হয়নি। উঠ্‌বার শক্তি থাকে না। তোরা খালি খালি ডাকিস কেন ?

১১। কেন দিদি, এক বৎসর পরে ডাকলাম ত ?

উঃ—কৈ এক বছর হয়েছে।

১২। হ্যাঁ ঠিক বলেছ এক বছর হয়নি। ১০ মাস হয়েছে মাত্র।

উঃ—তবে ! তোর খালি ওই।

১৩। দিদি, আমি তো এবারে নিমোনিয়া ব্যারামে মরে গিয়েছিনু আর কি ?

উঃ—কেন মরবি। তুই মনে করছিস এখানে এলে খুব ভাল বুঝি ?

১৪। মনোমোহন,—মা এবার শিবানী তো (মিডিয়ম) একেবারে মর মর হয়ে গিয়েছিল ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৫। মা, শিবানীর কাছে কে এসেছিল বল্‌তে পার ?

উঃ—অনেকে এসেছিল। আমিও এসেছিনু।

১৬। শিবানীর ফাঁড়া কেটে গেছে তো মা ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৭। চক্রপতি—দিদি, গয়ায় ফল্‌গু নদীর ধারে যখন মনোমোহন পিণ্ড দিচ্ছিল তখন তুমি ছিলে ? ওই যেখানেতে পিণ্ড দিতে দিতে মনোমোহন এবং আমি, মন্ত্রের মর্ম্ম বুঝে দুজনেই কেঁদে ফেললাম।

উঃ—হ্যাঁ ছিলাম। আমি ছিনু, দিদি ছিল, বামুন দিদি ছিল।

১৮। মনোমোহন—মা, প্রেতশিলায় যখন পিণ্ড দিই তখন ছিলে ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৯। মা, আজ রথের দিন আপনাকে ডেকেছি কিছু মিষ্টি মুখ করে যেতে হবে।

উঃ—(কোন উত্তর দিলেন না)।

২০। মনোমোহন—মা, বড়দা এসেছে জান ?

উঃ—হ্যাঁ।

২১। দাদার শরীর বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, না মা ?

উঃ—হ্যাঁ।

২২। দাদার আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে গেছে।
উঃ—হ্যাঁ।

২৩। দাদার ছেলেটা খুব ভাল হল না মা। বাপ্‌কে একেবারে ভক্তি করে না।

উঃ—হ্যাঁ জানি, যেমন বাপ্‌ তেম্‌নি ছেলে।

২৪। হ্যাঁ মা, বড় বৌয়ের কাছে অনেক টাকাকড়ি ছিল কিছু আছে নাকি ?

উঃ—না।

২৫। সব গেছে ?

উঃ—হ্যাঁ। বল্‌ছি আমার শরীরটা ভাল নেই, খালি বাজে কথা।

২৬। চক্রপতি—হ্যাঁ দিদি, তোমার সঙ্গে কত আত্মিক এসেছেন ?

উঃ—অনেক, এক ঘর।

২৭। তাঁদের তো আর আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তাঁদের আমার নমস্কার দিয়ে দিন ?

উঃ—তাদের করলেই জান্‌তে পার্‌বে।

২৮। (এবারে আত্মিককে একটি পাথরের বাটিতে কিছু সন্দেশ, রসগোল্লা, একটি খোরাতে কিছু ন্যাংড়া আম, কাঁটাল ইত্যাদি দেওয়া হইল)। (আত্মিক বলিলেন) আমায় কেন খেতে দিচ্ছিস ?

(আত্মিককে খাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল) (আত্মিক মুখ নাড়িতে লাগিলেন) তারপর বলিলেন,—আজ আমার খেতে ভাল লাগ্‌ছে না। আর খাবনি।

২৯। মনোমোহন—জল ?

উঃ—না। আর ভাল লাগে না। আর গন্ধ ভাল লাগে না।

(পদ্মা হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল)

আত্মিক ধীরভাবে বসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন।

৩০। মনোমোহন—মা, তোমার ঠাকুরের সেবা ঠিক হচ্ছে তো ?

উঃ—হ্যাঁ। আমাকে মরণকালে বল্‌লে ঠাকুরটা কি কর্‌বো ? আমি বল্‌লাম ফেলে দিস। তা ওরা গঙ্গায় ফেলেই দিলে।

৩১। মনোমোহন—ঠাকুরগুলো মেজদির আত্মিক তুলে এনে গাছের গোড়ায় রেখে দেয়।

উঃ—হ্যাঁ।

৩২। মা তোমার ঠাকুরের সেবার কোনরূপ ত্রুটি হচ্ছে না তো ?

উঃ—না, না, ওর সেবা আর কি। গঙ্গাজল আর বেল-পাতা। ওর সেবা আর কিছু নয়।

৩৩। নারায়ণের সেবা ঠিক হচ্ছে তো ?

উঃ—হ্যাঁ। এনে খুব ভাল করেছিস্।

৩৪। হ্যাঁ মা, ছোট মামার (চক্রপতি) নান্টু নামে একটি ছেলে দিল্লীতে পালিয়ে গেছে, সে কেমন আছে ?

উঃ—(কিছুক্ষণ চুপ্‌ থাকিবার পর) সে খুব আনন্দে আছে।

৩৫। পদ্মার গান শুনলে দিদি ?

উঃ—হ্যাঁ।

৩৬। হ্যাঁ দিদি, মা কত বড়টা হয়েছে ?

উঃ—তোর ঐ কথা। তোর জেনে কি হবে ?

৩৭। দিদি, তুমি ঠিকানা তো বলবেই না, কত বড়টা হয়েছে বল না ?

উঃ—তোর সঙ্গে কি পরিচয় হবে ? যত বড়টাই হক্ না কেন—তোর তাতে কি হবে ?

৩৮। দেখতে বড় ইচ্ছা হয়।

উঃ—দেখে কি হবে ? তোর মা ? তবে ?

৩৯। মনোমোহন—হ্যাঁ মা, শিবানীকে যে বুবুর (শুভ্রা) জন্যে টন্‌সিলের ওষুধ দিয়ে গেছ, সেটা অন্য কাকেও শিবানী দিলে ভাল হবে ?

উঃ—হ্যাঁ। ওর মনে আছে তো।

৪০। (সকলে প্রণাম করিতে লাগিল) আত্মিক বলিতেছেন,—আর তোরা জ্বালাতন করিস কেন ? ছেড়ে দে। (আত্মিক কাঁদিতে লাগিলেন) না-না আমি আর থাক্‌তে চাই না।

৪১। ভবানী দেবী (চক্রপতির স্ত্রী) উঠিয়া প্রণাম করিতে গেলে আত্মিক বলিলেন, ছোট বৌ, কবে এলি ?

মনোমোহন,—এই ৩।৪ দিন এসেছেন।

৪২। যাহারা বাকী ছিল তাহারা প্রণাম করিতে যাইলে, আত্মিক বলিলেন, আর নয়। এসব কি করিস। আর এত মায়া বাড়াস কেন ? থাক্ থাক্। (আত্মিকের চোখে জল পড়িল)।

৪৩। মনোমোহনের প্রণাম,—

উঃ—একশো বার কেন ? তোরা এমনি করলে কি হয় না ?

৪৪। চক্রপতি—দিদি তর্পণের সময় তোমাকে কিন্তু একবার ডাক্‌বো ?

উঃ—কেন ? কেন ?

মনোমোহন—মা জল কেমন পেলে, একবার ডেকে জেনে নোবোনি। (কোন উত্তর নাই)

৪৫। চক্রপতি—বিদায় দিবার পূর্ব্বে প্রণাম করছি। আত্মিক, একশো বার কেন ? থাক্ ; আর থাক্।

এবার যান দিদি, শরীরটাও খারাপ, রাতও অনেক হল।

লেখক সঃ চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস M. A.

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
ডাঃ রমেন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী
গল্‌গলা
জব্বলপুর (মধ্যপ্রদেশ)
ইং ১৭-১০-৫৭

তরুণসরকার
প্রতিভাদেবী
ফণিভূষণ
৩৭
প্রমীলাদেবী
রমেন্দ্রবিশ্বাস
তারাদেবী

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ ... ...
শেষ রাত্রি ১০টা
মিডিয়ম—
শ্রীমতী প্রমীলা দেবী
(আগত আত্মিকের কন্যা)

১। কে আপনি ?

উঃ—অশ্বিনী। (ইনি মধ্যপ্রদেশের চিরমিরিতে থাকিতেন)

২। আপনি কিসে মারা যান্ ?

উঃ—জ্বরে।

৩। আপনি আলোকে না অন্ধকারে ?

উঃ—আলোকে।

৪। আলো জ্বালাবো ?

উঃ—হ্যাঁ।

৫। কোন্ স্তরে আছেন ?

উঃ—উত্তরে।

৬। সেখানে সূর্য্য আছেন ?

উঃ—হ্যাঁ, আছে।

৭। চন্দ্র আছেন ?

উঃ—না। (মনে হয় ইনি চন্দ্রলোকে আছেন তজ্জন্য চন্দ্র দেখিতে পান না)

৮। আপনাকে কি করতে হয় ?

উঃ—পূজা।

৯। কখন পূজা করতে হয় ?

উঃ—সকালে ও সন্ধ্যায়।

১০। কি করলে আত্মিকের উন্নতি হয় ?

উঃ—ভগবানের পূজা করলে।

১১। আপনার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে না ?

উঃ—হ্যাঁ।

১২। তার বিবাহ কোথায় হবে বলতে পারেন ?

উঃ—ভাল জায়গায়।

১৩। চক্রে নগরবাসী বিশ্বাসের আত্মিক এসেছিলেন কি ?

উঃ—না।

(নগরবাসী বিশ্বাস একমাস পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন)

১৪। আপনার বড় মেয়ে মারা গেছেন, তার সঙ্গে দেখা হয় ?

উঃ—না।

১৫। পরলোকে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক ভাবে থাকেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৬। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

উঃ—কথায় কিছু বলিলেন না, মাত্র মিডিয়ম ছুটি হাত তুলিয়া প্রতি নমস্কার দিলেন। তৎপরে আত্মিককে বিদায় দেওয়া হইল। (প্রশ্ন করিলে আর উত্তর পাওয়া গেল না।)

লেখক চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।
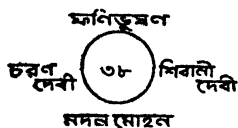
স্থান ও তারিখ	ফনিভূষণ	সময় ও মিডিয়ম
২০নং মামা রোড	চরণ দেবী (৩৮) শিবানী দেবী	আরম্ভ রাত্রি ৯-৩০ মিঃ
ধরমপেট, নাগপুর		শেষ ,, ১০-১৭ ,,
ইং ২-১২-৫৭	মদনমোহন	মিডিয়ম—শিবানী দেবী

১। কে আপনি ?

উঃ—সুধীর। কেন ডাকলি আমাকে ?

(আলো জ্বালান হইল)

২। কে, দিদি এসেছেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

নমস্কার দিদি। দিদি একটু মিষ্টি মুখ করুন ?

উঃ—কেন মিষ্টি দিচ্ছিস্। আমি খাবনি।

(২টি প্লেটে, ৮টি করিয়া খেজুরে গুড়ের সন্দেশ টেবিলে রাখা হইল)

৩। নিন্ দিদি, আপনি খেজুরে গুড়ের সন্দেশ ভালবাসতেন, তাই খেজুরে গুড়ের সন্দেশ দিয়েছে।

উঃ—এখনও কি আমি সন্দেশ ভালবাসি ?

(একটু প্রসাদ তো করে দিন দিদি)

আপনার সহিত যে সব আত্মিকরা এসেছেন তাঁদেরও খেতে বলুন। ২টি প্লেটের একটি প্লেটে তাঁদের জন্য।

৪। তাঁরা খাচ্ছেন তো ?

উঃ—হুঁ।

৫। জল খাবেন ?

উঃ—আমি জল খাই না।

৬। খাওয়া হয়ে গেলে বলবেন ?

উঃ—আর খাবনি।

৭। তাঁরা খেয়েছেন ?

উঃ—খেয়েছে।

এবার দিদি ২।১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।

৮। মদন B.A. পরীক্ষা দিচ্ছে এবং বিবেক M. A. পরীক্ষা দিচ্ছে, এদের পরীক্ষার ফল কি অনুমান করেন ?

উঃ—বার বার এক কথা জিজ্ঞেস কারস কেন ? বলিনি পাশ করবে। (দুইজনেই পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিল)।

৯। পরলোক সম্বন্ধে আমার বই লেখা প্রায়শেষ হয়ে এসেছে, এইবার মৃত্যু সম্বন্ধে লিখবো, তারই গুটিকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, দয়া করে উত্তর দিবেন ?

উঃ—তোর ঐ সব। কি বল।

১০। মরবার পূর্ব্বে কি সুষুপ্তি ভাব আসে ?

উঃ—হ্যাঁ।

১১। তারপর দিব্য চক্ষু কি খুলে যায় ?

উঃ—হ্যাঁ।

১২। মৃত্যুর পর কি বিদেহী দেখেন বা বুঝিতে পারেন, তাকে কে কে লইতে আসিয়াছেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৩। মৃত্যুকালে কান্নাকাটি করা কি উচিত হয় ?

উঃ—সে কি আর কেও শোনে ভাই। উচিত তো নয়। কে শোনে !

১৪। মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করিলে আত্মিকের কষ্ট হয় তো ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৫। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে কোন যন্ত্রণা থাকে কি না ?

উঃ—না। কোন অনুভব করা যায় না।

১৬। আপনি জানেন, আমার ২৫ বৎসর বয়সে সেই মরণাপন্ন ব্যারামে, শেষ নাভিশ্বাসের পর, আমার কর্ণেন্দ্রিয় ছাড়া সকল ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া যায়। তাহাতে আমার মৃত্যু হয় নাই, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত কি হয় তাহা জানিনা। এখন প্রশ্ন এই, কর্ণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় কিনা ?

উঃ—আমার তো ঠিকই ছিল।

১৭। বেদব্যাসের লেখা বেদান্ত দর্শনে লেখা আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি সম্পিণ্ডীত হয়, তার পরক্ষণেই সূক্ষ্ম শরীর লইয়া উৎক্রমণ হয়, কি রকম হয় বলুন না ?

উঃ—এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিস্ কেন ?

১৮। দর্শনেতে লেখা আছে, সেইজন্য কি রকম হয় জানতে চাইছি ?

উঃ—সে শরীর যখন যায়, কি করে বল্‌বো তোকে। কি করে তোকে বোঝাব।

১৯। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ইত্যাদি সব নিয়ে তবে উৎক্রমণ হয়, না কি রকম ?

উঃ—সে সব চলে যায় আগে। তারপর আত্মা বেরিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

২০। উৎক্রমণের পরই 'আত্মা' মন, বুদ্ধি, চিত্ত ইত্যাদিকে অবলম্বন করেন, তাই না ?

উঃ—হ্যাঁ।

২১। এই সব জগতে কে কতদিন বেঁচে থাকবে, পরলোকবাসী তা বল্‌তে পারেন কি ?

উঃ—কেন ? না। শক্তি থাকলেও বল্‌বো না।

২২। যাক্, ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, মৃত্যুর পর তিন রকম গতি হয়, এক হয় ভূবর্লোকে, এক হয় চন্দ্রলোকে, আর এক হয় সাধুসজ্জনদের উত্তরায়ণ পথে। ইহা কি ঠিক ?
উঃ—হ্যাঁ।

৩৮নং চক্রের বিবরণ

২৩। আমরা পৃথিবী হইতে বহু নক্ষত্র দেখি, আপনারা পৃথিবীকে দূর হইতে কিরূপ দেখেন ?
উঃ—এসব বল্‌বো না।

২৪। আমি তো আপনাদের জগতের কথা জিজ্ঞাসা করছি না। আমাদের জগৎকে আপনারা কিরূপ দেখেন ?
উঃ—ওসব বল্‌বো না, বল্‌বো না।
(মিডিয়মের হাত কাঁপিতে লাগিল, এবং মুখ বাঁকিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল যেন কিছু কষ্ট হইতেছে।) চক্রপতি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মিডিয়মের গায়ে হাত দিয়া মনে মনে কিছু মন্ত্র পাঠ করিলেন। মিডিয়ম শান্ত হইল। তখন আত্মিক বলিতে লাগিলেন, দেখতে পাচ্ছিস না, কি রকম শাস্তি করছে আমাকে !
তা বুঝেছি,—এই সামান্য প্রশ্নে তাঁরা যদি আপনাকে শাস্তি করেন, তাহলে তাঁদের অন্যায়। আত্মিক বলিলেন —সব বলে দিলে তো তোরা সব জেনে যাবি। এটা এদের ইচ্ছা নয়।

২৫। মনোমোহন—হ্যাঁ মা, মাসি জন্মে গেছেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

২৬ মনোমোহন—মেয়েছেলে হয়ে না বেটাছেলে হয়ে ?
উঃ—মেয়েছেলে। সে কি এমন কাজ করেছে যে, বেটাছেলে হবে।

২৭। মনোমোহন—দেখতে কেমন হয়েছে? ভালো তো?
উঃ—তা হবে না কেন?

২৮। চক্রপতি—এ জন্মে যারা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন, তারা পর জন্মে কি পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হন?
উঃ—তার কোন ঠিক নেই।

২৯। রুশিয়া যে তুটি কৃত্রিম চন্দ্র ছেড়েছেন, যা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, তা আপনারা দেখেছেন? (কিছুক্ষণ প্রায় ১।২ মিনিট চুপ্ থেকে তারপর বললেন)
উঃ—হ্যাঁ।

৩০। মদনমোহন—আচ্ছা ঠাকুমা, ২য় কৃত্রিম চন্দ্রে যে কুকুরটা ছিল সেটা কি এখনও বেঁচে আছে?
উঃ—কুকুর? (কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া) হুঁ, বেঁচে আছে।

৩১। মদনমোহন,—কুকুরটা এখনও ওই কৃত্রিম চন্দ্রের মধ্যে আছে, না তাকে নামিয়ে নিয়েছে?
উঃ—না-না না ঘুরছে। আমরা কি ওসব দেখি। তুই বল্‌লি তাই দেখ্‌ছি।

৩২। মনোমোহন,—মা ছোট বৌ বল্‌ছিল যে, বাবা মারা যাবার আগে, প্রত্যেক দিন ও নিজে সিন্দূর পরবার আগে, আপনাকে সিন্দূর পরাতো। বাবা মারা যাবার পর থেকে ও আপনাকে সিন্দূর পরায় না। আপনাকে কি সিন্দুর পরাবে? আপনি যা বল্‌বেন?
উঃ—সে কেন আমাকে সিন্দূর দেবে না।

৩৩। আপনি যদি রাগ করেন, এই ভয়ে ও সিঁতুর পরায় না?
উঃ—না-না রাগ করবো কেন।

চক্রপতি—এইবার সংসার সম্বন্ধে তুই একটা প্রশ্ন করি।—

৩৪। মনোমোহনের মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়্ছে, অল্পেই দুঃখ ও ক্রোধ আসে, এর উপায় কি?
উঃ—ও ভাল করে খায় না। দুর্ব্বল হয়ে গেছে। সেজন্য সহ্য করতে পারে না।

৩৫। মনোমোহন,—মা ছোট বৌ বল্ছিল যে, আপনাকে তার মধ্যে আন্বার জন্যে সে চেষ্টা করে, কিন্তু আন্তে পারে না। ওকে শক্তি দাও না মা, যাতে তোমাকে ওর মধ্যে আন্তে পারে?
উঃ—আমি ত ঢুক্তে যাই, ও নিতে পারে না।

৩৬। কিছু রাস্তা বলে দাও না মা, যাতে করে ও তোমাকে আন্তে পারে?
উঃ—হবে হবে। আন্বে আন্বে।

(মনোমোহন—তার স্ত্রীকে বলিল,)—তোমার যা বলবার মাকে বলো না। মা কি বাঘ না ভাল্লুক যে খেয়ে ফেলবে?)।

মদনমোহন—জান ঠাকুমা, মা এখনও আপনাকে ভয় করে। আত্মিক একটু মুচ্‌কে হেসে বলিলেন—হুঁ।

৩৭। চরণ দেবী—মা আমি যখন পূজা কর্তে বসি, তখন অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের মূর্ত্তি ধ্যানে আনতে পারি না। আমাকে একটু শক্তি দাও না মা?
উঃ—হবে হবে। এখন হবে না। কিছুদিন পরে হবে।

৩৮। মা তোমার ঠাকুরের সেবা ঠিক হচ্ছে তো?
উঃ—হ্যাঁ।

৩৯। মা তোমার ঠাকুরের গহনাগাটি ও ত্রিশূল তৈরি করে দিয়েছি দেখেছ?
উঃ—হ্যাঁ।

৪০। মা তোমার ঠাকুরের 'বেলপাতা' 'গঙ্গাজল' দিয়ে প্রত্যহ পুজো ঠিক হচ্ছে তো ?

উঃ—হ্যাঁ।

৪১। ছোট বৌ তোমাকে গুড়ের সন্দেশ হতেই দিয়েছিল, তুমি খেয়ে ছিলে ?

উঃ—হুঁ।

৪২। চক্রপতি—দিদি, আমি মার কথা ঠিক্ ভুলতে পাচ্ছি না, তজ্জন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। মা এখন কোন্ ক্লাসে পড়ছেন ?

উঃ—কি হবে তোর শুনে। যে ক্লাসেই পড়ুক না।

৪৩। হ্যাঁ দিদি, মায়ের চুল আগের মত কোঁক্ড়ান হয়েছে ?

উঃ—হুঁ।

৪৪। হ্যাঁ দিদি, মা কোন্ স্কুলে পড়ছে বল না ?

উঃ—ওই তো তোর দোষ। কোন্ ক্লাসে, কোন্ স্কুলে পড়ে, এসব জেনে তোর কি হবে। আমি বলে দিই আর তুই বার করে নে। কেন তুই নিজে বার করে নে না। আমাদের যে বলবার যো নেই। (ধন্য কঠোর নিয়ম)।

৪৫। দিদি, মদনের দীক্ষা লইবার বড় ইচ্ছা, সদ্‌গুরু কোথায় মিলবে দয়া করে বলে দেবেন ?

উঃ—আ—হা—হা। যা কর্‌ছিস করতো। তাড়াতাড়ি কিসের। পড়্‌ছিস পড়্‌না।

৪৬। মদনমোহন—হাঁ ঠাকুর মা, ৩।৪ মাস আগে জামাইবাবুর দোকান থেকে যে টাকা চুরি যায়, সেটা কে চুরি করেছে ? জামাইবাবুর ধারণা 'অর' টাকাটা নিয়েছে। টাকাটা কে নিয়েছে ঠাকুমা ? 'অর', না বাইরের কোন লোক নিয়েছে ?

উঃ—'অর' নিয়েছে কি রে ? কি বলছিস। 'অর' নয়, বাইরের লোক।

৪৭। আচ্ছা ঠাকুমা, জামাইবাবুর দোকান থেকে যখন চুরি যায়, তখন জামাইবাবু কোথায় ছিল ?

উঃ—আমি তো ছিনুনি তখন। ভাবতে হবে। দেখি। ও ভিতরে গেছলো। একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

৪৮। আচ্ছা ঠাকুমা, সুভাষ বাবু কি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন ?

উঃ—সবব প্রশ্ন করিসনি। ওসব বলার উপায় নেই। 'সে কেন লুকিয়ে আছে জানিস না তুই।' (প্রকারান্তরে উত্তর দিলেন, বেঁচে আছে)

৪৯। মনোমোহন—যাক্, এবারে পদ্মার একটি গান শোন মা।

পদ্মার গান আরম্ভ হইল।—

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।"

৫০। কেমন গান শুনলে মা ?

উঃ—ভাল।

৫১। চক্রপতি—দিদি এখন আপনি কোন্ স্তরে আছেন ?

উঃ—সেখানেই আছি।

৫২। মনোমোহন—মা, মেজদিদি (ভোঁদো) সেখানে কেমন আছেন ?

উঃ—সে জন্মে গেছে।

৫৩। মা তোমার সামনে তোমার গুরুদেবের (বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের) ফটো টাঙ্গানো আছে দেখতে পাচ্ছ ?

উঃ—হ্যাঁ। সে কি আমি আজকে দেখেছি ?

৫৪। মা কুষ্ঠিতে ৫৯ বছরে একটা ফাঁড়া আছে, ৩।৪ বছর পরে কাশীতে গিয়ে থাকব তো ?

উঃ—না—না ৩।৪ বছর পরে কেন ?

৫৫। আর কি প্রায় ৫৩ বছর বয়স তো হয়ে গেল ?

উঃ—না—না ওসব বাজে। একটা ফাঁড়া আছে, সেইটার জন্য চলে যাবি। আর কেন দেরী করছিস।

সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। (মিডিয়ম হাত তুলিয়া) থাক্ থাক্। ওই তো তোদের দোষ।

৫৬। মনোমোহন—মা,বিজয়া দশমীর প্রণাম করবোনি আমরা।

উঃ—থাক্ থাক্ বাবা, থাক্।

৫৭। মদনের প্রণাম,—

উঃ—থাক্ থাক্।

মদন বলিতেছে—ঠাকুমা, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিন। তখন মিডিয়ম অর্থাৎ আত্মিক ডান হাত তুলিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

৫৮। প্রদীপ রায় চৌধুরীর প্রণাম—

উঃ—থাক্, থাক্।

৫৯। মনোমোহন,—মা এইযে,প্রদীপ প্রণাম করছে, যাকে তুমি সাইটিকা থেকে ভাল করে দিয়েছ ?

উঃ—হ্যাঁ। থাক্ থাক্।

৬০। প্রদীপ তো এখন ভাল হয়ে গেছে ?

উঃ—হ্যাঁ।

৬১। চক্রপতি—দিদি এবার আপনাকে বিদায় দিই ?

উঃ—হ্যাঁ।

৬২। চরণদেবী—মা গৌরের খালি অসুখ আর অসুখ লেগে আছে। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না। যেন ভাল হয়ে যায়? (আত্মিক গৌরের মাথায় ডান হাত বুলাইয়া দিলেন)।

৬৩। চক্রপতি—দিদি বিদায়ের পূর্ব্বে প্রণাম করছি?
উঃ—হ্যাঁ। আর কেন দেরী করছিস। আমাকে শান্তি করবে যে।
যান্ দিদি যান্।

লেখক সহঃ চক্রপতি — চক্রপতি
শ্রীমদনমোহন দাস M. A. — শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
প্রাচীন পবলোকতত্ত্ব
বিজ্ঞান মণ্ডল
সূর্যমহল্লা
মিল্লুনিগঞ্জ, জব্বলপুব
ইং ৩০-৮-৩৯

ফনিভূষণ
মুন্নিবাই (৩৭) জীবনলাল

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮টা
শেষ „ ৮-৪০ মিঃ
মিডিয়ম মুন্নিবাঈ
লিখিয়া উত্তর দেন।
(২৮ দিন চক্র করিবার পর মুন্নি মিডিয়ম হন)

(প্রাচীন পরলোক তত্ত্ব বিজ্ঞান মণ্ডল)

হিন্দি হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ।

১। আপনি কে?
উঃ—লুসি। (একজন খ্রীশ্চান মহিলার আত্মিক)

২। আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে কি? না ভাল আছেন?
উঃ—ভাল আছি।

৩। আপনি কোন্ স্তরে আছেন?
উঃ—পঞ্চম স্তরে।

৪। আপনি ওখানে আনন্দে আছেন?
উঃ—হ্যাঁ।

৫। আপনি পুনরায় আমাদের চক্রে কবে আসিবেন ?

উঃ—আটদিনের মধ্যে।

৬। আপনি কি বুধবারে আসিবেন ?

উঃ—না, শনিবার।

(এই সকল উত্তর মিডিয়ম লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে 'লুসি' নামটি ইংরাজিতে লিখেন। কিন্তু মিডিমর ইংরাজি জানিতেন না) নমস্কার।

সহকারী চক্রপতি
মাষ্টার জীবনলাল।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
প্রাচীন পরলোকতত্ত্ব
বিজ্ঞানমণ্ডল
সূর্য্যমহল্লা
মিলুনিগঞ্জ, জব্বলপুর
ইং ২-৯-৩৯
শনিবার

জীবনলাল
মুন্নিবাঈ (৪০) ফণিভূষণ

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৮টা
শেষ ,, ৯-১৫ মিঃ
মিডিয়ম মুন্নিবাঈ
(আজও লিখিয়া উত্তর দেন)

হিন্দি হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ।

১। কে আপনি ?

উঃ—লুসি।

২। আপনি কোথায় মারা যান ?

উঃ—বোম্বাই।

৩। আপনার ঠিকানা লিখুন।

উঃ—হাজিআলী, ঘামাড়িয়া হইতে কিওয়াড়ী।

৪। বাড়ীর নম্বর দিন ?

উঃ—চুপ্ করিয়া রহিলেন।

৫। আমার প্রশ্নের জবাব দিবেন ?

উঃ—বলুন।

৬। কোন্ রোগে আপনার মৃত্যু হয় ?
উঃ—হাঁপানি রোগে।

৭। কতদিন এই ব্যারামে ভুগিয়াছেন ?
উঃ—চার মাস।

৮। আপনার কোন আত্মীয় আছেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

৯। এই সহরে কোন আত্মীয় আছেন ?
উঃ—হ্যাঁ, আমার স্বামী আছেন। নয়া মহল্লায়। (উহার স্বামীর সহিত চক্রপতি দেখা করিয়া বিবরণ বলিলে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া যান। এবং ঘটনা সত্য বলেন)।

১০। এই কামরায় কোন আত্মীয় আছে ?
উঃ—হ্যাঁ, মুন্নি আমার কন্যা।

১১। মুন্নির বিবাহ হয়েছে কি না ?
উঃ—হ্যাঁ, না। (মুন্নি অনাথ আশ্রমে পালিতা। একটি পুরুষের উপর সে আসক্তা। বিবাহ হয় নাই। মনে হয় এইজন্য 'হ্যাঁ' ও 'না' উত্তর দেন)।

১২। প্রশ্নকর্ত্তা সঃ চক্রপতি।
১৩।১৪ নং প্রশ্ন কুৎসিত থাকায়, লিখা হইল না।

১৫। আমার পিতা কোন্ স্তরে আছেন বলিতে পারেন ?
উঃ—না।

১৬। আপনি আমাদের কোন চক্রে তাঁহাকে আন্‌তে পারেন ?
উঃ—চেষ্টা করব।

১৭। আমার মা কোথায় কোন্ স্তরে আছেন বলিতে পারেন ?
উঃ—না।

১৮। এই চক্রে মিডিয়ম হইবার পূর্ব্বে আপনি কত দিন থেকে আসিতেছেন।
উঃ—আট দিন থেকে।

১৯। জীবনলালের উপর আপনি আসিতে পারেন ?
উঃ—না।

২০। আমার পিতাজীকে আনৃতে পারেন ?
উঃ—চেষ্টা করব।

২১। প্রশ্নের উত্তর অস্পষ্ট।

২২। আপনি কোন্ স্তরে আছেন ?
উঃ—পঞ্চম স্তরে।

২৩। আলোকে না অন্ধকারে ?
উঃ—আলোকে।

২৪। শূন্য আকাশ মধ্যে আছেন, না কোন ঘর বাড়ীর মধ্যে ?
উঃ—ঘরে।

২৫। আপনি কোথায় বাস করেন ?
উঃ—স্বর্গে।

২৬। এখান থেকে তাহা কত দূর ?
উঃ—অনেক দূরে।

২৭। আপনার ভাই ধীরজ সিং কোন স্তরে আছেন ?
উঃ—তৃতীয় স্তরে।

২৮। আপনি কি ঠিক জানেন ?
উঃ—হ্যাঁ।

২৯। আপনি তাহার সহিত দেখা করিতে পারেন ?
উঃ—না।

৩০। তিনি আমাদের চক্রে আসৃতে পারেন কি না ?
উঃ—না।

৩১। আপনার মৃত্যুর পর কোন স্তরে ছিলেন ?
উঃ—তৃতীয়।

৩২। তারপর কোন্ স্তরে গেলেন ?
উঃ—চতুর্থ স্তরে।

৩৩। ওখানে কতদিন ছিলেন ?

উঃ—এক বৎসর।

৩৪। আপনি পুনরায় কোন্ তারিখে চক্রে আসিবেন ?

উঃ—৭ তারিখে।

৩৫। কি বারে আসিবেন ?

উঃ—বৃহস্পতিবার।

৩৬। আমার পিতাকে খবর দিবেন কি যে, আপনার পুত্র ফণিভূষণ আপনার সহিত দেখা করিতে চাহেন ? তিনি কি জবাব দেন তাহা আমাকে জানাইবেন ?

উঃ—হ্যাঁ, জানাইব।

সহকারী চক্রপতি	চক্রপতি
মাষ্টার জীবনলাল।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
প্রাচীন পরলোকতত্ত্ব
বিজ্ঞানমণ্ডল
সূর্য্যমহল্লা
মিলুনিগঞ্জ, জব্বলপুর
ইং ৭-৯-৩৯

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ সন্ধ্যা ৭-২০ মিঃ
শেষ „ ৮-১৫ „
মিডিয়ম—মুন্নিবাই
(মুখে উত্তর দেন)

হিন্দী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ।

১। আপনি কে ?

উঃ—লুসি বাঈ।

২। বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিবেন ?

উঃ—না।

৩। আপনি আমার পিতা সম্বন্ধে কোন সন্ধান করেছেন ?

উঃ—চেষ্টা করেছিলাম।

৪। আমার পিতা কি পঞ্চম স্তরে নাই ?

উঃ—উচ্চ স্তরে আছেন।

৫। প্রথম স্তর অন্ধকার না প্রকাশ ?

উঃ—অন্ধকার।

৬। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তর কিরূপ ?

উঃ—দ্বিতীয় অতি সামান্য প্রকাশ, তৃতীয় তদপেক্ষা সামান্য প্রকাশ, চতুর্থ, তৃতীয় অপেক্ষা কিছু প্রকাশ, ৫ম স্তর বেশী রকম প্রকাশ।

৭। পঞ্চম স্তরের পর কিরূপ ?

উঃ—খুব উজ্জ্বল।

৮। আপনি ষষ্ঠ স্তরে গিয়া কোন খবর দিতে পারেন ?

উঃ—আমার দ্বারা তাহা অসম্ভব।

৯। সেখানে যাওয়া কি আপনাদের সম্পূর্ণ অসম্ভব ?

উঃ—হ্যাঁ। বড়ই মুশকিল।

১০। ওখানে কিরূপ আত্মিক থাকেন ?

উঃ—যাঁহারা উত্তম কর্ম্ম করেন, তাঁহারা থাকেন।

১১। ওখানে কি কেবল সপ্তম স্তরই আছে ?

উঃ—হ্যাঁ। সপ্তম স্তরই আছে।

১২। উহার পর কিরূপ ?

উঃ—তাহা আমি জানি না।

১৩। আমার কন্যা 'অশ্রুকণা' কোথায় আছে ?

উঃ—জানি না।

১৪। আপনার ভায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

উঃ—হ্যাঁ।

১৫। তিনি কি এই চক্রগৃহে এসেছেন ?

উঃ—না

১৬। দরজার উপর কে ধাক্কা মারিয়াছে ?

উঃ—আমি। (পরলোক তত্ত্ব বিজ্ঞান মণ্ডলের বাড়িটি সম্পূর্ণ ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। অন্য কেহ ঐ বাড়ীতে ভাড়াটে ছিলেন না। ভিতর হইতে চক্রগৃহ বন্ধ ছিল। ঠিক চক্রে বসিবার ২।৪ মিনিট পরে দরজায় জোরে কেহ ধাক্কা মারেন; তাহাতে সকলে চমকিয়া উঠেন)।

১৭। কেন এরূপ ধাক্কা দিয়াছেন ?

উঃ—আসিয়াছি এইজন্য সূচনা দিয়াছিলাম।

১৮। আমরা জীবন লালের বাড়ীতে চক্র করিলে কি আপনি আসিবেন ?

উঃ—হঁ্যা।

১৯। জীবনলালের উপর আসিবেন কি ?

উঃ—না।

২০। কোন মহিলার উপর আসিবেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

২১। পরলোকে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ ও পৃথক ভাব আছে কি ?

উঃ—হ্যাঁ।

২২। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে কি ?

উঃ—চিন্‌তে পারি কিন্তু তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয় না।

২৩। এখানকার মত কি আপনারা কাপড় পরেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

২৪। এ কাপড় কোথায় পান ?

উঃ—পরমাত্মার দেওয়া এই কাপড়।

২৫। এ কাপড় কিরূপ ?

উঃ—সফেদ ও উজ্জ্বল।

২৬। আপনি বলেছিলেন পঞ্চম স্তরে কোন বাড়ীতে থাকেন?
উঃ—হ্যাঁ, বলেছিলাম?

২৭। কিরূপ বাড়ী?
উঃ—ও বাড়ী যেন ফুলের বাড়ীর মত।

২৮। ঐ বাড়ী কি এধার ওধার করে চলে বেড়ায়?
উঃ—না, চলে ফিরে না।

২৯। আচ্ছা ওখানে গাছ পালা ও পাহাড় আছে?
উঃ—মনে হয় আছে।

৩০। ওখানে কোন জীব জন্তু আছে কি?
উঃ—হ্যাঁ।

৩১। ঐ জীব জন্তু দেখে আপনার ভয় হয় কি?
উঃ—না।

৩২। ওখানে আত্মিকে আত্মিকে দস্তি আছে?
উঃ—শুদ্ধ প্রেমভাব থাকে কিন্তু দস্তি নাই। (উত্তরটির গূঢ় রহস্য আছে)।

৩৩। তবে কি পবিত্র শুদ্ধ প্রেম থাকে?
উঃ—হ্যাঁ।

৩৪। মিডিয়ম আপনার কে?
উঃ—পুত্রী।

৩৫। এর আগত জীবন কিরূপ থাকিবে?
উঃ—ভালই থাকিবে।

৩৬। আপনার কন্যা আমার উপদেশ শুনিবেন কি?
উঃ—শুনিবে।

৩৭। আপনারা বা আপনি ঘুমান না?
উঃ—না। ঘুমাই না।

৩৮। আপনাকে যখন চক্রে আহ্বান করি, তখন আপনার রাগ হয় কি ?

উঃ—না।

৩৯। চক্রে আহ্বান করিলে আপনারা খুশী থাকেন কি ?

উঃ—হ্যাঁ।

৪০। যদি কিছু নূতন কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর দিবেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

৪১। আপনারা কি একা একা থাকেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

৪২। আপনার সঙ্গী কেহ নাই কি ?

উঃ—না।

৪৩। যখন আপনি স্থূল শরীর হইতে বাহির হন, অর্থাৎ মৃত্যু হয় তখন কি দেখেন ?

উঃ—দুই জনকে দেখি, যাহারা আমাকে লইয়া যান।

৪৪। প্রথমে কোথায় লইয়া যায় ?

উঃ—তৃতীয় স্তরে।

৪৫। উহারা কে ছিলেন ?

উঃ—দূত।

৪৬। ঐ সময় উহারা কি কি বলেছিলেন ?

উঃ—শীঘ্র শীঘ্র চল।

৪৭। আপনার কন্যা কোথায় ছিল ?

উঃ—আমার নিকটে।

৪৮। আসন্নকালে মেয়েটি কোথায় বসেছিল ?

উঃ—আমার পায়ের নিকট।

৪৯। সেখানে আর কেহ ছিলেন ?

উঃ—চার ছয় ব্যক্তি আরও ছিলেন।

৫০। আমার পিতা কি আমাদের চক্রে আসিবেন ?

উঃ—আমি তা জানি না।

৫১। আপনি আমাদের অন্য চক্রে আসিবেন ?

উঃ—চেষ্টা করিব।

৫২। চেষ্টা করিবার আবশ্যক কি ?

উঃ—হুকুম নাই।

৫৩। কাহার হুকুমে আপনারা আসেন ?

উঃ—যখন পরমাত্মার স্বরূপ একজন হুকুম দেন।

৫৪। সেই পরমাত্মার স্বরূপ মুক্তত্মাকে কি আপনারা দেখিতে পান ?

উঃ—হ্যাঁ, দেখিতে পাই।

৫৫। তাঁর রূপ কিরূপ ?

উঃ—উজ্জ্বল শরীর।

৫৬। তিনি কথা বলেন ?

উঃ—হ্যাঁ।

৫৭। আপনার মত কথা বলেন কি ?

উঃ—হ্যাঁ।

৫৮। তাঁর আওয়াজ কিরূপ ?

উঃ—মিষ্টভাষী।

৫৯। তাঁহার কথা যদি না মানেন ?

উঃ—শাস্তি দেন।

৬০। কিরূপ শাস্তি দেন ?

উঃ—যেন আগুনের ভাটিতে ফেলে দিচ্ছেন। তখন অত্যন্ত কষ্ট হয়।

৬১। এখানে যে খারাপ কার্য্য করে, তাহার কিরূপ শাস্তি হয় ?

উঃ—ভবিষ্যতে তাহা বলিব।

৬২। দয়া করে আবার কবে আমাদের চক্রে আসবেন ?

উঃ—১৫ দিন পরে।

তবে এবার যান, নমস্কার।—

(মিডিয়মের হাঁটু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে জ্ঞান আনা হয়।)

লেখক সহঃ চক্রপতি	চক্রপতি
মাষ্টার জীবনলাল।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
সৎসঙ্গ ভবন
মিলুনিগঞ্জ, জব্বলপুর
ইং ১-১-৪১

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৮টা
শেষ ,, ৯টা
মিডিয়ম—নর্ম্মদাপ্রসাদ
(মণ্ডলা জেলায় বাড়ী)

হিন্দী হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ

আত্মিক মিডিয়মের উপর আবিষ্ট হইয়া বড়ই উৎপাত আরম্ভ করেন। তাহাতে চক্র ছাড়িয়া সকলে পলায়। টেবিলের উপর দিকে চড় মারিবার সময় চক্রপতি গম্ভীর স্বরে বলেন—

১। কে আপনি ? এত অত্যাচার করছেন কেন ? এই চক্রে এলেন কেন ?

উঃ—আমি ভুল করে এসেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। যেতে দিন।

২। আপনি আপনার পরিচয় দিন ?

উঃ—এখন দেব না।

৩। কখন পরিচয় দেবেন ?

উঃ—কাল এসে পরিচয় দেব।

৪। কখন আসবেন ?

উঃ—রাত্রি ৯টায়।

৫। এ কি, একটা বালকের আত্মিকের মত উৎপাত কেন করছেন ? স্থির হয়ে বসুন। কেন এখানে এলেন ?
উঃ—গান শুনে।

৬। কবে আসবেন ঠিক করে বলুন ?
উঃ—কাল নিশ্চয়ই আসব।

তখন চক্রপতি আত্মিককে নমস্কার করিলে, আত্মিক প্রতি-নমস্কার দিয়া চলিয়া যান।

(মিডিয়মের জ্ঞান হইলে তিনি বলিতে থাকেন—আমার হাতে এত ব্যথা কেন ? চক্রপতি বলিলেন, কিছুই নয়, ওরকম হয়। কারণ ব্যাপারটি কি হইয়াছে বলিলে, তিনি আর চক্রে বসিবেন না ; তজ্জন্য গোপন করা হইল)।

লেখক	চক্রপতি
শ্রীরামকিশোর কসবার।	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ		সময় ও মিডিয়ম
সৎসঙ্গ ভবন মিলুনীগঞ্জ, জব্বলপুর ইং ১০-৯-৪৯	মোহনলাল সারদা প্রসাদ চৌবে — ৪৩ — নর্ম্মদা প্রসাদ ফণিভূষণ	আরম্ভ রাত্রি ৮-৪৫ মিঃ শেষ ৯-৩০ মিডিয়ম—নর্ম্মদাপ্রসাদ কেশবোঢ়

হিন্দী হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ

১। বলুন আপনার নাম কি ?
উঃ—অম্বু। বৃথা কেন কষ্ট দিচ্ছেন ? আপনি কি জানতে চান ?

২। পরলোক সম্বন্ধে জানতে চাই।
উঃ—ভগবৎ ভজন কর।

৩। আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় দিন ?
উঃ—৩২ বৎসর পূর্ব্বে আমার জন্ম হয়েছিল। আমি পুনরায় এখানে আসতে চাই। যদি এরা উপবাস করে।

৪। আপনার কিছু সাহায্য করতে পারি কি ?

উঃ—আপনার নিকট কোন সাহায্য চাই না।

৫। এই চক্রে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা আপনার কেউ হন কি ?

উঃ—(মিডিয়ম হাত উঠাইয়া দেখায়) এই দুইজন আমার ছোট ভাই। আর ইনি আমার জ্যেঠামশাই।

৬। আপনার মৃত্যু কি ব্যারামে হয় ?

উঃ—নিমোনিয়ায় মৃত্যু হয়।

৭। আপনি কত বয়সে মারা যান ?

উঃ—দু সাল বাদ মারা যাই।

৮। আপনার জ্যেঠার বাড়ীতে পোঁতা রাখা কোন টাকাকড়ি আছে কি ?

উঃ—হ্যাঁ, ধন ছিল ; এখন নাই, নষ্ট হয়ে গেছে। তার আশা ছেড়ে দিন।

৯। আপনার পিতা যদি কোন ব্যবসা করেন তাতে উন্নতি হবে ?

উঃ—ও সময় অতীত হয়ে গেছে।

১০। কি কি বারে উপবাস করবে ?

উঃ—শনিবার আর মঙ্গলবার।

১১। উপবাসের দিন কি কোন পূজা পাঠ করবে ?

উঃ—হ্যাঁ। ভগবৎ চিন্তন জীবনকে বড় পবিত্র করে।

১২। আপনি কিরূপ ক্ষেত্রে জন্ম নেবেন ?

উঃ—যে বিশেষভাবে পবিত্র থাকবে সেইখানে।

১৩। আপনি এ জগতে পূর্ব্বে কোথায় জন্ম নিয়েছিলেন ?

উঃ—ছোটেলাল কসবারের গৃহে, উনি আমার পিতা ছিলেন।

১৪। আলো জ্বালাব ?

উঃ—আলোতে বড় কষ্ট হয়।

১৫। মৃত্যুর পর আপনার জন্ম হয়েছিল কি ?

উঃ—হ্যাঁ, অন্য যোনিতেও জন্ম লই।

১৬। মনুষ্য মৃত্যুর পর কিরূপ ফলভোগ করেন ?

উঃ—কর্ম্মানুসারে ফলভোগ হয়ে থাকে।

১৭। আপনার ভগ্নীপতি যে মারা গেছেন, তাঁর আত্মিকের সহিত দেখা হয় ?

উঃ—না। ওখানে বহু আত্মিক আছেন। তবে আমি দেখা করতে চেষ্টা করব।

১৮। আমার মায়ের আত্মিকের সহিত দেখা হয় ?

উঃ—তিনি জন্ম নিয়েছেন।

১৯। আপনার কাকার আত্মিক কোথায় আছেন ?

উঃ—তিনি এধার ওধার ঘুরে বেড়ান। কোন শান্তি নাই।

২০। আপনি কোথায় জন্ম নিতে চান ?

উঃ—আমার দুই ভায়ের মধ্যে যে শনি ও মঙ্গলবারে সংযম, নিয়ম, আচার বিচার ঠিক করবে তার নিকট জন্ম নেব।

২১। দুই ভাই আত্মিককে প্রণাম করেন, এবং ঘনশ্যাম পরীক্ষা (B. Sc.) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

উঃ—শঙ্কা কর না। (টেবিলের উপর হইতে একটি ফুল লইয়া তাহাকে দেয়।)

২২। আপনার মা কোথায় আছেন ?

উঃ—পরলোকে পুরুষ স্ত্রী পৃথক পৃথক থাকে। কোথায় আছে বলতে পারব না।

২৩। মিডিয়মের মধ্যে আত্মিক কোনখানে থেকে কথা কন?
উঃ—হৃদয়ে। (মিডিয়ম নিজে তার হাত বুকের উপর রাখিয়া দেখাইয়া দেন)।

২৪। ওখানে কোন ঘর বাড়ী আছে?
উঃ—ওখানে সবই আছে।

তৎপরে আত্মিককে নমস্কার দিয়া বিদায় দেওয়া হয়।

লেখক
শ্রীরামকিশোর কসবার।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
গোলবাজার
নর্ম্মদা মিশ্রের বাড়ী
জব্বলপুর
ইং ৪-৯-৪৯

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৮টা
শেষ ,, ৮-৪৫ মিঃ
মিডিয়ম—রামশরণ তেওয়ারী

ইংরাজী হইতে বাংলা অনুবাদ

১। আলো জ্বালব?
উঃ—(চুপ করিয়া রহিলেন)।

২। আপনি কে?
উঃ—নর্ম্মদা প্রসাদ (ইনি একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি)।
আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে এখুনি ছেড়ে দিন।

৩। আপনি কেমন আছেন?
উঃ—অত্যন্ত কষ্টে আছি। ছেড়ে দিন।

৪। আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমাকে সময় দিন।
উঃ—নীরব। (তখন আমরা সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে অভ্যর্থনা করি)।

৫। হেমন্তের সঙ্গে দেখা হয়?

উঃ—আমার সঙ্গে কারও দেখা হয় না। আমি অত্যন্ত কষ্টে আছি।

৬। আপনি কি অন্ধকারে আছেন?

উঃ—হ্যাঁ। আমি অত্যন্ত কষ্টে আছি, এখনই ছেড়ে দিন।

সকলের নমস্কার, শেষে চক্রপতি নমস্কার করিয়া বিদায় দিতেই আত্মিক চলিয়া যান।

লেখক	চক্রপতি
শ্রীবসন্তপ্রসাদ মিশ্র। (তৎপুত্র)	শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
ষ্টার বিস্কুট কোং
মেড়াতাল, জব্বলপুর
ইং ৬-১-৫২ ও ৭-১-৫২

হরিহর ভোলা
রামকৃষ্ণ নিগম
৪৫
গণপৎ রাও মহাবকা
ফণিভূষণ

সময় ও মিডিয়ম
(৭-১-৫২)
আরম্ভ রাত্রি ৮টা
শেষ „ ৯-১৫ মিঃ
মিডিয়ম—গণপৎ রাও মহাড়কা

হিন্দী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ।

৬-১-৫২ তারিখের চক্রে আত্মিককে জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলে উত্তর দেন, "অপবিত্র জায়গা, অপেক্ষা করিব না।" তৎপরে আত্মিক চলিয়া যান। (কোন স্ত্রীলোক 'মাসিক' অবস্থায় চক্রে বসেন। তজ্জন্য পরদিন স্ত্রীলোক লইয়া বসা হয় না)।

৭-১-৫২ তারিখের বিবরণ।

১। আলো জ্বালব?

উঃ—জ্বালাও।

২। কষ্ট হবে না ত?

উঃ—না।

৩। আপনি কে?

উঃ—চন্দ্রকান্ত।

৪। আপনার মৃত্যু কিরূপে হয়?

উঃ—পিছন হইতে ধাক্কা মারে। (মোটর বাস হইতে)

৫। আপনি এখান থেকে কেন চলে গেলেন?

উঃ—সময় হয়ে গিয়েছিল। আমাকে শীঘ্র শীঘ্র ছেড়ে দাও।

৬। মৃত্যুর পর মাতাপিতার নিকট এসেছিলেন?

উঃ—হ্যাঁ, একবার এসেছিলাম।

৭। যেখানে পোষ্টমাটম্ হয়, সেখানে কি আপনি গিয়েছিলেন?

উঃ—হ্যাঁ। গিয়েছিলাম।

৮। এখন আপনি কেমন আছেন?

উঃ—আরামে আছি। কিন্তু অনেক কাজ।

৯। কিছু প্রশ্ন করতে চাই?

উঃ—শীঘ্র শীঘ্র ছেড়ে দাও, পরশু আসব।

১০। সেইদিন আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?

উঃ—হ্যাঁ, দেব।

১১। পরশু কি বার আছে?

উঃ—বুধবার। আত্মিক বলিলেন—এখানে আমি আসতে চাই।

১২। আমি কে আপনি জানেন?

উঃ—হ্যাঁ, আপনার দোকান থেকে মিষ্টি এনেছি। (এত মিষ্টি আনিয়াছি, মিডিয়ম হাত উঠাইয়া দেখাইয়া দেন) আত্মিক বলিলেন—শীঘ্র শীঘ্র ছেড়ে দিন, আমি পরশু বেশী ছুটি নিয়ে আসব।

১৩। মৃতদেহ সৎকার পর্য্যন্ত এখানে ছিলেন কি ?
উঃ—হ্যাঁ, ছিলাম।

১৪। পরশু তোমাকে কিছু খাওয়াব। আজ একটা ফুল নাও। (তখন আত্মিক হাত বাড়াইয়া (অর্থাৎ মিডিয়ম) ফুলটি লইয়া তাহার পিতার (রামকৃষ্ণ নিগমের) হাতে দিল)। নমস্কার ! আপনি এইবার যান।

লেখক
শ্রীরাজেশ্বরী প্রসাদ বর্ম্মা।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

স্থান ও তারিখ
ষ্টার বিস্কুট কোং
মেড়াতাল, জব্বলপুর
ইং ৯-১-৫২
বুধবার

সময় ও মিডিয়ম
আরম্ভ রাত্রি ৮-৩৩ মিঃ
শেষ ,, ৯-৫৫
মিডিয়ম—গণপৎরাও মহাড়কা

হিন্দী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ।

হরিহর ভোলা (জনৈক সাধু) স্তোত্র পাঠ করেন। চক্রপতি আহ্বান করেন। অনেকক্ষণ পরে আত্মিক আসিয়া, মিডিয়মের ভিতর প্রবেশ করিয়া, প্রথমেই 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকেন। তৎপরে আলো জ্বালান হয়।

১। আপনি কে ?
উঃ—চন্দ্রকান্ত। মায়ের সহিত মিলিতে আসিয়াছি।

২। আসৃতে এত দেরী হল কেন ?
উঃ—অনেকক্ষণ থেকে চক্রে ঘুরিতেছি।

৩। আপনি আপনার মৃত্যুর বিবরণ বলুন।

উঃ—যখন আমি ঘর থেকে যাই, তখন ভীষণ বড় ভয়ানক ব্যক্তি আমার পিছনে চলে, উহাতে আমার বড় ভয় হয় ও কষ্ট হয়। তখন আমি ঘরের দিকে ফেরত আসিতে থাকি, পরন্তু পুনরায় ফেরত যাই। যখন আমি ঐ যায়গায় পৌঁছি (নথরো পুলের নিকট চন্দ্রকান্তকে মোটর বাসের ধাক্কা লাগিয়াছিল, ঐখানেই শরীরান্ত হয়)। ঐ ভয়ানক জীব যার লম্বা লম্বা চুল, সে আমার সামনে আসিলে, আমি ভয়ে আমার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ছাড়িয়া দিই। সেই সময় আমার পিছন হইতে ধাক্কা লাগে। তখনই বাসের নিচে আসিয়া যাই ও মৃত্যু হয়।

৪। আপনার সহিত আর কোন সাইকেলওয়ালা ছিল ?

উঃ—হ্যাঁ, কিন্তু উহারা তিনজন অনেক পিছনে ছিল।

৫। আপনার মৃত্যু হবার পর আপনাকে কেহ লইতে আসিয়াছিল ?

উঃ—হ্যাঁ, দেবলোকের একজন দূত ছিল।

৬। ঐ দূত কি করিলেন ?

উঃ—ঐ দূত আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। অত্যন্ত ঘন অন্ধকার ছিল ; তাহাতে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়। যখন দেবলোকে আসি, তখন খুব আলোক মিলে, এবং আরাম বোধ করি।

৭। আপনি ওখানে কেমন আছেন ?

উঃ—আরামে আছি।

৮। ওখানে কি বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ আছে ?

উঃ—হ্যাঁ, ওখানে সবই আছে।

৯। একজনের সঙ্গে অন্য জনের কি সম্বন্ধ ?

উঃ—কিছু সম্বন্ধ নাই, সকলে একই প্রকার।

১০। আপনি কাহার আদেশে ওখানে কাজ করেন ?

উঃ—প্রভুজীর সহায়ক।

১১। প্রভুজীর সহায়কের কি নাম ?

উঃ—গুরুদেব।

১২। প্রভুজীর দর্শন আপনার হয় ?

উঃ—হ্যাঁ, সকাল ও সন্ধ্যায়।

১৩। আপনি প্রভুজী অর্থাৎ ভগবানের রূপ বর্ণন করিবেন, তিনি কিরূপ ?

উঃ—ভগবান সিংহাসনের উপর বিরাজ করেন। অতি সুন্দর রূপ, পীতাম্বর পরা, মাথায় মুকুট, হাতে চক্র ধরিয়া থাকেন।

১৪। ওখানে ঘরবাড়ী আছে ?

উঃ—হ্যাঁ, ওখানে সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। সেই রকম বাড়ীতে আমরা থাকি।

১৫। ওখানে কি খেতে পান ?

উঃ—ফল মিলে।

১৬। আপনি বলিতে পারেন কোন স্তরে আছেন ?

উঃ—মনে হয় প্রথম স্তরে।

১৭। মাতা পিতার জন্য আপনার কোন চিন্তা আসে ?

উঃ—আমার যখন অবসর মিলে তখন মায়ের জন্য চিন্তা আসে। (আত্মিক টেবিল হইতে একটি ফুল লইয়া মাকে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আত্মিকের পিতাতাহা লইয়া লন। পুনরায় আর একটি ফুল লইয়া মাকে

দিয়া, মায়ের আঙ্গুল ধরিয়া কাঁদিতে থাকেন)। ঐ সময় চক্রপতি আত্মিকের নিকট প্রার্থনা করেন, আপনি বৃথা অনুতাপ করছেন। আত্মিককে বলিলেন বৃথা অনুতাপ করিবার জন্য আমি আপনাকে ডাকি নাই। তখন আত্মিক বলেন, "এরূপ প্রশ্ন আর করবেন না।" তখন চক্রপতি বলিলেন, এরূপ ভাবের প্রশ্ন আর করিব না। দয়া করে আপনি শান্ত হইয়া যান।

১৮। আপনাকে কিছু রসোগোল্লা খাওয়াইতে চাই ?

উঃ—আমার দুই ভগ্নী যাহারা সামনে দাঁড়াইয়া আছে তাহাদিগকেও খাওয়াও।

১৯। আপনিও কিছু খান ?

উঃ—ওদের ঘরে খাওয়ালেই আমার তৃপ্তি হবে। (যে সময় আত্মিকের দুই ভগ্নীকে রসগোল্লা দেওয়া হয়, তখন আত্মিকও তাহার রসগোল্লা খাইবার মত মুখ চালাইতে থাকে, এবং বলে—বেশ আতরের গন্ধ।

২০। আপনি ওখানে কতদিন থাকবেন ?

উঃ—আমার সেদিন আদেশ হয়েছে—তুমি যেখান থেকে এসেছ সেইখানে যেতে হবে।

২১। আপনি যে স্তরে থাকেন তাহা হইতে কতদূর ?

উঃ—এখান হইতে অনেক দূর ; খুব শীঘ্র শীঘ্র সোজা আসিলে কম পক্ষে আধ ঘণ্টা সময় লাগে। (চক্র করিবার আধ ঘণ্টারও পরে মিডিয়ম বেহুঁস্ হইয়া ছিলেন)।

২২। আপনি বলিলেন যে, যেখান হইতে আসিয়াছেন সেখানে যাইবেন। সে জায়গা কোথায় ?

উঃ—আদেশ হয়েছে, পিণ্ড পৌঁছেছে, দুই মাসের মধ্যে যেতে হবে।

ইহাতে চক্রপতি ঠিক বুঝিতে না পারায়, পুনরায় প্রশ্ন করিয়া স্পষ্টকরণ করিতে চাহেন। এই সময় চন্দ্রকান্তের আত্মিক বলেন যে, "তুমি কিছু বোঝনা" (জোর করিয়া এই উত্তর দেন) তখন তার মা বলিলেন, আমি বুঝিয়াছি। ছেড়ে দিন একথা।

২৩। আত্মিকের 'মা' জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কানপুর গিয়াছিলে ?

উঃ—হ্যাঁ, কানপুরে কাকীর নিকট গিয়াছিলাম। আর লক্ষ্মীকে (আত্মিকের বড় ভগ্নী) স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলাম।

২৪। চক্রপতি জিজ্ঞাসা করেন—আপনি মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারেন ?

উঃ—হ্যাঁ, তিনি একবার গুরুদেবের নিকট এসেছিলেন। কথাবার্ত্তা করিয়া তিনি উচ্চ তৃতীয় স্তরে চলিয়া যান। (স্তর বহুপ্রকারের মনে হয়)

২৫। আপনাকে কি কাজ করিতে হয় ?

উঃ—গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিতে হয়।

২৬। আপনি যখন এখানে আসেন, তখন পৃথিবী নজরে আসেত ?

উঃ—পৃথিবীর দিকে কোনরূপ ধ্যানই আসে না।

২৭। আপনাকে যদি কোন দিন আহ্বান করি আপনি আসিবেন কি ?

উঃ—ডাকিলে নিশ্চয়ই আসিব।

২৮। আজত অনেক দেরীতে এসেছিলেন ?

উঃ—ডাকিবার সময় আপনারা বড় ভুল করেন।

২৯। কি ভুল করি ?

উঃ—এ চিন্তা করা উচিত নয় যে, আমার উপর আসুন। এই চক্রে আসুন এইরূপ চিন্তা বা আহ্বান করা উচিত। তাহা হইলে আমরা ইচ্ছামত প্রবেশ করিতে পারি।

আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন। নমস্কার।

পরক্ষণেই আত্মিক চলিয়া যান। ক্রমশঃ মিডিয়মের জ্ঞান ফিরিয়া আইসে।

লেখক
শ্রীরাজেশ্বরী প্রসাদ বর্ম্মা
সি, পি, আর্ট স্টুডিও
বেঙ্গলী ক্লাবের নিকট
জব্বলপুর।

চক্রপতি
শ্রীফণিভূষণ দেব।

সমাপ্ত

প্রণেতার পরিচয়

যবনের ভয়ে আকুল হইয়ে
তেয়াগি জনমভূমি
পূর্ব্বজ আসিল বর্ণাশ্রম গেল
কোলে নিল বঙ্গভূমি।

কুহলীর সাথে কনোজ হইতে
এসেছিল বর্দ্ধমান
দেবকুলে কালি এ কেন ঘটালি
সহি কত অপমান।

কশ্যপের পুত প্রবর আসিত
মিলিল কুহলীসাথে
কর্ম্মকাণ্ড গিয়া উরুজ সাজিয়া
ঘুরিতেছি এ ভারতে।

—(*)—